ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীচৈতন্যদেব

'শ্রীচৈতন্যের প্রেম,' 'গৌড়ীয়-সাহিত্য', 'গৌড়ীয়-গৌরব', 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব',
'গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস', 'দ্বাদশ আল্‌বর', 'সরস্বতী-জয়শ্রী', 'সরস্বতী-
সংলাপ', 'শ্রীভুবনেশ্বর', 'শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ', 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে
বিরহ-তত্ত্ব', 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ', 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর', 'গীতি-
সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ' 'ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ', 'শ্রীভক্তি-
বিনোদ-বাণীবৈভব', 'শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা', 'উপাখ্যানে
উপদেশ', 'শ্রীল ভক্তিসুধাকর', 'অবতারী ও অবতার',
'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং
সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রের প্রবীণ সম্পাদক

মহামহোপদেশক

শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-
বিরচিত

[দেড় টাকা

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপহার-পৃষ্ঠা
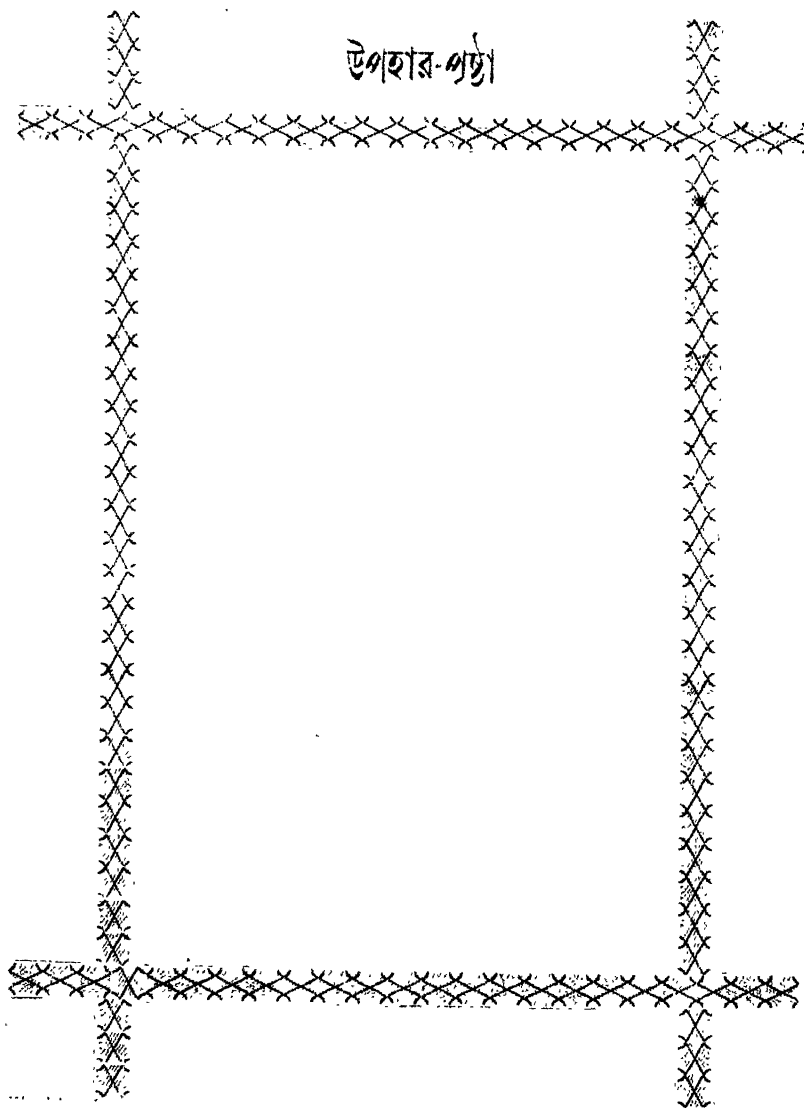
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রন্থকারের নিবেদন

যে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত-সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের বাণী পরিপূর্ণ আচরণের সহিত বিশুদ্ধভাবে প্রচার করিয়া সনাতন শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপন ও পারমার্থিক নবজাগরণের যুগ প্রকট করিয়াছেন, সেই শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তৎপরে তাঁহারই আদেশে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যিনি সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বিস্তার করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্য-বাণী-বিগ্রহ মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও তাঁহারই মনোঽভীষ্টপরিপূরণযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্ বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষক শ্রীশিক্ষাগুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদ ও শক্তি-সঞ্চারে অনুপ্রাণিত হইয়া 'শ্রীচৈতন্যদেব'-গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত **তৃতীয় সংস্করণ** শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তমজনের আবির্ভাব-বাসরে সজ্জনবৃন্দের করকমলে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইলাম।

শ্রীচৈতন্যদেব অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিয়া এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গের আদিম সাহিত্য তাঁহারই শ্রীচরণার্চ্চন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও বঙ্গদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক কল্পিত, ভ্রান্ত ও বিকৃত মত পোষণ করেন, কেহ কেহ বা তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা উদাসীন। বঙ্গদেশের কয়েকজন প্রথিতনামা সাহিত্যিক কতকগুলি অপ্রামাণিক কল্পিত পুঁথির প্রমাণ ও কল্পনাবলে শ্রীচৈতন্যদেবকে যেরূপ

চিত্রে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলেই তরল-কথা-সাহিত্যের পাঠক-সম্প্রদায়ের শিরঃপীড়া উদিত হয়; কাজেই একদিকে যেরূপ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ, অপর দিকে তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা ও সিদ্ধান্তের বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীনতা আমাদিগকে প্রগতির নামে অধোগতি অর্থাৎ অচৈতন্য-রাজ্যেই প্রবেশ করাইতেছে।

জড়-প্রগতি ও প্রভুত্ব-কামনার অনিবার্য্য-ফলরূপে বিশ্ব-সংঘর্ষ ও নানাপ্রকার জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইতেছে। জড়কামের প্রগতি কখনও ব্যক্তিগত শান্তিও আনয়ন করিতে পারে না, বিশ্ব-শান্তি ত' দূরের কথা। আবার শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া যাহারা প্রেমের নামে কামের উপাসক, তাহারা অধিকতর জগদ্বঞ্চক; তর্কযুগের এই বিপদের সময়ে শ্রীচৈতন্যের নিজজনগণ এই পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-মৃতধারা বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রে যে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় তাহার পরিপূর্ণ সারভাগ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্দর্শন ও তন্ত্র-শাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সদুপদেশ আছে, তাহা সমস্তই তাত্ত্বিকরূপে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। বিদেশীয় ধর্ম্মশিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মসমূহে যে-কিছু সদ্বস্তু আছে, স্বদেশীয়, বিদেশীয়—কোন শাস্ত্রেই যাহা পাওয়া যায় না, তাহাও শ্রীচৈতন্যদেবের পরিপূর্ণ শিক্ষায় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা একাধারে সরল ও গম্ভীর। সরল,—যেহেতু নিরক্ষর মানবের পক্ষেও যে-ধর্ম্ম স্বাভাবিক, তাহা ইহাতে আছে; গম্ভীর,—যেহেতু তর্কবিচার ও শাস্ত্রজ্ঞানে পারঙ্গত পরম পণ্ডিতদিগেরও যাহাতে পরমোপকার হয়, এরূপ পরমধর্ম্ম

আছে। গৃহস্থ ও বৈরাগী, বালক-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও শিক্ষা হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বরণ করিতে পারেন। যে-কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও সরল হইতে পারিলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মকে নিত্য সার্ব্বজনীন চিৎসমন্বয়-বিধানকারী পরমধর্ম্মরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত তাঁহার প্রত্যেক লীলা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া যথাসাধ্য সাধারণের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তর্ক ও বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের যুগে প্রকৃত পরা শান্তির পিপাসু ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল প্রেমধর্ম্মের আলোচনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাসূত্রে গ্রথিত হইলে প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের বিস্তার হইবে—অতি আনুষঙ্গিকরূপেই সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের অমানিশার অবসান হইবে—প্রকৃত জগন্মঙ্গলের আবির্ভাব হইবে।

'শ্রীচৈতন্যদেব'-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইবার ছয়মাস পরেই নিঃশেষিত হয় এবং তাহার প্রাপ্তির জন্য বহু লোকের আর্ত্তি উপস্থিত হয়, কিন্তু এই ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিতে কিছু সময় অতিবাহিত হইলেও সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের উৎকণ্ঠা বিলুপ্ত হয় নাই। এই গ্রন্থটি বালক ও বৃদ্ধ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক—উভয় সমাজেই সমাদৃত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থটিকে তাঁহাদের বিদ্যায়তনের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বহু

বিদ্যায়তনের পাঠাগারেও এই গ্রন্থটি বিশেষ আদৃত হইয়াছে। কয়েকটি সাধারণ সাময়িক সংবাদপত্রেও এই গ্রন্থের প্রশস্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থের অনেক স্থান পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও তাঁহার প্রেমধর্ম্ম-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দুইটি পৃথক্ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের দুইটি প্রাচীনতম মানচিত্র—যাহা গৌড়ীয়মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ লণ্ডন হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার আলোকচিত্র উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচালক-সমিতির সৌজন্যে আমরা প্রাপ্ত হইয়া উহার দুইটি ব্লক করাইয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিতে পারিয়াছি। এজন্য উক্ত পরিচালক সমিতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যুদ্ধের দরুণ কাগজের মূল্য ও ছাপার ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত এবং পূর্ব্ব হইতে গ্রন্থের কলেবর বিস্তৃত ও কএকটি বহু ব্যয়সাধ্য ব্লক ইহাতে ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রন্থের ভিক্ষা যৎসামান্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণের যাবতীয় আয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী-প্রচার এবং তাঁহার শিক্ষা ও সাহিত্য-বিস্তারার্থ ব্যয়িত হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীভৈমী একাদশী
২৬ মাধব, ৪৫৪ শ্রীচৈতন্যাব্দ
২৬ মাঘ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাবিন্দু-প্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

বিষয়-সূচী

পরিশিষ্ট

আলেখ্য-সূচী

"অর্চ্চনকারী নিজের ব্যক্তিগত মঙ্গল সাধন করেন, আর কীর্ত্তনকারী সমগ্র জগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—পশু-পক্ষী-দেব-মানব, এমন কি, বৃক্ষ-লতা-প্রস্তরাদির পক্ষে যে-টা সব-চেয়ে বড় উপকার, সেরূপ উপকার সাধন করেন। মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে—সকল কালে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপকার। এ উপকার কোন দেশবিশেষের উপকার, অন্যদেশের অপকার নহে; এ উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িক, নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও 'অমন্দ' প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া 'অমন্দোদয়া দয়া'—তাই মহাপ্রভু মহাবদান্য—তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ 'মহা-মহা-বদান্য'। এসকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সব-চেয়ে বড় সত্যকথা।"

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যদেব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। তখন পাঠান-লোদীবংশের প্রবল প্রতাপ। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বাহ্‌লুল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রথম পাঠান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বাহ্‌লুলের পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর লোদী রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকন্দরের রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে তাঁহার বাল্য-লীলা, অধ্যাপনা-লীলা এবং পরে সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিয়া পুরী গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের তিন বৎসর পর সিকন্দরশাহ্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত আটাশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাহার পর সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহিম লোদী রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমথুরার দেবমন্দিরসমূহ ধ্বংস-লীলার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব কখনও পুরীতে অবস্থান, কখনও বা দাক্ষিণাত্য, বঙ্গ ও শ্রীব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে পরিব্রাজকরূপে নাম-প্রেম প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থান-কালের শেষভাগে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় (১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল)। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, উহার শিখা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক গগনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় বাঙ্গালার সুলতান ছিলেন—জালালুদ্দিন ফতেশাহ্ (১৪৮২—৮৬), ফিরোজ শাহ্ (১৪৮৬—৮৯), তৎপরে (নাসির্ উদ্দীন্) মহ্মুদ্শাহ্ (১৪৮৯—৯০), তৎপরে মজঃফর শাহ্ (১৪৯০—৯৩), তৎপরে আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ্ (১৪৯৩—১৫১৯), তৎপরে নছরৎ শাহ্ (১৫১৯—৩২), তৎপরে (আলাউদ্দীন্) ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২), তৎপরে (গিয়াস্উদ্দীন্) মহ্মুদ্ শাহ্ (১৫৩২—৩৮), তৎপরে হুমায়ুন।

উড়িষ্যায় তখন সূর্য্যবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তমদেব * উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব

* এই শ্রীপুরুষোত্তমদেবই সাক্ষীগোপাল-শ্রীবিগ্রহকে বিদ্যানগর হইতে কটকে আনিয়া স্থাপন করেন।—চৈঃ চঃ মঃ ৫ম পঃ ১১৯—১৩৩ সংখ্যা।

১৪৯৭—১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা শাসন করেন। এই সময় বাঙ্গালার সুলতান হোসেন শাহের প্রবল প্রতাপ। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় এগার বৎসর পরে শ্রীপ্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরও প্রায় ছয় বৎসর উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশ অরাজকতার রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে (১৪১৪) রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহের বংশধরগণকে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু পিতৃসিংহাসনে বসিবার পর মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দীন্ মহম্মদ শাহ্ নামে পরিচিত হন। রাজ্যের ওম্‌রাহগণ তখন যদুর পুত্র আহম্মদ শাহ্‌কে হত্যা করিয়া ইলিয়াস শাহের এক বংশধরকে বঙ্গের সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইহার পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হাব্‌শী-ক্রীতদাসগণ বঙ্গদেশে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান রুকনুউদ্দীন বার্‌বক্ শাহ্ আফ্রিকা হইতে হাব্‌শী খোজাগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও নরহত্যার তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে পুনরায় বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। মুসলমান-নরপতিগণ অবরোধ রক্ষার জন্য হাব্‌শী ক্লীব ক্রীতদাসদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। সময় সময় ক্রীতদাসগণ রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া পরে

বিশ্বাসহন্তা ও প্রভুহন্তা হইয়া পড়িত। বঙ্গদেশে তখন কপটতা, ষড়যন্ত্র, ব্যভিচার, নরহত্যা, নরপতিহত্যা, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও অরাজকতা যে ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অরাজকতায় অস্থির হইয়া বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান আমীরগণ অবশেষে আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ্‌কে বাদশাহ্ বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত উক্ত হোসেন শাহের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। ইহা আমরা যথাস্থানে বর্ণন করিব।

বাদশাহ্ হোসেন শাহ্ তদানীন্তন যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদের অধিবাসী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের কুলে আবির্ভূত শ্রীসনাতনকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর * পদে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে 'সাকরমল্লিক' ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপকে 'দবিরখাস' † (প্রাইভেট্ সেক্রেটারী) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত হাজীপুরে (পাটনার অপর পারে) ‡ বাদশাহের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভ (শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদত্ত নাম শ্রীঅনুপম—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর পিতৃদেব) গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বাদশাহ্ হোসেন শাহের উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযানের অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া দবিরখাস ও সাকরমল্লিক বিশেষ ব্যথিত হন। হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ § করিয়া উড়িষ্যার

---

* চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩—২৩; † চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১৭১ ও চৈঃ চঃ মঃ ১।১৭৫; ‡ চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৮; § চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৬৭।

দেবমন্দিরসমূহ নষ্ট করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ্ তাঁহার বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধিরায়কে জাতি-ভ্রষ্ট * করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই হোসেন শাহের গুরু মৌলানা সিরাজুদ্দীন্ বা চাঁদকাজী তখন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে নিমাইর প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের নিকটবর্ত্তী জনৈক নাগরিকের কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দেন। কাজীর এলাকায় বাস করিয়া যদি কেহ হরিকীর্ত্তন করেন, তবে তাঁহাকে দণ্ডিত ও জাতি-ভ্রষ্ট করা হইবে—কাজী এই হুকুম জারি করেন। † তখন প্রতাপরুদ্রের রাজ্য উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে বা বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় গমনাগমন বিপজ্জনক ছিল। পিছল্দা ‡ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজার অধিকার ছিল। যাহাতে এক রাজার প্রজা বা এক রাজ্যের লোক আর এক রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে,—এজন্য স্থানে স্থানে শূল পাতিয়া রাখা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থান-কালে ও তাঁহার অপ্রকটের প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাহ্মনি রাজ্যের অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। বিজাপুর বিজয়নগরের সহিত বিবাদে

* চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৮০-১৮৬ ; † চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৭৮ ; ‡ ডায়মণ্ডহারবারের অপর পারে রূপনারায়ণ নদের তীরে মেদিনীপুর জেলার তম্লুক্ মহকুমার অন্তর্গত 'পিছল্দা' নামক গ্রাম।

রত ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই যুগের বিবরণে পাওয়া যায়,—কেবল হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বীভৎস ইতিহাস।

মেবারের রাজপুত-রাজ্য—যাহা হিন্দুর শৌর্য্য, বীর্য্য, আভিজাত্য ও স্বাধীনতার উদয়গিরি বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তথায়ও অশান্তির ঘোর অন্ধকার প্রবেশ করিয়াছিল। ১৪৩৩ হইতে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে মেবারের বিখ্যাত মহারাণা কুম্ভ মুসলমান সুলতানদিগকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অবশেষে নিজের পুত্রের হস্তেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কুম্ভের পৌত্র 'সমরশত-বিজয়ী' রাণা সংগ্রামসিংহ (১৫০৮—১৫২৭ খৃঃ) ভারতবর্ষকে অহিন্দুগণের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করিতেছিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে যখন বাবরের দ্বারা ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলেন, তখন রাণা ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ নবাগত মোগলের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজপুত-প্রধানকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহার পরিকল্পনা সফল করিবেন; কিন্তু তিনি ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুরসিক্রীর নিকট খানুয়ার যুদ্ধে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—পার্থিব স্বাধীনতার স্বপ্ন চপলার ন্যায় চঞ্চল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব পরিব্রাজক-লীলার অভিনয় করিয়া নীলাচলে, দাক্ষিণাত্যে, কখনও বা বঙ্গে, কখনও বৃন্দাবনে পরা শান্তির উৎস শ্রীকৃষ্ণ-নাম-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা

অনেকের ধারণা, অর্থ থাকিলেই সব হয়—সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম, সকলের মূলই অর্থ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব, পর ও সমসাময়িক বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা এই ধারণাকে সমর্থন করিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রকটের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল। আফ্রিকার পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা মহম্মদ তুগ্‌লকের আমলে (১৩২৫ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশের দ্রব্যমূল্যের একটি তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। তখন বর্ত্তমান কালের প্রতি মণ ধান্য দুই আনায়, ঘৃত প্রতি মণ এক টাকা সাত আনায়, চিনি প্রতি মণ এক টাকা সাত আনায়, তিল-তৈল প্রতি মণ সাড়ে এগার আনায়, পনর গজ উত্তম কাপড় দুই টাকায় ও একটি দুগ্ধবতী গাভী তিন টাকায় পাওয়া যাইত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক পরে নবাব শায়েস্তা খাঁর যুগেও আমরা এক টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইবার কথা প্রবাদের ন্যায় এখনও উল্লেখ করিয়া থাকি। সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর সুলভ যুগ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও সমসাময়িক যুগে স্বপ্নের কথা ছিল না, তথাপি সেই সময়ের আর্থিক উন্নতাবস্থা নানাপ্রকারে বিপৎসঙ্কুল ছিল।

লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ দম্ভ ও প্রতিযোগিতা-মূলে পুতুলের বিবাহ, পালিত কুকুর-বিড়ালের বিবাহ, পুত্র-কন্যার বিবাহ বা মনসা-পূজা প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। * ব্যবহারিকতা ও লৌকিকতাতেই তাঁহাদের অর্থ নিযুক্ত হইত। লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টির মধ্যে বাস করিয়াও তাঁহারা সর্ব্বদাই ভয়, অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে থাকিতেন।

কেহ কেহ তখন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অর্থরাশি প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। তথাপি একদিকে রাজা, আর এক দিকে দস্যু-তস্করের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। অর্থ দূরে থাকুক, তখন পতিব্রতার সতীত্ব, মানীর আভিজাত্য ও মান লইয়া নিরাপদে বাস করাও কঠিন হইয়াছিল। স্বেচ্ছাচারী রাজার যথেচ্ছাচারিতার যূপকাষ্ঠে ঐ সকল ধন, রত্ন, স্ত্রী, সম্মান যে-কোন সময়ে বলি দিবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। ইতিহাসের বহু বহু ঘটনা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

---

* রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৬২, ৬৫, ৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও তৎকালে বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চার বিশেষ সমাদর ছিল। তখন বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ, বিদ্যা ও সাহিত্য-সাধনার প্রধান পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে পণ্ডিত ও পড়ুয়া ছাত্র বাস করিতেন। বালকও ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিতের সহিত বিচার-যুদ্ধে প্রতিযোগী হইত। ঘট-পটের বিচার লইয়া কালক্ষেপ করাই মহা-গৌরবের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য নানা দেশ হইতে লোক আসিতেন। নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত না করিলে কেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতেন না। নবদ্বীপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ন্যায় প্রবীণ বৈয়াকরণ, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও মুরারিগুপ্তের ন্যায় নৈয়ায়িক ও কবি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বৈদান্তিক এবং তৎপূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের সভা-বিভূষণ জয়দেবের ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহা-কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই সময়ের নবদ্বীপের এইরূপ একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

> ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ।
> সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহা-দক্ষ॥

সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য-সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যা-রস' পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয়॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৫৮-৬১, ৬৮

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লেখক শ্রীকবিকর্ণপূরও এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

অভ্যাসাদ্যউপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্ত্যাদি-শব্দাবলে-
র্জন্মারভ্য সুদূর-দূরভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিককল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ২য় অঃ ৪র্থ সংখ্যা।

নৈয়ায়িক তার্কিকগণ জন্মকাল হইতে কেবল 'জাতি', 'অনুমিতি', 'উপাধি', 'ব্যাপ্তি' প্রভৃতি শব্দের আলাপ করিতেছেন; ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গ ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। যিনি যত অধিক কল্পনা-নিপুণ, তিনি তত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত। ইঁহারা কল্পনাকেই শাস্ত্র মনে করিয়া থাকেন।

তদানীন্তন সাহিত্য-ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিলে যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপালের গীত, মনসার গান, শীতলা-মঙ্গল, মঙ্গলচণ্ডী-

বিষহরির পাঁচালী, শিবের ছড়া, ডাকপুরুষ ও খনার বচন প্রভৃতি গ্রাম্য ও লৌকিক সাহিত্য-সম্ভারই অধিকভাবে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহাভারত ও রামায়ণের সাহিত্যকেও নানাপ্রকার কল্পনা, তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাস-দোষের তুলিকার সংযোগে মূল রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা হইতে পৃথক্ করিয়া লৌকিক-সাহিত্যের ন্যায়ই আমোদ-প্রমোদের উপযোগী করা হইয়াছিল। সুসাহিত্যের এইরূপ দুর্ভিক্ষের দিনে নব-বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতের প্রাক্কালে পিক-পক্ষীর অস্পষ্ট কাকলীর ন্যায় মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলীর ঝঙ্কারে জয়দেব, গুণরাজখান প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য সাহিত্যিকগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের আগমনী-গীতি গান করিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কুলীন-গ্রামবাসী মালাধর বসু ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় তের বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ—"শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত করেন। হোসেন শাহ্ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার বিদ্যোৎ-সাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বাদশাহ্ শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গপদ্যানুবাদককে সাহিত্যচর্চ্চার জন্য পুরস্কৃত করিলেও শ্রীচৈতন্য-দেবের সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব যখন গৌড়ে রামকেলিতে গমন করেন, তখনই তাঁহার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হোসেন শাহ্ শ্রীচৈতন্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও তাঁহার সমসাময়িক যুগে সমাজের মেরুদণ্ড বর্ণাশ্রমের অবস্থা নানা ভাবে পক্ষপাতগ্রস্ত হইয়াছিল। শ্রীকবিকর্ণপূর, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এই সময়ের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সমাজের মধ্যে তখন কলির 'ভবিষ্য আচার' প্রবেশ করিয়াছিল। সামাজিক ব্রাহ্মণগণ সূত্রমাত্র-চিহ্ন ধারণ করিয়া কেবলমাত্র দান-গ্রহণ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ প্রজা-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া কেবল 'রাজা' উপাধি-মাত্র সম্বল করিয়াছিলেন, বৈশ্যগণ বৌদ্ধ বা নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, শূদ্রগণও ব্রহ্মবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

চারি বর্ণের ন্যায় চারি আশ্রমেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিবাহে অক্ষম হইয়াই লোকে 'ব্রহ্মচারী' অভিমান করিতেছিল, গৃহস্থগণ অন্যান্য আশ্রমীর প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হইয়া নানাপ্রকার অধর্ম্মের সহিত স্ত্রী-পুত্রাদির উদর-ভরণে ব্যস্ত ছিল। 'বানপ্রস্থ' শব্দটী কেবল নামে-মাত্র শুনা যাইতেছিল। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"—অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের পরে বনে গমন করিবে,—এই কথা কেবল পুঁথিগত হইয়া

রহিয়াছিল, সন্ন্যাসীর অভিমান করিয়া কতকগুলি লোক সন্ন্যাসের পবিত্র বেষের অপব্যবহার করিতেছিল, উহাকে জীবিকার্জ্জনের যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল ; কেবল পরস্পরের মধ্যে বিদ্যাকুলের অহঙ্কার, বিষয়-সুখভোগের প্রতিযোগিতা, মদ্য-মাংস-দ্বারা অবৈদিক দেবতাগণের পূজাদি-আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া লোকসমূহ আত্মগৌরব অনুভব করিতেছিল। হরিনদী-গ্রামের 'দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ' (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৬৭), গোপাল চক্রবর্ত্তী (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৮৮), ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খান (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১০১) প্রভৃতি তদানীন্তন সমাজনায়কের চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন ও কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তদানীন্তন বহির্ম্মুখ বর্ণাশ্রম ও সমাজের অবস্থা দেখাইয়াছেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপে নিজের ঘরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, তাহা তদানীন্তন তথা-কথিত হিন্দু-সামাজিকগণের অসহনীয় হইয়াছিল—

কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্ত্তন ?
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ত্তন ?
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে ॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে,—'হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥
মহা তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥'

কেহ বলে,—'এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥'

—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১০৯—১১৫

তদানীন্তন হিন্দু-সমাজ উচ্চ কীর্ত্তনের বিরোধী ছিল। হরি-কীর্ত্তনকারী পারমার্থিক বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মী স্মার্ত্ত-সমাজের উপহাস ও নির্য্যাতনের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন—

সর্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশো না জানে কেহ কেমন কীর্ত্তন॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥
আপনা-আপনি সব সাধুগণ মেলি'
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহা-ক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' বল্গিয়াই মরে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫২—২৫৫

সমাজ তখন উচ্চ হরিকীর্ত্তনকারী বিশ্ববন্ধুগণকে বিশ্ববৈরী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিত। কোন কোন সামাজিক ব্যক্তি ভক্তগণের উচ্চ কীর্ত্তনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আশঙ্কা পর্য্যন্ত করিতেন!—

'এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা' হৈতে হ'বে দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ॥

এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক-কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে॥
গোসাঞিঞর শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ?
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞিঞ।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে,—ইথে দ্বিধা নাই॥'
কেহ বলে—'যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে॥'

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫৬—২৬০

বহির্ম্মুখ সমাজের নিকট হরিকীর্ত্তন সার্ব্বকালিক কৃত্য বলিয়া গণিত হইত না। কোন বিশেষ ব্যাপারে ব্যবহারিক গতানুগতিক রীতি অনুসারে কোন কোন স্থানে প্রাণহীন হরিকীর্ত্তন অন্যান্য কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ন্যায়ই অনুষ্ঠিত হইত—

কেহ বলে,—'একাদশী-নিশি জাগরণে।
করিবে গোবিন্দ-নাম করি' উচ্চারণে॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ ?'
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৬১—২৬২

হিন্দু-সামাজিকগণ উচ্চকীর্ত্তন ও নৃত্যকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধতের ন্যায় হরিকীর্ত্তনে নৃত্য ও অকৃত্রিম ভাবোদয় একটা অত্যাশ্চর্য্য-ব্যাপার বলিয়া গণিত হইত—

শুনিলেই কীর্ত্তন, করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে,—'সব পেট-পুষিবার আশ॥'
কেহ বলে,—'জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য,—কোন্ ব্যভার?'
কেহ বলে,—'কত বা পড়িলুঁ ভাগবত;
নাচিব কাঁদিব,—হেন না দেখিলুঁ পথ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই, ভাই, ভোজন করিয়া॥
ধীরে-ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে?
নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে কি হয়ে?'

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।৫৩—৫৭

নদীয়ার লোক অনেক সময় উচ্চকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন—

'আমি—ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ'?
সংসারী সকল বলে,—'মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে॥
এগুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।'
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১—১৩

সমাজ তখন ধন-পুত্র-বিদ্যারসে ও নানা জড়বিলাসে মত্ত ছিল। পারমার্থিক-বৈষ্ণব দেখিলেই সামাজিকগণ নানাপ্রকার বিদ্রূপাত্মক ছড়া আবৃত্তি করিত এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করিত, দুনিয়ার

লোকের ন্যায় যতি, তপস্বীও দু'দিন পরে মরিয়া যাইবে, অতএব সংসারে ভোগ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য ! যাঁহারা দোলা ও গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িতে পারেন, যাঁহাদের অগ্রপশ্চাৎ দশ বিশ জন লোক গমন করে, তাঁহারাই মহা-পুণ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ! যে ধর্ম্মের আচরণে নিজের দারিদ্র্য-দুঃখ ও দেশের দুর্ভিক্ষ বিদূরিত না হয়, দেশের ও দশের সুখ-সুবিধা না হয়, তাহা ধর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নহে ! উচ্চকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের শান্তিভঙ্গ হয়, সুতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জগতে দুর্ভিক্ষ ও নানাপ্রকার অসুবিধা প্রেরণ করিয়া থাকেন !

জগৎ প্রমত্ত—ধন-পুত্র-বিদ্যা-রসে ।
দেখিলে বৈষ্ণব-মাত্র সবে উপহাসে' ॥
আর্য্যা-তরজা পড়ে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া ।
যতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া ॥
তারে বলি 'সুকৃতি',—যে দোলা, ঘোড়া চড়ে ।
দশ-বিশ জন যা'র আগে-পাছে রড়ে ॥
এত যে, গোসাঞি, ভাবে করহ ক্রন্দন ।
তবু ত' দারিদ্র্য-দুঃখ না হয় খণ্ডন !
ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি' ছাড় ডাক ।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১৭-২১

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরেও নবদ্বীপের তথা-কথিত হিন্দুগণ অহিন্দু কাজীর নিকট নিমাইর উচ্চকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নিমাই গয়া হইতে ফিরিয়া অভিনব উচ্চকীর্ত্তন প্রচার করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া দিতেছেন, নাগরিকগণকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন, হরিকীর্ত্তনের দ্বারা রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন ও নানা ভাবে শান্তিভঙ্গ করিতেছেন, ইহা কাজীর নিকট জানাইয়া নিমাইকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যুক্তি দিয়াছিলেন—

* * *

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি' জাগরণ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি' ॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥

হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥
—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২০৩-২১৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মজগতের অবস্থা

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পারমার্থিক-ধর্ম্মজগতের অবস্থা নানাপ্রকার কাল্পনিক-ধর্ম্ম ও কপটতার আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যবহারই পরমার্থের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন ভারতের অন্যান্য স্থানে যে-কিছু পারমার্থিক-ধর্ম্মের আলোচনা ছিল, তাহাও প্রবল অসদ্ধর্ম্মের মতবাদ-সমূহের সহিত সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শুদ্ধতা-সংরক্ষণে অসমর্থ ও ক্ষীণজীবী হইয়া পড়িয়াছিল! দাক্ষিণাত্যে শ্রীযামুনাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পরে রামানন্দি-শাখায় প্রবাহিত হইলে তাহাতে অলক্ষিতভাবে 'মায়াবাদ' প্রবেশ করিয়াছিল; এমন কি, পরবর্ত্তিকালের শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার-প্রচারের মধ্যেও স্মার্ত্ত-আচারের ন্যূনাধিক আদর ও পারমার্থিকগণের প্রতি

জাতিবুদ্ধি প্রভৃতির বিচার লক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রচারক দেবতনু শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে কতকটা বিদ্ধাদ্বৈতবাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রচারের জয়স্তম্ভ-স্বরূপ 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত'-নামক বেদান্তভাষ্য কালক্রমে কেবলাদ্বৈতবাদের ভাষ্য-গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীধর ও শ্রীলক্ষ্মীধরকে কেবলাদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রচারেরও যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও তত্ত্ববাদি-শাখায় কিঞ্চিৎ অন্য রূপ ধারণ করিয়াছিল।

কবিকর্ণপূর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্মজগতের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়া, তৎকালে পারমার্থিক-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে কিরূপ ধর্ম্মধ্বজিতা ও কপট-বৈরাগ্য-নাট্য ধর্ম্মের পোষাক গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন—

> জিহ্বাগ্রেণ ললাটচন্দ্রজ-সুধা-স্যন্দাধ্বরোধে মহ-
> দ্দাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ।
> অস্যোপান্তনদীতটস্য কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভূৎ
> পানীয়াহরণপ্রবৃত্ততরুণীশঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ॥
> তদিদমুদর-ভরণায় কেবলং নাট্যমেতস্য।
>
> —শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

এই ব্যক্তি নদীতীরে মুদ্রিত-নয়ন হইয়া বদ্ধাসনে ধ্যান ও কুম্ভক করিয়া যোগনৈপুণ্য দেখাইতেছেন, কিন্তু হঠাৎ ইঁহার সমাধিভঙ্গ হইল কেন ? জল আহরণে আগতা কোন তরুণীর শঙ্খবলয়ের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যোগীর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত ! অতএব ঐ ব্যক্তির যোগক্রিয়ার এইরূপ প্রদর্শনী কেবল উদর-ভরণের অভিনয় !

তখন পুণ্যকামী লোকের তীর্থযাত্রার প্রতি আদর ছিল। কিন্তু ইহা অনেক সময়ই ভগবানের সেবা ও সাধুসঙ্গ লাভের উদ্দেশ্যে না হইয়া দেশ-ভ্রমণরূপ কাম-কৌতূহল-চরিতার্থ করিবার জন্যই অনুষ্ঠিত হইত। কে কতবার আকুমারিকা হিমাচল ভ্রমণ করিয়াছেন, কে কয়বার বদ্রীনারায়ণ গমন করিয়াছেন, কে কত তীর্থে স্নান-দান করিয়াছেন, ইহা লইয়াই পুণ্যকামিগণ বৃথা গর্ব্ব করিতেন।

> গঙ্গা-দ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুষ্কর-
> শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্।
> অব্দেনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্য্যট-
> ন্নব্দানাং কতি বা শতানি গমিতান্যস্মাদৃশানেতু কঃ॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২য় অঙ্ক, ৭ম সংখ্যা

আমি গঙ্গা, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, কাশী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গম, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি তীর্থ-সমূহ প্রতিবৎসর তিন চারিবার করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এ পর্য্যন্ত কত শত বৎসর কাটাইলাম, আমাদের ন্যায় মহাপুরুষকে কে চিনিতে পারে !

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শ্রীরামানন্দ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। * তিনি সীতা-রামের উপাসনা প্রচার ও জমায়েৎ বা রামায়েৎ সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তাঁহার মত, রামানুজ-সম্প্রদায়ের মত হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-অনুসারে তিনি ভগবৎপ্রসাদে ও ভগবানের সেবকের মধ্যে স্পর্শদোষ-বিচার ও জাতি-বুদ্ধি করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচারের মধ্যে চরমে ভগবানে লীন হইয়া যাইবার ন্যূনাধিক বিচারই দেখিতে পাওয়া যায়। ‡ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মতে ভগবানে লীন অর্থাৎ তাঁহার নিত্য-সেবা হইতে বঞ্চিত হইবার কোনও কথা বিন্দুমাত্রও স্থান পায় নাই।

শ্রীরামানন্দের বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে কবীর এক জন। ইনি বস্ত্রবয়নকারী কোন মুসলমানের পুত্র ছিলেন। তিনিও চরমে নির্বিশেষ-মতই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। † তাৎকালিক

---

* নাভাদাসের হিন্দী ‘ভক্তমালে’র টীকাকার ‘বার্ত্তিকপ্রকাশে’র রচয়িতা ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মাঘমাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে প্রয়াগে রামানন্দের আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে,—রামানন্দ ১৪৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। ফর্ক্‌হর সাহেবের মতে,—রামানন্দ ১৪২৫ অথবা ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

‡ অনেকে শ্রীরামানন্দকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী বলিবারই পক্ষপাতী। ফর্ক্‌হর সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও এই মত।

† আধুনিক রামানন্দিগণ দুই জন কবীরের কথা বলেন। তাঁহাদের মতে,—নির্বিশেষবাদী কবীর, কবীরপন্থিদলের প্রবর্ত্তক এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মূল-কবীর বা রাম-কবীরই রামানন্দের শিষ্য।

রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের একই ঈশ্বর—এই মত প্রচার করেন।

কেহ কেহ বলেন, কবীরের মতবাদের উপরই নানক পঞ্চদশ শতাব্দীতে শিখ্-সম্প্রদায় * প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্ম-মত হইতে কিছু কিছু নৈতিক উপদেশ সংগ্রহ করিয়া উভয়ের সংমিশ্রণে একটি রাজনৈতিক ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষ ও বিদ্বেষের দিনে নানকের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বেই নানকের অভ্যুদয়-কাল।

রামানন্দ ও কবীর প্রধানতঃ উত্তর ভারতে এবং নানক পাঞ্জাবে তাঁহাদের ধর্ম্ম-মত প্রচার করেন। যে-সময় সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ রাজনৈতিক সমরানলে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হিন্দু ও মুসলমানের বিদ্বেষভাবকে সাময়িক-ভাবে প্রশমিত করিবার লৌকিক উদ্দেশ্যে তদনুযায়ী ধর্ম্ম-মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু রামানন্দ, কবীর বা নানকের আপাত উদার-ধর্ম্মের যাদুমন্ত্রের প্রভাবেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের চেস্টা চিরস্থায়ী হয় নাই। শিখ্-সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ধর্ম্মকে তাঁহারা আর তখন গুপ্ত রাখিতে চাহিলেন না। অর্জ্জুনের

* 'শিখ'-শব্দের অর্থ—শিষ্য। নানক লাহোরের নিকটবর্ত্তী তালবন্দী গ্রামে (বর্ত্তমান নানাকানা) জন্মগ্রহণ করেন।

পুত্র হরগোবিন্দ শিখ্‌দিগকে রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। নবম গুরু তেগ্‌বাহাদুর স্বধর্ম্মের জন্য শির দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গুরুগোবিন্দ সিংহের শিক্ষায় শিখেরা দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে শিখ্‌দিগের শেষ-গুরু গুরুগোবিন্দ আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

যখন ভারতের অন্যান্য স্থান রাজনৈতিক-ধূমে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বঙ্গদেশেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াচিল। তখনকার ধর্ম্মের অবস্থার চিত্র ঠাকুর বৃন্দাবনের তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত দেখিতে পাই—

ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক-সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি’ মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত-তপস্বি-অভিমানী।
তাঁ’-সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
‘গোবিন্দ’, ‘পুণ্ডরীকাক্ষ’ নাম উচ্চারয়॥
গীতা-ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় অঃ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া তচ্ছিষ্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীশিবানন্দসেনের শ্রীমুখে শ্রবণ ও শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' রচয়িতা শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী সমসাময়িক ভারতের ও বঙ্গের এই সকল প্রামাণিক ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নিরপেক্ষ কথা তাৎকালিক এক সম্প্রদায়ের উপর কালিমা আরোপ করে মনে করিয়া তাঁহাদের আধুনিক বংশধরগণ নানাপ্রকার স্বকপোল-কল্পিত মত ও যুক্তির দ্বারা প্রকৃত ইতিহাসকে বিপর্য্যয় করিতে চাহেন। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব ঐতিহাসিক-গণের নিরপেক্ষ-মত বর্ণনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাকে শ্লথ করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন,—"বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে বিষ্ণু-নাম

উচ্চারণ-পূর্ব্বক আচমন, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান, শালগ্রাম-তুলসী-সেবা, গীতা-ভাগবত-ব্যাখ্যা প্রভৃতি সদাচার আবহমানকাল হইতে প্রচলিত। ইহার কোনও দিনই ব্যাঘাত হয় নাই।”

পঞ্চোপাসক বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের এরূপ গতানুগতিক সদাচার, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান প্রভৃতিকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অজ্ঞ জনসাধারণ ‘ভক্তি’ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু সুপ্রাচীন আলোয়ারগণ এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণ কেহই ঐরূপ আচারকে ‘শুদ্ধভক্তি’ বলেন নাই। কেবল যে অনির্ব্বচনীয় ‘প্রেমভক্তি’ চিরকালই সুদুর্ল্লভ,—এই বিচারেই পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড় বা মায়াবাদিগণের ভক্তির অভিনয়কে ভাগবতগণ ‘ছলভক্তি’, ‘বিদ্ধা ভক্তি’, ‘প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা’, ‘কপটতা’ বা ‘অভক্তি’ বলিয়া নিরাস করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু তাহাদের ঐরূপ ভক্তিতে (?) চরম প্রাপ্য বা উপেয়রূপে নির্ব্বিশেষ-মুক্তি লক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের ভক্তির অভিনয়কে ‘অভক্তি’ বলিয়াছেন।

মিশ্রভক্তি যাজনকারী কনিষ্ঠাধিকারী ‘প্রাকৃত ভক্ত’ নামে খ্যাত হইলেও তাঁহার ভক্তি-চেষ্টাকে ‘অভক্তি’ বলা যায় না; কিন্তু পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড় বা মায়াবাদীর ভক্তি-চেষ্টাকে ভাগবতগণ চিরকালই ‘অভক্তি’ বলেন; কেন না, তাহার মূলে ‘নির্ব্বিশেষবাদ’ রহিয়াছে।

> তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
> যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

কর্ম্মজড়গণের সন্ধ্যা-বন্দনাদি, শালগ্রাম-পূজা, তুলসীতে জল-প্রদান, গীতা-ভাগবত-পাঠ, গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ-নামোচ্চারণ, ‘তারকব্রহ্ম’ নাম জপ, নববিধ-ভক্তি-যাজনের অভিনয়, পরিক্রমা, স্তবপাঠ, বিষ্ণুতীর্থ-ভ্রমণাদি—সকলই মুক্তিবাঞ্ছা বা নির্ব্বিশেষ-গতি লাভের ইচ্ছামূলে, কিংবা দেবান্তরে স্বতন্ত্রেশ্বর-বুদ্ধি-মূলে অনুষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ভক্তির স্বরূপ, আর ‘বিষয়’, ‘আশ্রয়’।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তা’র কৃষ্ণ-সেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

—ভাঃ ৭।৯।৪৬

হে মহাপুরুষ! মুক্তির সাধক মৌন, ব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি দশবিধ উপায় অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবন-যাপনের সহায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু দাম্ভিকগণের কদাচিৎ তাহা না হইতেও পারে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু নির্ব্বিশেষবাদী, হৈতুক ও মীমাংসক অর্থাৎ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণকে ভক্তিবহির্ম্মুখ বলিয়াছেন এবং যেরূপ চোরের নিকট হইতে মহা-নিধিকে রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ

ইহাদের নিকট হইতেও কৃষ্ণভক্তি-মহা-নিধিকে গোপনে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। *

"বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক, সুতরাং বঙ্গদেশে কোন-কালে 'কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার'—এইরূপ অবস্থা ছিল না।" এইরূপ যাঁহাদের যুক্তি, তাঁহারা ভাবপ্রবণতাকেই 'ভক্তি' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

ভগবদ্‌ভক্তি বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উৎকলবাসী বা ভারতবাসী, ইংরেজ, জার্ম্মান প্রভৃতি কোন জাতি-বিশেষের স্বাভাবিক সম্পত্তি নহে। ভক্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম-উপাধি-নির্ম্মুক্ত প্রত্যেক **নির্ম্মল জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি**। ভাবপ্রবণতা বাঙ্গালীর স্বাভাবিক, রজোভাব পাশ্চাত্যদেশবাসীর স্বাভাবিক—ইহা বলা যাইতে পারে; কিন্তু 'ভক্তি' কোনও জাতি বা বংশবিশেষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা বলা যাইতে পারে না।

'বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক' যদি ইহা ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে এখনই বা সেই স্বভাবের ব্যতিক্রম হয় কেন? এখন কৃষ্ণভক্তির পরিবর্ত্তে ভক্তি (?) উৎসাদনের চেষ্টা, ভক্তি-সদাচারের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচারিতা কি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে না?

* ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্ম্মুখাঃ॥
ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জড়মীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা॥

—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, পঞ্চম লহরী ৭৬-৭৭

আর যদি বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালীর দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে গীতার "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি" শ্লোক নিরর্থক হয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীই তখন স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, বা ভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও নিত্য বিষ্ণু-পূজাদি করিতেন, শ্রীচৈতন্যদেব কেবল ইঁহাদের সহিত লীলা-বিলাস করিতে আসিয়াছিলেন! এই জন্যই বুঝি তাঁহাকে পড়ুয়া-পাষণ্ডিগণের অত্যাচারে নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস লইয়া বঙ্গদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র বিচরণ ও অবস্থান করিতে হইয়াছিল! আর বাঙ্গালী হিন্দুগণ কাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া নিমাইকে নদীয়া হইতে বহিষ্কৃত করাইবার চেষ্টা করাইয়াছিলেন! তাঁহার সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গাইয়াছিলেন! শ্রীবাসাদি পণ্ডিতের ঘর-দ্বার গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল! আর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি আচার্য্যগণ মনের কথা বলিবার বা কৃষ্ণভক্তির কথা কীর্ত্তন করিবার একজন লোকও প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন!

ব্যবসায়ী কথক, পাঠক যে ভাগবত-পাঠের অভিনয় করেন, যে বিষ্ণু-মন্ত্র দান বা ভক্তি-ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, উহাকেও শ্রীমদ্ভাগবত 'ভক্তি' বলেন নাই; তাহা ভক্তির চরণে অপরাধ। 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইবার' জন্য শালগ্রামের পূজার অভিনয়, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় ভাগবত-পাঠ বা ভক্তি-ব্যাখ্যার অভিনয়—ভক্তি-ব্যাখ্যা নহে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ও দেবানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন এবং তিনি পরম 'জ্ঞানবান, তপস্বী, আজন্ম উদাসীন ও ভাগবতের মহা-অধ্যাপক' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার অভিনয়ের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেন না, দেবানন্দ মোক্ষাভিলাষী ও বৈষ্ণবাপরাধী ছিলেন।

রামদাস বিশ্বাস পরম রাম-ভক্ত, সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ ও মহাপ্রভুর পার্ষদ পট্টনায়ক-গোষ্ঠীদিগের কাব্য-প্রকাশের অধ্যাপক ছিলেন। বৈষ্ণবের সেবার প্রতিও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল; তথাপি রামদাসের অন্তরে মুমুক্ষা থাকায় মহাপ্রভু রামদাসের বিদ্ধা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলেন নাই। বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবি শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথদেবের প্রশংসা (?) করিয়াই তাঁহার নাটকের 'নান্দী'-শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু উহাকে 'ভক্তি' বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও মহামান্য শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুসারে নবদ্বীপের বহু পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলীও গান করিতেন। অনেক টোলে গীতগোবিন্দের পঠন-পাঠন হইত।"

টোলে বা সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, কিংবা সাধারণ সভায় গীতগোবিন্দের ন্যায় অপ্রাকৃত ভজন-গ্রন্থ পঠন-পাঠন 'ভক্তি'-

পদবাচ্য হওয়া দূরে থাকুক, ভক্তির চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ; কেন না, টোলে ঐ সকল গ্রন্থ প্রাকৃত-কাব্য-শিক্ষা-দান বা সাধারণ সভা-সমিতিতে প্রাকৃত কাব্যরস আস্বাদনের জন্যই পঠিত বা কীর্ত্তিত হয়। কোন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষবাদী শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠের অধিকারী নহেন। কেবল অনুস্বার-বিসর্গ জানিলেই শ্রীগীতগোবিন্দ বা শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ করা যায় না। ঐরূপ পাঠের অভিনয় ভক্তির স্থানে অমার্জ্জনীয় অপরাধ,—ভক্তি ত' নহেই। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ শ্রাদ্ধ-সভায় রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ (?) করেন; ইহা যে কতটা অভক্তি, তাহা দেহ-গেহাসক্ত শোকাচ্ছন্ন শূদ্র-প্রকৃতির অত্যন্ত অপরাধী কর্ম্ম-জড়গণ বুঝিতে পারিবে না। এজন্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ কার্য্যকে অভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানেন। হাটে-বাজারে 'রাই-কানুর গান', স্ত্রী-পুত্র-ভরণ-পোষণার্থ বা প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় পুরাণ-পাঠের বা কথকতার অভিনয় প্রভৃতি—যাহা দেবল ও অর্থকামী পুরোহিতগণের বৃত্তির ন্যায় পঞ্চোপাসক-সমাজ বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজে বঙ্গদেশে চলিয়া আসিয়াছে এবং যাহার অনুকরণ করিয়া লৌকিক গোস্বামিগণ (?) পুরাণ-পাঠ ও কথকতার ব্যবসায় খুলিয়াছেন, ঐ সকলই ভক্তিদেবীর চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এই সকল ভক্তির অভিনয় হইতে স্পষ্ট নাস্তিকতা অনেক ভাল; কারণ, তদ্দ্বারা লোকের অভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় না। অতএব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যে তদানীন্তন নবদ্বীপের লোককে ভক্তিবহির্ম্মুখ বলিয়াছেন, ইহা

সর্ব্বতোভাবে সমীচীন ও সত্য। ভগবদ্ভক্তগণ যাত্রার দলের 'নারদ'কে ভক্তরাজ নারদ বলেন না ও তাহার ভক্তির অভিনয়কেও 'ভক্তি' বলেন না। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, নির্ব্বিশেষবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, পঞ্চোপাসক, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী, অতিবাড়ি, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতির ভক্তির অভিনয় 'যাত্রার দলের নারদে'র ভক্তির অভিনয়ের ন্যায়; সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, শুদ্ধভক্তিরাজ্যের মূল মহাজন শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মুমুক্ষুদিগের ভক্তির সাধারণ সদাচার-পালনের অভিনয় দূরে থাকুক; অশ্রু, কম্প, পুলকাদির অভিনয়কেও 'প্রতিবিম্ব রত্যাভাস' * বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। অতএব উহা কখনও ভক্তি বা রতি নহে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, ঐ সকল অভিনয় দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণ চমৎকৃত হইতে পারে; কিন্তু অভিজ্ঞগণ বিমোহিত হন না।

---

* মুমুক্ষু-প্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি।
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে॥
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩ লহরী, ১৯-২০ শ্লোক

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক পৃথিবী

শুধু ভারতের নহে, তখনকার পৃথিবীর ইতিহাস—এক সঙ্ঘর্ষ-ময় যুগের ইতিহাস। তখন **Wars of the Roses** ও পাশ্চাত্য মধ্যযুগের অবসানকাল উপস্থিত হইয়াছে। নানাপ্রকার পৌরযুদ্ধ ও বৈদেশিক সঙ্ঘর্ষে পাশ্চাত্যদেশের প্রত্যেক জাতি ও সমাজ ন্যূনাধিক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই বর্ত্তমান যুগের সূচনা হইল ; এই জন্যই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দকে **"The Beginning of the Modern Age"** বলিয়াছেন। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম হেন্‌রী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল। এই সময় হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্য জগতেরও **"Renaissance"** বা "নূতন জন্মে"র সূচনা হইতেছিল। *

* While Henry VII was struggling with his difficulties, a series of explorations had suddenly multiplied the area of the world, and opened new horizons. * * * Even more important than the discoveries as a sign of the coming of a new era was the Renaissance which first began seriously to affect the life and thought of England in the time of Henry VII.—*Ramsay Muir.*

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ঠিক পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে সরাসর জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য পাশ্চাত্যজাতির প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামক একজন নাবিক উত্তমাশা-অন্তরীপে পৌঁছিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষের জলপথ উন্মুক্ত হইল। ক্রমে আরও কএক জন নাবিক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন, অবশেষে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-নাবিক ভাস্কোদা-গামা কালিকট্ বন্দরে পৌঁছিলেন। তখন শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ-লীলায় দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালক।

কে জানে—এই জলপথ আবিষ্কারের গৌণ উদ্দেশ্য অনেক কিছু থাকিলেও নবদ্বীপ-সুধাকরের নাম-প্রেম-প্রচারের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত যোগসূত্র রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাতে অন্তর্নিহিত ছিল কি না? পাশ্চাত্যের বণিক্ ভারতবর্ষের ধনরত্নে লাভবান্ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কে জানিত—ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন পরমার্থের বাণী তাঁহাদিগকে অধিকতর লাভবান্ করিবে? তখন কে জানিত—ভারতের এই জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় একদিন শ্রীচৈতন্যের নামহট্টের ব্রাজক-বিপণির প্রেমের পসরা-সহ প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে বিশ্বমঙ্গল-অভিযান হইবে?

সপ্তম হেন্‌রীর সময়ে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবাভ্যুদয় বা নবজাগরণের যুগে ইংলণ্ডের অক্স্‌ফোর্ড্ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাচর্চ্চা ও সাহিত্য-সাধনায় নবভাবে গঠিত হইয়াছিল। এদিকে

ঠিক সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেও ভারতের অক্স্‌ফোর্ড্‌ বা প্রধানতম সারস্বত-তীর্থ নবদ্বীপে পরা বিদ্যা, ভক্তি-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাধনার এক নবযুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়াছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যদেশে যখন **'Utopia' (No-where)** নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আদর্শ পার্থিব-সমাজের কাল্পনিক চিত্র প্রচার করিতেছিল, সেই সময় ও তৎপূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেব ঐকান্তিক পরমার্থের অনুগমনকারী আদর্শ সমাজের বাস্তব-চিত্র বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মার্টিন লুথার † পোপের যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা উড্ডীন করিয়া পাশ্চাত্যজগতে খৃষ্টধর্ম্মের এক সংস্কারযুগের উদ্বোধন করিলেন। এই সময়ে তদ্দেশে মুদ্রা-যন্ত্রের নূতন আবিষ্কার হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব ভারতবর্ষে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ ও নানাপ্রকার মতবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বাণী প্রচার করিয়াছিলেন; তিনি মার্টিন লুথার বা **জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম-সংস্কারকের ন্যায় সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করেন নাই**। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের

† * * * Thus a great part of Europe, including England was full of explosives only waiting for a spark; the spark came from Martin Luther, a friar professor of Wittenberg in Saxony, who in 1517 nailed to the door of the church there a number of *Theses* challenging the right of the Pope to sell indulgences, or exemptions from penance. A fierce controversy arose which was swiftly spread by the new invention of the printing-press.

—*Ramsay Muir.*

ঐতিহাসিকগণ এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতন্যদেবকে 'সংস্কারক' বলিয়া অমার্জ্জনীয় ভ্রম করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি সংস্কারক নহেন, তিনি সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্মের **পুনঃসংস্থাপক, বিকাশক ও পরিশিষ্ট-প্রকাশকের অভিনয় করিয়াও স্বয়ং বিকসিত সনাতন-ধর্ম্মের অধিদেবতা।** শ্রীচৈতন্য-দেবের সময়ে, কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্য গোস্বামিগণের সময়ে, কিংবা তৎপরবর্ত্তী যুগের শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ-শ্রীরসিকানন্দের সময়ে, কিংবা তাহারও পরবর্ত্তী যুগের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও বেদান্তভাষ্য-প্রণেতা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের সময়ে বঙ্গ-দেশে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রচলন হয় নাই। ভারতে ও বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রচারিত হইবার পর বর্ত্তমান যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার পুনঃসংস্থাপক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুদ্রাযন্ত্রকে প্রচার-কার্য্যে বিশেষ-ভাবে নিযুক্ত করেন। শ্রীচৈতন্য-গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিত, শ্রীভাগবত-স্পিচ্, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীকল্যাণ-কল্পতরু, 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচার করেন। তাঁহার সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য-যন্ত্রালয় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আরও

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অনেক শিক্ষা-গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। শ্রীগুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীসজ্জনতোষণীর দ্বিতীয় বর্ষের শেষাংশ, শ্রীচৈতন্যো-পনিষৎ, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, প্রেমপ্রদীপ (২য় সংস্করণ), শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (১ম সংস্করণ) ইত্যাদি শ্রীচৈতন্য-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে পাশ্চাত্যদেশে নবযুগ ও সভ্য-সুশাসন-পদ্ধতির সূচনা, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সন্ধান, ১৪৯২ খৃস্টাব্দে এক নূতন পৃথিবী আমেরিকার আবিষ্কার, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পথ সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় ও তৎসঙ্গে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রবর্ত্তন-দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নবজাগরণ অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর সহিত পারমার্থিক যোগসূত্র সংস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিয়া বঙ্গের ভাগ্যাকাশে যে বিশ্বস্নিগ্ধকারী অতিমর্ত্ত্য চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপ

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপ সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এখনও এই স্থানে বল্লাল সেনের স্মৃতিচিহ্নরূপে 'বল্লালদীঘি' নামক একটি বিস্তৃত দীঘি এবং উহার উত্তর দিকে 'বল্লালঢিবি' নামক বল্লাল সেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহের প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেনবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের রাজসিংহাসন এই নবদ্বীপে আনয়ন করায় এই স্থানকে "গৌড়ভূমি"ও বলা হয়। সেনরাজগণের অধঃপতনের পর নবদ্বীপ মুসলমান-রাজগণের হস্তগত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৯৮—১৫১১) বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি আলাউদ্দিন সৈয়দ হোসেন শাহের নিয়োগমতে শাসনাদি পরিচালনের জন্য ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজী এই নবদ্বীপেই অবস্থান করিতেন।

প্রাচীন নবদ্বীপের "বেলপুকুরিয়া" পল্লীর কিয়দংশ বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এই বামনপুকুরেই চাঁদকাজীর সমাধি ও তাঁহার গৃহের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা বা গৌড়ীয়-মিশনের পরিচালক-সমিতি এই শ্রীচৈতন্যকৃপা-প্রাপ্ত চাঁদকাজীর সমাধি-পাট রক্ষা করিতেছেন।
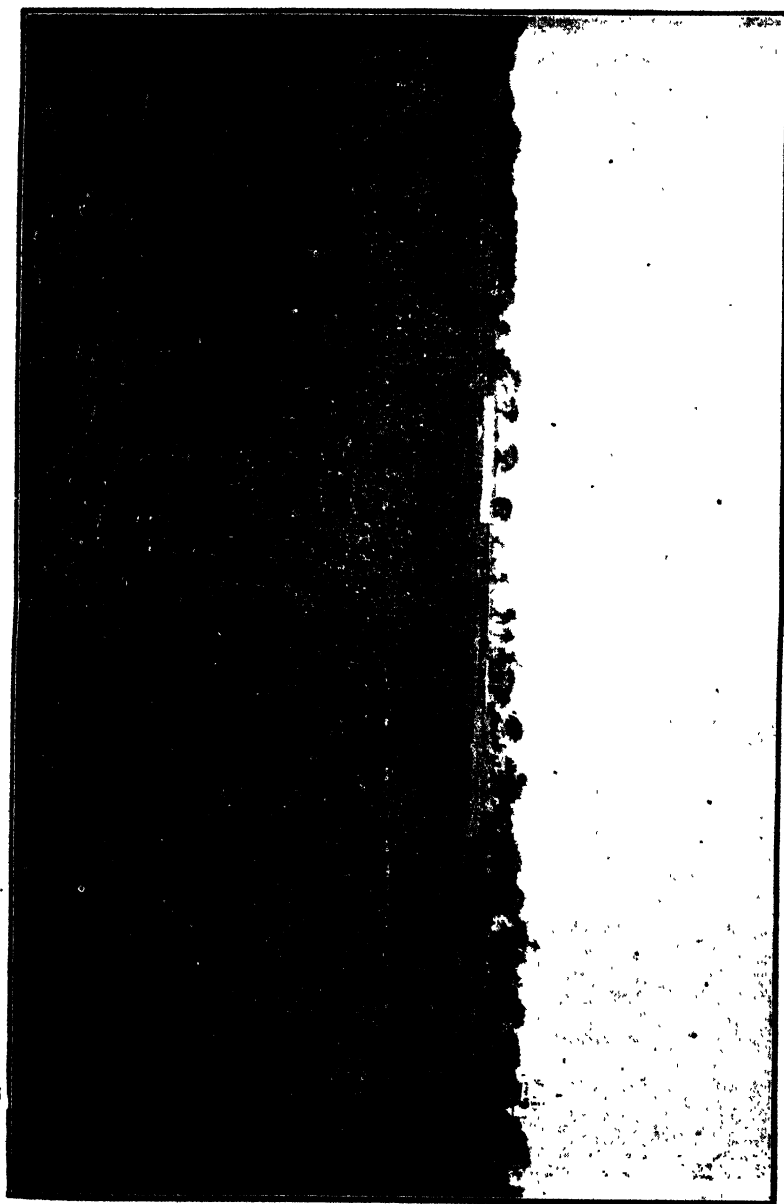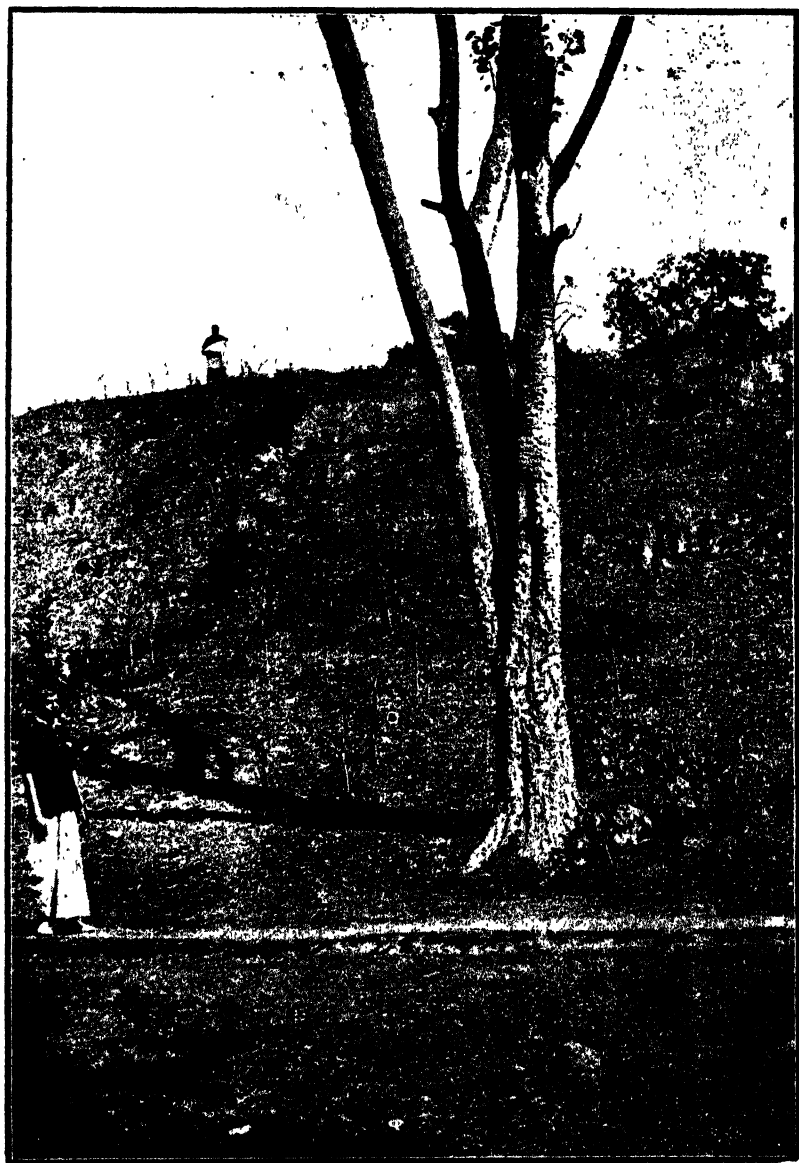
বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ

"Nabadwip is a very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A. D. by one of the Sen kings of Bengal. In the '*Aini Akbari*' it is noted that in the time of Lakshman Sen Nadia was the Capital of Bengal". (Nadia Gazetteer)

অর্থাৎ নবদ্বীপ একটি প্রাচীন নগর এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় কোন নৃপতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 'আইন-ই-আকবরী'তে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনের সময় নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর সমাধি, বামনপুকুর (শ্রীমায়াপুর)—৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

"Nadia was founded by Lakshman Sen in 1063." (Hunter's Statistical Account—p. 142)

অর্থাৎ নদীয়া লক্ষ্মণসেনের দ্বারা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

"The earliest that we know of Nadia is that in 1203 it was the Capital of Bengal." [Calcutta Review (1846) p. 398]

অর্থাৎ নদীয়া সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বপ্রাথমিক যে বিবরণ পাই, তাহা হইতে জানা যায়, ঐ নগরী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল,—ইত্যাদি বহু প্রমাণ প্রাচীন নবদ্বীপকেই সেন-বংশীয় রাজগণের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে।

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে প্রাচীন নবদ্বীপ

এই নবদ্বীপ-নগর গঙ্গার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত রহিয়াছে। যথা, ঊর্দ্ধাম্নায়-মহাতন্ত্রে—"বর্ত্তে হ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি। **ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে** মায়াপুরন্তু গোকুলম্॥" "গৌড়দেশে **পূর্ব্বশৈলে** করিল উদয়।" (চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৬)। "নদীয়া **উদয়গিরি**, পূর্ণচন্দ্র গৌর-হরি, কৃপা করি' হইল উদয়।" (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।৯৭)। "শ্রীসুরধুনীর **পূর্ব্ব তীরে**, অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে। জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে, কোল-দ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে।" (ঠাকুর নরহরি)। পরবর্ত্তি-বিবরণ-সমূহও তাহাই সমর্থন করে।

"It was on the east of the *Bhagirathi* and on the west of *Jalangi*" (Hunter's Statistical Account, p. 142)

অর্থাৎ নবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে এবং জলাঙ্গীর (খড়িয়ার) পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

এই প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর সম্প্রতি 'নবদ্বীপ' নামে পরিচিত না হইয়া বামনপুকুর, বেলপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, টোটা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহাই সম্প্রতি 'শ্রীধাম মায়াপুর' নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্ত্তনে নবদ্বীপ-নগরের শ্রীগৌরজন্মভিটা ও তৎসংলগ্ন স্থান ব্যতীত অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল। সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্ত্তী স্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকা-নগরীতেও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-গৃহ ব্যতীত অন্যান্য স্থান সমুদ্রমগ্ন হইবার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩১।২৩) শ্রুত হয়।

বিভিন্ন সময়ের নবদ্বীপ

মহাপ্রভুর সময়ের কুলিয়া-গ্রামে বা পাহাড়পুরেই আধুনিক নবদ্বীপ-সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থানেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় **অষ্টাদশ** শতাব্দীতে নবদ্বীপ নগর কুলিয়াদহ বা কালিয়দহের বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় **সপ্তদশ শতাব্দীর** নদীয়া-নগরী বর্ত্তমান নিদয়া,

শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। গঙ্গার গতির এই পরিবর্ত্তন এবং প্রাচীন নদীয়ার বসতির এইরূপ পরিবর্ত্তন "হিষ্ট্রি অব্ নদীয়া রিভার্স্" সুবা-বাঙ্গালার ম্যাপ, রেণেলের ম্যাপ এবং ব্লকম্যানের ম্যাপ প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে অর্থাৎ **ষোড়শ শতাব্দী-পর্য্যন্ত** শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ-নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্ত্তমান বামনপুকুর পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে মেঘার চড়ায় প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা [illegible]দশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। জমিদারী সেরেস্তার প্রাচীন কাগজ-পত্রাদি হই[illegible] এই বিষয় বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।

লণ্ডনের '[illegible]শ মিউজিয়ম্ ও য়্যাড্মির‍্যাল্টি'-ভবনে সংরক্ষিত দুইটি মান[illegible] এ জলাঙ্গী নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদ[illegible] শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের সাক্ষ্য অবিসংবাদিতভাবে প্রদান করিতেছে।

প্রথমোক্ত মানচিত্রটী ভেন্‌ডেন্-ব্রুক্-কৃত (**Mattheus Van-den Broucke**)। ইনি ১৬৫৮ হইতে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলন্দাজ (**Dutch**) বণিক্‌গণের নেতা ছিলেন। ব্রুকের ম্যাপের প্রথম সংস্করণ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বেলেন্টিনের ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া (**Valentyn's East India**)
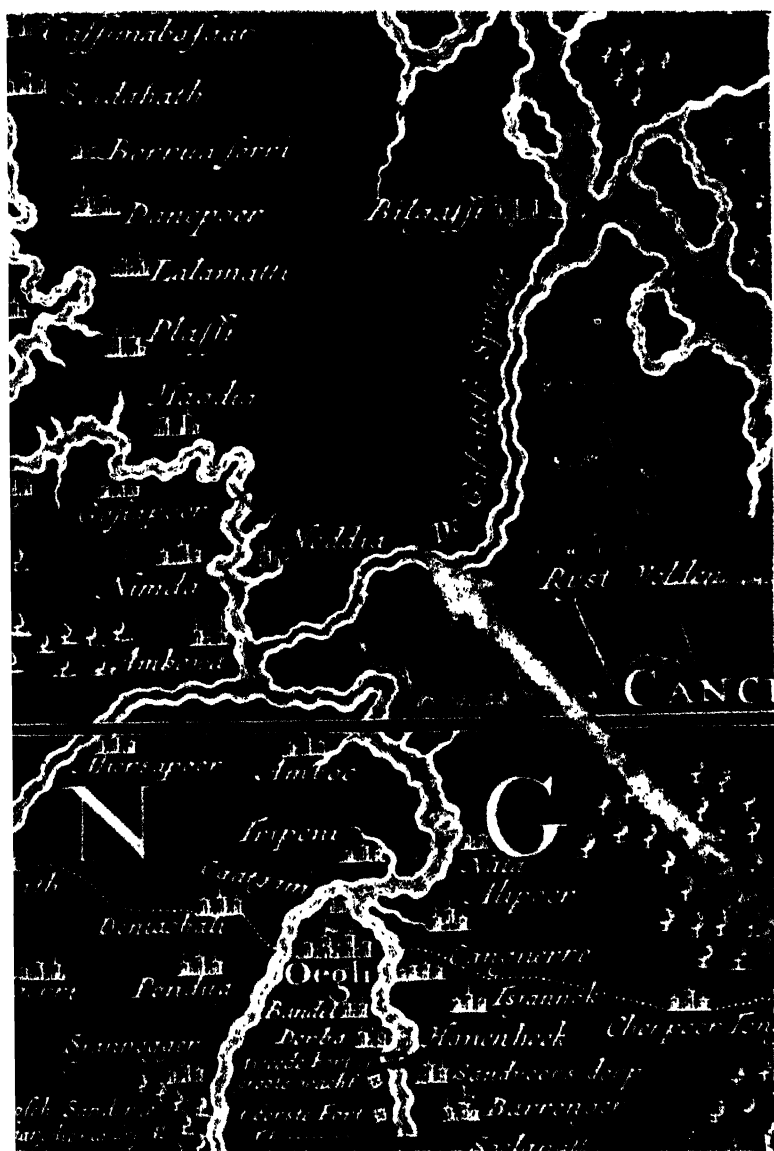
মেথুজ্ ভেন্ ডেন্ ব্রুক-কৃত বঙ্গের প্রাচীনতম মানচিত্রের কিয়দংশ (১৬৫৮—১৬৬৪ খৃঃ)
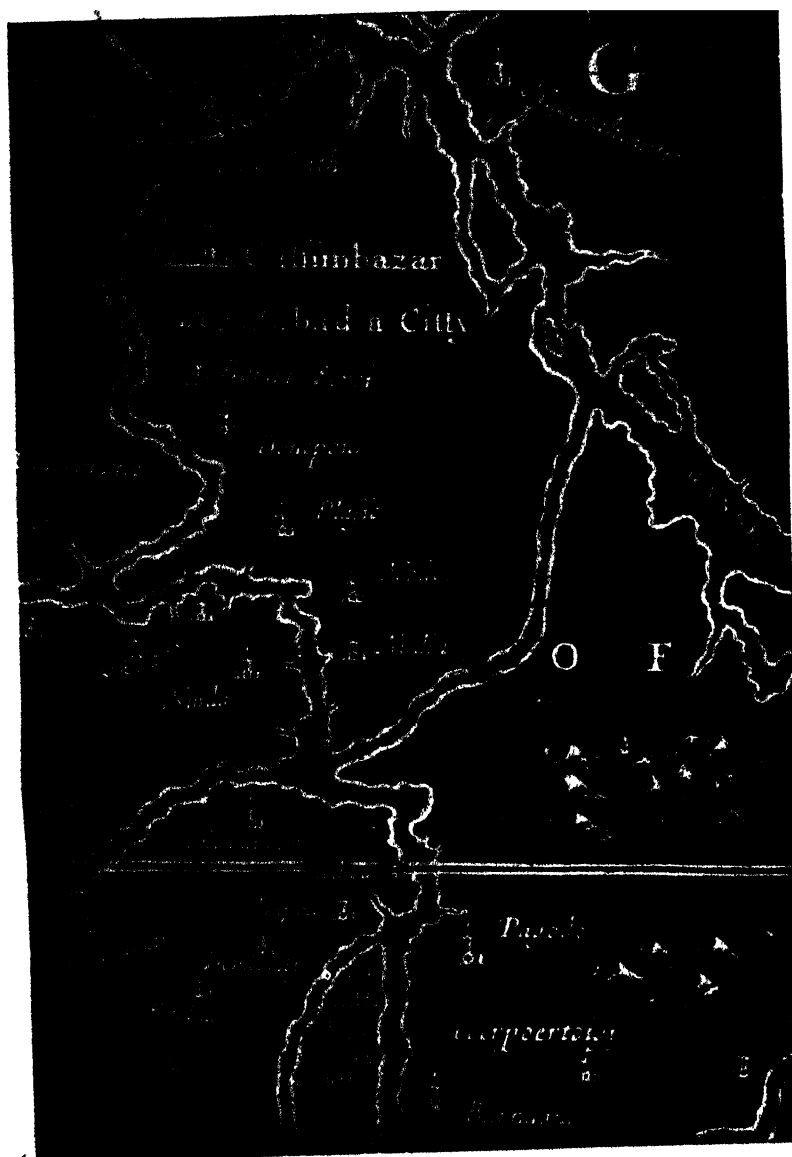
জন্ থর্ণটন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গের সুপ্রাচীন মানচিত্র (১৬৭৫ খৃঃ)

নামক পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ভেন্‌ডেন্‌ব্রুকের একটি ম্যাপ সংযুক্ত আছে। ঐ ম্যাপটীর একটি ফটোগ্রাফ গৌড়ীয়-মিশন ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করেন।

১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ একটি ম্যাপ প্রস্তুত করেন এবং জন্ থরণ্টন কর্ত্তৃক উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। লণ্ডনের নৌসেনা-বিভাগের বড় আফিসে **(British Admiralty**তে) 'ইংলিস্ পাইলট্' নামক পুস্তকের মধ্যে ঐ ম্যাপটি আছে। উহারও একখানি ফটোগ্রাফ গৌড়ীয়-মিশনের প্রযত্নে আনীত হইয়াছিল। গৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডির সৌজন্যে ও অনুমত্যনুসারে উক্ত মানচিত্র হইতে আবশ্যক অংশ মুদ্রিত হইল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতেও উত্তর-দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা ও তাহার পূর্ব্বপারে নদীয়া বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুরই যে প্রাচীন নদীয়া, এ বিষয়ে আর কোন সংশয়ই নাই। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ্ এক্‌সেলেন্সী দি রাইট অনারেবেল্ স্যর জন্ এণ্ডারসন্ গত ইংরাজী ১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী যখন শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন, তখন গভর্ণর-বাহাদুর ঐ মানচিত্র দুইটি দেখিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ কি ?

সাধারণ লোকের ধারণা হইতে পারে যে, কোন একটি বিশেষ নগর বা স্থানের নামই বোধ হয় নবদ্বীপ, অথবা 'নবদ্বীপ' বলিতে নূতন দ্বীপ বা উপনিবেশ-বিশেষ; বস্তুতঃ তাহা নহে।

নয়টি দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ গঠিত। এই নবদ্বীপের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রাম বা পল্লী অবস্থিত ছিল। নয়টি দ্বীপের চারিটি দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে এবং পাঁচটি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্ব পারের চারিটি দ্বীপের নাম—(১) **অন্তর্দ্বীপ**, (২) **সীমন্তদ্বীপ**, (৩) **গোদ্রুমদ্বীপ** ও (৪) **মধ্যদ্বীপ**; পশ্চিম পারের পাঁচটি দ্বীপের নাম—(১) **কোলদ্বীপ**, (২) **ঋতুদ্বীপ**, (৩) **জহ্নুদ্বীপ**, (৪) **মোদদ্রুমদ্বীপ** ও (৫) **রুদ্রদ্বীপ***।—ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

শ্রীল ঘনশ্যাম দাসের 'শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা' নামক গ্রন্থেও এই সমস্ত দ্বীপের বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা,—

নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নব-দ্বীপ নব-দ্বীপ-বেষ্টিত যে হয়॥
নবদ্বীপে নব দ্বীপ-গ্রাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥

নবদ্বীপের মধ্যে এত গ্রাম ছিল যে, শ্রীমায়াপুর যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ 'নবদ্বীপ' নামই তখন সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

নবদ্বীপ-মধ্যে গ্রাম-নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥

—ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ

* পরে গঙ্গাপ্রবাহের পরিবর্ত্তনে রুদ্রদ্বীপের অবস্থান পূর্ব্বদিকে হয়।

'মায়াপুর' নাম

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিক্রম-কালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেক গ্রামের নাম লুপ্ত ও নানাভাবে বিকৃত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-স্থান শ্রীমায়াপুর-গ্রামের নামও সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত এবং সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বলিতেছেন,—

যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়॥
কথোকাল পরে কথোগ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথোগ্রাম-নাম লোকে অস্তব্যস্ত কৈল॥

—ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ

কলির বৃদ্ধি অর্থাৎ নানাপ্রকার অসদাচার ও কুতর্ক-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের বিভিন্ন পুণ্যস্থানসমূহের নামের ব্যতিক্রম হইয়া পড়িয়াছে। নামসমূহের ব্যতিক্রম হইলেও প্রকৃত সত্যানু-সন্ধিৎসু ও ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে প্রকৃত নাম উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় না। কালের বিক্রমে নবদ্বীপের কোন কোন গ্রাম গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। লোকে কোন কোন গ্রামের নামকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

ইহা কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান সম্বন্ধে নহে, অন্যান্য তীর্থস্থান-সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। যেমন, পুণ্যময় প্রয়াগরাজ 'ইল্লাহাবাজ' বা এলাহাবাদ অথবা প্রয়াগের অপভ্রংশ 'পেরাগ,'

মথুরা 'মাট্রা,' অযোধ্যা 'আউধ,' বৃন্দাবন 'বিন্দ্রাবন' প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। মথুরার যে পল্লীতে মহাযোগপীঠ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান অবস্থিত, তাহা 'ইদগাঁ' নামে পরিচিত। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অহিন্দুর শত শত কবরের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

নদীয়া জেলার সাধারণ ব্যক্তিগণ আকারকে 'একার' করিয়া উচ্চারণ করে; অনেক সময় 'র'-কে 'অ' বলিয়া থাকে। নদীয়া জেলায় বিশেষতঃ শ্রীমায়াপুর-অঞ্চলে কাঁথা—'কেঁথা', ডাঙ্গা—'ডেঙ্গা', টাকা—'টেকা', পাঁচু—'পেঁচে,' মাছুনী—'মেছুনী', মায়া—'মেয়া' প্রভৃতি শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের অশিক্ষিত লোক 'রাম'কে—আম বলে, 'দূর ছাই'কে 'দূর ছেই' বলিয়া থাকে। তাহারা সংস্কৃত 'মায়াপুর' শব্দ উচ্চারণ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে 'মেয়াপুর' প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় উচ্চারণ করিয়া থাকে।

গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পরে এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর নবদ্বীপ-দর্শনে আসিবার পূর্ব্বে জলপ্লাবন হইয়া গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; সেইজন্যই ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে এরূপ লিখিত আছে,—

ওহে শ্রীনিবাস, এই আতপুর-স্থান।
বহুকালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম॥

ইহা হইতে অন্তর্দ্বীপের কিয়দংশ গুপ্ত হইবার কথা প্রকাশ পাইতেছে। এই সময় গঙ্গা যে-স্থানে প্রবাহিতা ছিলেন, সে-স্থান

হইতে সরিয়া আরও পশ্চিমে গিয়াছিলেন। এইজন্য গঙ্গার পশ্চিম কূলে যে রুদ্রদ্বীপ অবস্থিত ছিল, তাহার কিয়দংশ গুপ্ত হইয়া যায় এবং ঐ রুদ্রদ্বীপের কিয়দংশে অবস্থিত স্থানের পশ্চিম-দিকে গঙ্গা প্রবাহিতা হন। শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর ভ্রমণ-কালের বিবরণেও ইহা জানা যায়—

গঙ্গার পূর্ব্বধারে রাতুপুর গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাতুপুরে 'রুদ্রপুর' কয়॥
এই রাতুপুর পূর্ব্বে রুদ্রদ্বীপ-নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল, এবে আছে মাত্র স্থান॥

অন্তর্দ্বীপের সীমা

অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুরের কিয়দংশ, শ্রীনাথপুর, গঙ্গানগর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। বামনপুকুরের যে অংশ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, তাহা "জলকর দম্‌দমা" এবং "দ্বাপের মাঠ" নামে খ্যাত (কৃষ্ণনগর থানার পূর্ব্বেকার জুরিজ্‌-ডিক্‌সন লিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ইহা পূর্ব্ব ও উত্তর-সংলগ্ন মাঠ বলিয়া খ্যাত এবং এই মাঠ জমিদারী সেরেস্তার কাগজ-পত্রে **"দ্বীপের মাঠ"** বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে মুদ্রিত মানচিত্র দর্শন করিলে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের অবস্থিতি-সংস্থান বুঝা যাইবে। এই মানচিত্র ১৯১৭ সালের সেটেল্‌মেণ্ট্‌ সার্ভে নক্সার অবিকল আদর্শানুসারে অঙ্কিত হইযাছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের কীর্ত্তনের পথের বিবরণ এবং মধ্যাহ্ন-ভ্রমণের বিবরণ মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে বল্লাল-

দীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

১১৯৯ সালের হুদ্দাবন্দী কাগজে 'শ্রীমায়াপুর' গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নবদ্বীপ ও বহু স্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর স্বাক্ষর-সমন্বিত পত্রিকাযুক্ত 'কায়স্থকৌস্তুভ' নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী 'মায়ায়াং' এই নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। 'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ' ইতি ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে"—কায়স্থকৌস্তুভ ৯৮ পৃষ্ঠা।

"লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন।"—কায়স্থকৌস্তুভ ১২৪ পৃষ্ঠা।

"নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও নগর নির্ম্মাণ করিলেন, ইহার এক নাম 'মায়াপুর' শাস্ত্রে কহিয়াছেন"—কায়স্থকৌস্তুভ ১২৩ পৃষ্ঠা।

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ। শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী-পরিবারিতে॥ —অনন্তসংহিতা ৫৭ অধ্যায় —কায়স্থকৌস্তুভ ১২৪ ও ১৩০ পৃষ্ঠা।

হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—

Nadia (Nabadwip), ancient Capital of Nadia District and the residence of Laxman Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya. (Hunter's Imperial Gazetteer, 1880)

TRUE COPY OF A MAP

FROM

"Interesting Historical Events Relative to the Provinces of Bengal and the Empire of Indostan"

BY

J. Z. HOLWELL.

Printed in 1765 London.
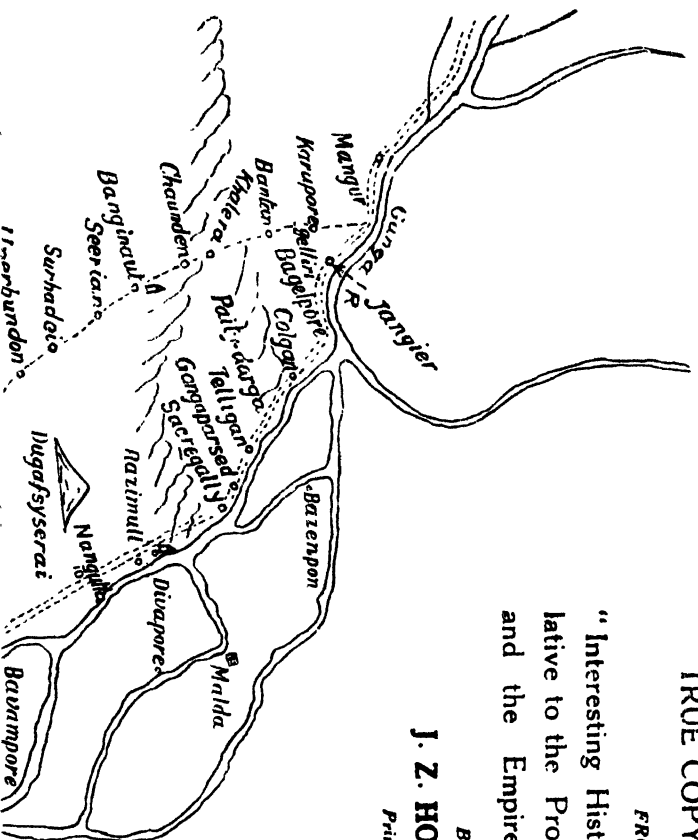
"Statistical Account of Bengal, Vol. I" নামক পুস্তকের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin who is said to have been the teacher of Husain Sha, King of Bengal (1494—1522.)"

"বয়রার নিকটে 'মায়াপুর' নামক একটি ছোট নগর (বর্দ্ধমান জেলার সীমান্তের সন্নিহিত প্রদেশে) অবস্থিত। এই স্থানে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবরের অবস্থানের বিষয় আমি শ্রুত হইয়াছি। মৌলানা সিরাজুদ্দিন বঙ্গের বাদসাহ (১৪৯৪—১৫২২) হুসেন সাহের শিক্ষক বলিয়া কথিত।"

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত **'Holwell's Hindustan'** নামক গ্রন্থ-সংলগ্ন মানচিত্রের সহিত এই বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে বয়রার অবস্থিতি এবং শ্রীমায়াপুরের সংস্থান বুঝা যাইবে।

এতৎসম্বন্ধে 'নদীয়াকাহিনী'-গ্রন্থ-লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"এই কাজির সমাধি আজ পর্য্যন্ত (বর্ত্তমান) মায়াপুর-গ্রামের অদূরে উত্তর-পূর্ব্বকোণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এই কাজির নাম ছিল—মৌলানা সিরাজুদ্দিন।"

—নদীয়াকাহিনী ২য় সংস্করণ ২০৮ পৃঃ পাদটীকা

নবদ্বীপ-সহর নিবাসী কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর ১২৯১ বঙ্গাব্দে লিখিত 'নবদ্বীপ-মহিমা' নামক একটী পুস্তকে লিখিত আছে,—

"আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, বল্লালদীঘির নিম্ন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল।" —নবদ্বীপমহিমা ১১পৃঃ। "গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বা মেয়াপুর। ভারুইডাঙ্গা ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। এইখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।" —নবদ্বীপ-মহিমা ৬ পৃঃ

স্যর উইলিয়ম হাণ্টারও বলিয়াছেন—

Nadia, at the time of its foundation was situated right on the banks of Bhagirathi. * * * It used formerly to run behind the Ballaldighi and the palace ; but it has now dwindled in that part into an isolated *khal.* It now runs to the east of the ruins of the palace. (S. A. of Bengal Vol. I, P. 142)

নবদ্বীপ-সহর-নিবাসী স্বধামগত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত (১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) বৈষ্ণবাচার-দর্পণের প্রথম ভাগের ৬৬ পৃষ্ঠায় গঙ্গার পূর্ব্বতটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'গৌরসুন্দর' নামক গ্রন্থের ৫ম ও ১১শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

অধুনা যে-স্থান 'নবদ্বীপ-নগর' বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর তাহার প্রায় এক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ছিল। বহুদিন হইল, প্রাচীন নবদ্বীপনগর ভাগীরথীর গর্ভগত হইলেও তাহার কিয়দংশ অত্যুচ্চ ভূমিরূপে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও তদীয় বল্লালদীঘী-নাম্নী দীর্ঘিকার চিহ্ন এখনও

দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে-স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে-স্থানে কাজীর দর্প চূর্ণ করেন, সেই সকল স্থান এখনও পূর্ব্বাবস্থাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের করচা' * নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—

নদীয়ার নীচে গঙ্গা, নাম মিশ্রঘাট।

*   *   *

শ্রীবাস-অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়ে॥
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গাচূর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥ —১ম-২য় পৃঃ
গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥ —৪র্থ পৃঃ

নদীয়া জেলার সুশিক্ষিত সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেব লিখিয়াছেন—

"প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থকার যখন বলিয়াছেন—'নদীয়ার নীচে গঙ্গা', 'ডাহিনে বাগ্দেবী', তখন যে এই বাগ্দেবী নদী প্রাচীন নদীয়ার নিকট দিয়াই প্রবাহিত ছিল, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। তখন নদীয়া গঙ্গানদীর পূর্ব্ব উত্তর তীরে এবং পদ্মার শাখানদী জলঙ্গী বা খড়িয়ার পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। * * অধুনা মেয়াপুর গ্রামের মধ্যে

* এই গ্রন্থের ভৌগোলিক বিবরণের প্রামাণিকতা অনেকেই স্বীকার করেন।

একটি প্রাচীন জলপ্রবাহের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ইহা খড়িয়া নদীর ব্যবধানে তফাৎ হইয়া পড়িলেও মহেশগঞ্জের নীচের জলস্রোতের সহিত যে এককালে সংযুক্ত ছিল, তাহা প্রতীত হইয়া থাকে। তাহা হইলে বাগ্দেবী-নদী যে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট দিয়াই প্রবাহিত ছিল, তাহা কে না বলিবে? * * প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমি অতি বিশাল ছিল। ভারুইডাঙ্গা, সরডাঙ্গা, গাদীগাছা সুবর্ণবিহার, মাজিদা, ভালুকা, কুলিয়া, সমুদ্রগড়, রাহুতপুর, বিদ্যানগর, মামগাছি, মহৎপুর, জান্নগর, রুদ্রডাঙ্গা, শরপুর, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি গ্রাম ইহার অন্তর্গত ছিল। এখনও ঐসকল গ্রাম বিদ্যমান আছে, কিন্তু নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে স্থলে বর্ত্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ-পল্লী, খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূর। উহা তখন **কুলিয়া** নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন-নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা বল্লালসেনের রাজপ্রাসাদ ছিল এবং এই ভূমিতেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তি যে সর্ব্বাংশে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেন না, এখনও এই ভূমিতে রাজা বল্লালসেনের স্মৃতির পরিচায়ক বল্লালদীঘী এবং রাজপ্রাসাদ গঙ্গা-গর্ভসাৎ হইলেও 'বল্লালঢিবি' নামে একটি উচ্চস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। * * * মেয়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মভিটা ও বাসভূমি। যে কাজীর সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে, তাঁহারও কবর আজ পর্য্যন্ত মেয়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মোল্লা সাহেবের বাড়ীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কবরের পাশে একটি বৃহৎ কাঠমল্লিকা ফুলের গাছ আছে। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান-ভূমির নিদর্শন আর কি হইতে পারে?"

'বিশ্বকোষ'-অভিধান-সম্পাদক স্বধামগত রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষের 'নবদ্বীপ' শব্দের

মধ্যে বল্লালদীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। বিশ্বকোষের 'নবদ্বীপ' শব্দ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত তিনি 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ও ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'কায়স্থ'-পত্রিকায় শ্রীধাম-মায়াপুরকেই প্রাচীন নবদ্বীপ ও 'শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রায়বাহাদুর ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার রচিত 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক পুস্তকের ৬৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান শ্রীধাম-মায়াপুরকেই গৌরজন্মস্থলী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। নবদ্বীপপ্রবাসী পরলোকগত পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরে বহুবার আগমন করিয়া সেই স্থানের পবিত্রতম ধূলি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিতেন,—"এই স্থানে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন নিমাই পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই স্থানে কত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পদধূলি রহিয়াছে, সেই পবিত্রধূলি আমি গায় মাখিয়া পবিত্র হইতেছি।"

১২৯৯ বঙ্গাব্দের ২রা মাঘ রবিবার অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর আমিন-বাজার এ, ভি, স্কুলের প্রাঙ্গণে একটি বিদ্বন্মণ্ডলীমণ্ডিত সর্ব্বসাধারণের বিরাট্ সভায় সকলে বহু প্রাচীন প্রমাণ ও প্রাচীন দলিল-পত্র, মানচিত্র প্রভৃতি অকাট্য প্রমাণ-দর্শনে নিঃসন্দেহ হইয়া বল্লালদীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই একবাক্যে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্থির করেন এবং "শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা" নাম্নী একটি সভা গঠন করেন।

স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর, তৎপরে তাঁহার পুত্র মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য ধর্ম্মরাজ বাহাদুর এবং তদীয় পুত্র মহারাজ বীরকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পঞ্চশ্রীক মহারাজ ধর্ম্মধুরন্ধর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর কে, সি, এস, আই এই শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ সভার সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর দি অনারেবল্ গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু, আর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রধান স্তম্ভ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ বি-এল, শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ মহাশয় এই সভার সহকারী-সম্পাদক ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-বংশাবতংস স্বধামগত লোকনাথ গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, জয়গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-এল; সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ, ডি; বৃন্দাবনের স্বধামগত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য এম-এ, বি-এল; নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে পরম প্রামাণিক রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল; শান্তিপুর-নিবাসী সুকবি মৌলবী মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রভৃতি অসংখ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং গৌড়মণ্ডল,

ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই স্থানকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২০শে মাঘ স্যর পি, সি, রায় শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনী উন্মোচনকালে বলিয়াছেন,—"মায়াপুরের প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর সহিত মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত। এখানকার প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর এক একটা মহান্ ইতিহাস আছে।"

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদনীন্তন বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিতরূপে 'সিদ্ধ মহাজন' বলিয়া স্বীকৃত। সমগ্র শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজ এখনও তাঁহাকে বৈষ্ণব-জগতের একমাত্র সম্রাট্ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ জগদ্‌গুরু নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থান খনন করিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের নিদর্শন ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত সুপ্রাচীন নিঃস্বার্থ লোক এখনও জীবিত আছেন। পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ এবং যাবতীয় মহাজন,—সকলেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লালদীঘীর নিকটবর্ত্তী স্থানকেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

ও বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্বভৌম
শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-স্থানে আবির্ভূত হন, তাহা নবদ্বীপের অন্যতম অন্তর্দ্বীপ নামে পরিচিত।

শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণে (১) শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, বিষ্ণুর (২) শ্রবণ, (৩) কীর্ত্তন, (৪) স্মরণ, (৫) পাদসেবন, (৬) অর্চ্চন, (৭) বন্দন, (৮) দাস্য ও (৯) সখ্য—এই নয় প্রকার ভক্তি। এই নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন করিয়া অন্যান্য ভক্তির অঙ্গ যাজন করিলে তবে তাহা সুষ্ঠু হয়। অতএব ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদন বা শরণাগতিই সকলের কেন্দ্রে অবস্থিত। নবদ্বীপের মধ্যেও অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনের পীঠরূপে সকলের কেন্দ্রে অবস্থিত।

"শ্রীগঙ্গানগর, ভরদ্বাজটিলা (ভারুইডাঙ্গা) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম-সমূহ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত; গঙ্গানগর গ্রামেই শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল। মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে যে পতিত ভূমি আছে, তাহা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় হইতে সেইরূপই আছে—ইহা 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখা যায়। সেই স্থান হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়। ঐ ভূমি জগদ্‌বিধাতা ব্রহ্মার তপস্যা-স্থল বলিয়া তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। অতি পূর্ব্বে মায়াপুরের পূর্ব্ব-অংশে ও অন্তর্দ্বীপের মধ্য দিয়া বাগ্‌দেবীর একটি ক্ষুদ্র প্রবাহ ভাগীরথী পর্য্যন্ত ছিল। শিবের ডোবার কিছু দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে সেই প্রণালীর মুখ পরিলক্ষিত হয়। ঐ বাগ্‌দেবীর তীরে তৎকালে প্রৌঢ়া-মায়ার মন্দির ছিল।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম'—বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা ১ম বর্ষ

"অতি পূর্ব্বে বাগ্‌দেবী হরিশপুরের নিকট মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দেবপল্লীর নিকট দিয়া ভালুকা-নামক নগর স্পর্শ করতঃ গোয়ালপাড়া

গ্রামের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেন। গঙ্গাদেবীর মন্দাকিনী-স্রোতঃ যখন শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বাগ্দেবী মায়াপুরের একপার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রাপ্ত হইলেন। বাগ্দেবীর ভাগীরথী-প্রাপ্তিকালে শ্রীমায়াপুরের অনেক অংশ বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়। সেই সময় ভগ্নগৃহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শ্রীপ্রৌঢ়া-মায়া ও বৃদ্ধশিব লইয়া কুলিয়া-গ্রামের চরে নূতন গ্রাম পত্তন করেন। সেই নূতন গ্রামই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-নগর। নূতন গ্রামে মহাপ্রভুর লীলাস্থান কিছুই নাই, স্থানটি নবদ্বীপান্তর্গত বৃন্দাবনের পুলিন।

—'শ্রীনবদ্বীপধাম'—বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা, ঐ

শ্রীনবদ্বীপধামকে কেহ কেহ পঞ্চ যোজন অথবা ষোড়শ ক্রোশ পরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই নবদ্বীপ-মণ্ডলের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর, তথায় ভগবদ্গৃহ (শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রালয়) বিরাজিত।

এই শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠ নিত্য বিরাজিত।

নবদ্বীপ-মধ্যে **মায়াপুর** নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥

—শ্রীভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ

শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুর অভিন্ন-শ্রীমথুরাপুরী এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণ মহাবৈকুণ্ঠে যে জন্মলীলা প্রকাশ করেন নাই, শ্রীনবদ্বীপে ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সেই জন্মলীলা প্রকট করিয়া তাঁহার নিত্যপুত্র-রূপে আবির্ভূত হন এবং মহা-ঔদার্য্য-লীলা আবিষ্কার করেন।

নবদ্বীপ-মণ্ডলের মানচিত্র-নিদর্শন

পরিমাণ ২ ইঞ্চি ১ যোজন (৮ মাইল)

১। অন্তর্দ্বীপ—পদ্মের কর্ণিকা—গঙ্গার পূর্ব্ব পারে। ইহার মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর, যথায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, মহাযোগপীঠ। *

---

* অন্তর্দ্বীপের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমভাগে পড়িয়াছে, সেই স্থান বৃন্দাবন। তথায় রাসস্থলী, ধীরসমীর ও বহুতর কুঞ্জ আছে।

২। সীমন্তদ্বীপ—গ্রাম নষ্ট হইয়াছে, ছাড়ি গঙ্গার দক্ষিণ ধারে সীমলী দেবীর (সীমন্তিনী) পূজা হয়। রুকুণপুর পর্য্যন্ত এই দ্বীপের অন্তর্গত। শরডাঙ্গা (শবরডেঙ্গা) ও বিশ্রামস্থল ইহার দক্ষিণভাগ।

৩। গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা—স্বর্ণবিহার, নৃসিংহক্ষেত্র, হরিহর-ক্ষেত্র, অলকানন্দাতীরে কাশীধাম ইহার অন্তর্গত।

৪। মধ্যদ্বীপ—মাজিদা—ভালুকা, পর্ণশিলা, হাটডেঙ্গা ইহার দক্ষিণে।

৫। কোলদ্বীপ—কুলিয়াপাহাড়—সমুদ্রগড় প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৬। ঋতুদ্বীপ—রাহুতপুর, বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

৭। জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর।

৮। মোদদ্রুম দ্বীপ—মাউগাছি, অর্কটীলা (সূর্য্যক্ষেত্র-আকডালা), মহৎপুর (মাতাপুর) পাণ্ডবনিবাস ইহার অন্তর্গত।

৯। রুদ্রদ্বীপ—রুদ্রপাড়া—শঙ্করপুর, পূর্ব্বস্থলী, চুপী, কোক্ষশালা, মেড়তলা ইহার অন্তর্গত।

এই গ্রন্থে যে ক্ষুদ্র মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা রাজাজ্ঞাক্রমে মান-বিজ্ঞানসম্মত মানচিত্র হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব পরিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। মানচিত্রের ক্ষুদ্রাকার-প্রযুক্ত কেবল মুখ্যস্থান সকলের নাম দেওয়া গেল।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবির্ভাব ও নামকরণ

মধুকর মিশ্র নামক এক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোন কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। মধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র উপেন্দ্র মিশ্র। তিনি বৈষ্ণব, পণ্ডিত ও বহু সদ্‌গুণান্বিত ছিলেন। এই উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ও ত্রিলোকনাথ। উপেন্দ্র মিশ্রের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন ও তথায় 'পুরন্দর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিশ্র পুরন্দর নবদ্বীপেই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষে নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব নিবাস ছিল—ফরিদপুর জেলার 'মগ্‌ডোবা' গ্রামে। ইনি গঙ্গাতীরে বাসের জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। কাজী-পাড়ায় ইনি বাসস্থান নির্ম্মাণ করায় কাজীসাহেব প্রবীণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গ্রাম-সম্বন্ধে 'চাচা' (খুড়া) বলিয়া ডাকিতেন।

শচীদেবীর একে একে আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে তাঁহার 'বিশ্বরূপ' নামে নবম পুত্র-সন্তান আবির্ভূত হন।

সন ১৩৪১, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুর-যোগপীঠের নূতন নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খননকালে এই চতুর্ভুজ "অধোক্ষজ" শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি ও তৎসহ কতিপয় ভগ্ন মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীল জগন্নাথমিশ্রের গৃহ-দেবতা বলিয়া কথিত।

[৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন* শনিবার, নব-বসন্ত-পূর্ণিমা—শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, সন্ধ্যাকাল। পূর্ণচন্দ্র প্রতি বৎসরই এই সময় তাঁহার অমল-ধবল-স্নিগ্ধ অংশুমালায় বিশ্বকে স্নান করাইবার জন্য সগর্ব্বে উদিত হইয়া থাকেন; কিন্তু আজ যেন জগতের চন্দ্রের পূর্ণতা, স্নিগ্ধতা, শুভ্রতা, উদারতা,বদান্যতা, কবিত্ব, সাহিত্য, ছন্দঃ—সমস্তই কোন এক অতিমর্ত্ত্য চন্দ্রের নিকট তিরস্কৃত। ভূলোকের চন্দ্রের পূর্ণতা গোলোকের চন্দ্রের পূর্ণতার নিকট পরাভূত—বুঝি এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সকলঙ্ক জগচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত † হইয়া পড়িল! বিশ্বের চতুর্দ্দিকে 'হরি বল, হরি বল' কলরব

* ১৪০৭ শকাব্দা, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১৫৪২ সংবৎ, ৮৯৫ ত্রিপুরাব্দ, ৭ই মার্চ্চ ২৮ দণ্ড ৪৫ পল, ইং ৫টা ৫২মিনিট ২০সেকেণ্ডে অর্থাৎ সন্ধ্যার ৮মিনিট বা ২০পল পূর্ব্বে (সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।০।২০) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। কোন মতে—১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৮টা ৫৬মিঃ (? স্থানীয় সময়) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। এ-সম্বন্ধে জ্যোতিষ-পণ্ডিতগণ বলেন,—"বহু পূর্ব্বে সৌর-বর্ষ-মান ৩৬৫ দিন, ৬ঘণ্টা হিসাবে খৃষ্টাব্দ গণনা করা হইত; পরন্ত, বর্ষমান বাস্তবিক ঐরূপ নহে। তজ্জন্য পোপ গ্রেগরি (১৩) ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ষ-মান সংস্কার করিয়া খৃষ্টাব্দ-গণনায় যে ভ্রম ছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দেন; কিন্তু তৎকালে ইংলণ্ডে উহা প্রচলিত হয় নাই। ইংলণ্ডে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বহু বিতণ্ডার পর সূক্ষ্ম বর্ষ-মান স্থির করিয়া ২রা সেপ্টেম্বর স্থলে ১৩ই সেপ্টেম্বর নির্দ্ধারিত হয়।"

হিন্দু জ্যোতিষ-মতে বর্ষমান—৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল। প্রতি শতাব্দীতে প্রায় ১ দিন কম হইলে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ১৬।১৭ দিন কম হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং সেই ভ্রান্ত গণনা অনুসারে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, বর্ত্তমান বর্ষবিন্দু-অনুসারে গণিত ৭ই মার্চ্চ। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সমস্ত গণনায় ভ্রান্তি ছিল বলিয়া ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন পড়িয়াছে। অতএব আধুনিক গণনা-প্রণালী-মতে ৭ই মার্চ্চ ও প্রাচীন ভ্রান্ত গণনা-মতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বলা যাইতে পারে।

† সেইদিন পূর্ণ-চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল।
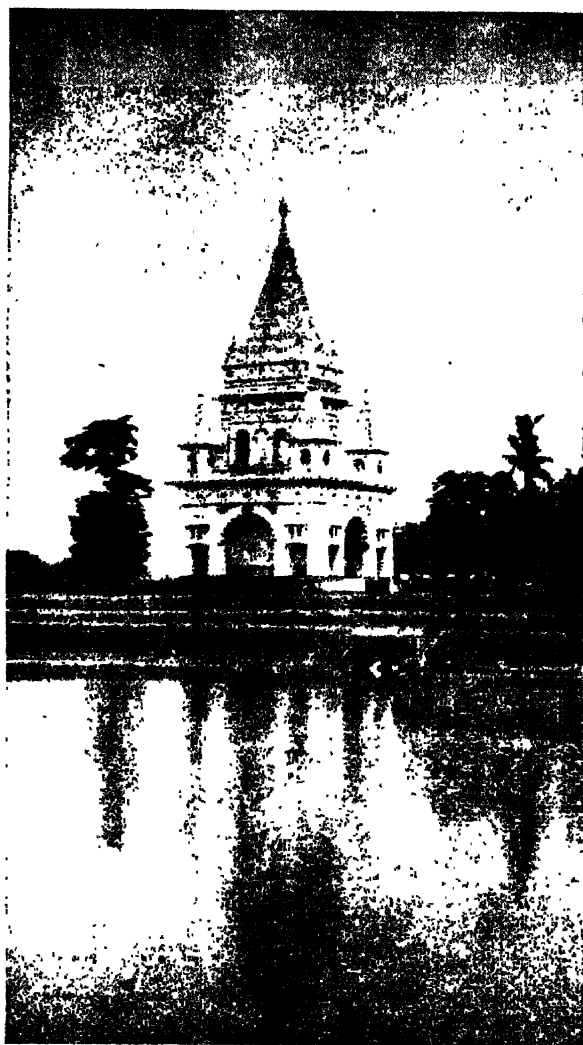
শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে শ্রীশ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির

উঠিল—কর্ম্ম-কোলাহল স্তব্ধ হইল—দিগ্‌বধূগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ধ্বনি শুনিয়া নাচিয়া হাসিয়া উঠিল! এমন সময়ে সিংহলগ্নে, সিংহ-রাশিতে শচী-গর্ভ-সিন্ধু হইতে মায়াপুর-পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন—অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল—মায়া-মরুতে অমৃত-মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইল। অবিরল ধারায় হরিকীর্ত্তন-সুধা-সঞ্জীবনী বর্ষিত হওয়ায় বিশ্বের হরিকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-দুঃখ বিদূরিত হইল। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীহরিদাস আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তগণের আনন্দ-নৃত্য হইতে থাকিল। নর-নারীগণ বিবিধ বিচিত্র-উপহারের সহিত মিশ্র-ভবনে আগমন করিয়া নবদ্বীপ-চন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, শচী, গৌরী, রুদ্রাণী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবাঙ্গনাগণ নারীবেশে এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণ ও দেবগণ নর-বেশে প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্র-ভবনে আগমন করিয়া নবদ্বীপ-চন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর ও পণ্ডিত শ্রীবাস মিশ্র-নন্দনের জাতকর্ম্ম-সংস্কার সমাধান করিলেন। জগন্নাথমিশ্র আনন্দ-ভরে সকলকে যথাযোগ্য দ্রব্য দান করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী সীতাঠাকুরাণী নবদ্বীপ-চন্দ্রকে দেখিবার জন্য শান্তিপুর হইতে মায়াপুরে শচীগৃহে আগমন করিলেন। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী ও চন্দ্রশেখর-পত্নী অবিলম্বে বিবিধ উপায়নসহ শচীগৃহে উপস্থিত হইয়া শচীনন্দনকে দর্শন করিলেন।)

পাড়া-প্রতিবেশিগণ সর্ব্বক্ষণই বালককে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ নানাভাবে

বালককে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইত না। তখন কেবলমাত্র উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলেই বালক নীরব হইত,—

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥ —চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৯

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, এই নবীন বালকে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে বিরাজিত। ইনি সমগ্র বিশ্ব অনন্তকাল ভরণ-পোষণ করিবেন জানিতে পারিয়া চক্রবর্ত্তি-প্রবর তাঁহার হৃদয় হইতে এই বালকের **"বিশ্বম্ভর"** * নাম প্রকাশিত করিলেন। ললনাগণ বালকের গৌরকান্তি এবং 'হরিকীর্ত্তন' শ্রবণ-মাত্র বালকের ক্রন্দন-নিবৃত্তি ও উল্লাস লক্ষ্য করিয়া বালককে **"গৌরহরি"**-নামে প্রচার করিলেন। যমের নিকট তিক্ত-সূচক নিম্ব-শব্দ হইতে স্নেহময়ী শচীদেবী **"নিমাই"** † নাম রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন,—নিম্ববৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায় শচীদেবী পুত্রকে আদর করিয়া 'নিমাই'-নামে ডাকিতেন। নিমাই পরবর্ত্তিকালে 'গৌরসুন্দর', 'গৌরাঙ্গ', 'মহাপ্রভু' ও সন্ন্যাস-লীলার পর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

* সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ-পোষণ। 'বিশ্বম্ভর'-নাম ইহার,—এই ত' কারণ ॥
—চৈঃ চঃ আঃ ১৪।১৯

† ডাকিনী-শাখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল—'নিমাই' ॥
—চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১৭

নবম পরিচ্ছেদ

নিমাইর বাল্য-লীলা

রুচি-পরীক্ষা

অকলঙ্ক শ্রীগৌরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে লোকলোচনে বৃদ্ধি-লীলা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। নিমাইর নামকরণ-কালে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের রুচি পরীক্ষার জন্য বালকের নিকট পুঁথি, খই, ধান, কড়ি, সোণা, রূপা প্রভৃতি অনেক কিছু দ্রব্য রাখিলেন। বালক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পুঁথি আলিঙ্গন করিলেন। ইহা দ্বারা শিশুকালেই নিমাই জগৎকে শিক্ষা দিলেন,—পার্থিব দ্রব্যজাত সমস্তই অনিত্য—শ্রীমদ্‌ভাগবতই নিত্যবস্তু। শিশুকাল হইতে ভাগবতী কথায় রুচি হইলেই জীব প্রকৃত সম্পৎশালী হইতে পারে। প্রহ্লাদও শিশুকালে তাঁহার সমবয়স্ক ও সমপাঠী বালকগণকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

'শেষদেব'

ক্রমে নিমাই 'হামাগুড়ি' দিতে শিখিলেন। একদিন হামাগুড়ি দিতে দিতে গৃহের এক স্থানে একটি সর্পকে দেখিতে পাইয়া বালক কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপরে শয়ন করিয়া শেষ-শায়ীর লীলা প্রকট করিলেন। বাৎসল্য-প্রেমময়ী শচীমাতা-প্রমুখ মাতৃ-স্থানীয়া

ললনাগণ ব্যস্ত হইয়া 'গরুড় গরুড়' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ও বালকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সর্পরূপী অনন্ত সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন। হামাগুড়ি দিয়াই নিমাই একাকী গৃহের বাহিরে গমন করিতেন। লোকে বালকের রূপ-লাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া বালককে সন্দেশ, কলা প্রভৃতি প্রদান করিতেন। নিমাই সেই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া হরিকীর্ত্তন-কারিণী নবদ্বীপ-ললনাগণকে পারিতোষিক-প্রসাদ-স্বরূপে উহা বিলাইয়া দিতেন। কখনও বা কোন প্রতিবেশী গৃহস্থের গৃহে গমন করিয়া গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে দধি, দুগ্ধ ও অন্নাদি ভক্ষণ করিতেন। কাহারও গৃহ-সামগ্রী ভগ্ন করিয়া সেই স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিতেন। বালকের মুখচন্দ্র-দর্শন-মাত্র সকলেই তাঁহাদের ব্যথা ও অভিযোগ ভুলিয়া যাইতেন।

দুইজন চোর ও নিমাই

একদিন নিমাইর দেহে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার দেখিয়া দুইজন চোর ঐ সকল চুরি করিবার যুক্তি করিল। নিমাই যখন একাকী পথে বেড়াইতেছিলেন, তখন ঐ দুই চোর নিমাইকে খুব আদর ও অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের ভাণ করিয়া কোলে তুলিয়া লইল ও বালককে তাঁহারই গৃহে লইয়া যাইতেছে বলিয়া কোন নির্জ্জন-স্থানে লইয়া যাইবার উপক্রম করিল। নিমাইর কোন্ অলঙ্কার কে চুরি করিবে, তাহা লইয়া চোর দুইটি পরস্পর অনেক জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকিল। বালক নিমাই এক চোরের স্কন্ধে থাকিয়া

আর এক চোরের হস্ত হইতে সন্দেশ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নিমাইর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চোর দুইটি তাহাদের স্ব-স্ব গন্তব্য পথ ভুলিয়া গেল এবং অবশেষে তাহাদের নিজের ঘর মনে করিয়া শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ঘরেই উপস্থিত হইল। নিমাইকে স্কন্ধ হইতে নামাইবা-মাত্রই নিমাই পিতার কোলে গিয়া উঠিলেন; চোর দুইটী তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভয়ে কে কোথায় পলাইবে, সেই পথ খুঁজিতে লাগিল এবং একটি সামান্য বালক তাহাদিগকে কিরূপ বঞ্চনা করিয়াছে, তাহা পরস্পর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। বালক নিমাই চোরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাহাদেরও মঙ্গলবিধান করিলেন। চোর দুইটি শ্রীগৌরনারায়ণকে স্কন্ধে ধারণ করিয়া ও সন্দেশ ভোজন করাইয়া অজ্ঞাতসারে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিল।

মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও দার্শনিক উত্তর

একদিন শ্রীশচীদেবী নিমাইকে ভোজনার্থ 'খই, সন্দেশ' প্রদান করিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলে বালক খই সন্দেশের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; শচী ইহা দেখিয়া বালকের মুখ হইতে মাটীগুলি কাড়িয়া লইলেন। শিশু নিমাই মাতাকে দার্শনিক উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন,—"খই, সন্দেশ, অন্ন প্রভৃতির সহিত মৃত্তিকার কোন ভেদ নাই; কারণ, উহারা সকলই মৃত্তিকার বিকার। জীবের দেহ, জীবের খাদ্য—সমস্তই 'মাটী'।" শচী ইহা শুনিয়া বলিলেন,—"জগতের সকল জিনিষ

মাটীর বিকার হইলেও মাটী ও উহার বিকারের মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার আছে। মাটির বিকার অন্ন ভক্ষণ করিলে দেহ পুষ্টি হয়, কিন্তু আবার মাটী ভক্ষণ করিলে দেহ অসুস্থ ও বিনষ্ট হয়। মাটীর বিকার ঘটের মধ্যে জল আনয়ন করা যায়, কিন্তু মাটীর 'পিণ্ডে' জল আনিতে গেলে সমস্ত জল উহার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে।" মাতার এই উত্তর শুনিয়া নিমাই আনন্দিত হইলেন এবং ইহা দ্বারা শুষ্কজ্ঞানবাদিগণের একদেশী বিচার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধা ভক্তির সার্ব্বদেশিক অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার গ্রহণই কর্ত্তব্য—এই শিক্ষা দিলেন।

তৈর্থিক-বিপ্র

একদিন জনৈক গোপালভক্ত তীর্থপর্য্যটক ব্রাহ্মণ শ্রীমায়াপুরে মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ শ্রীজগন্নাথমিশ্র সেই বিপ্রকে রন্ধন-সামগ্রী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া ধ্যানে গোপালকে ভোগ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে বালক নিমাই আসিয়া ব্রাহ্মণের সেই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। সেই অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণ মিশ্রের অনুরোধে দ্বিতীয়বার ভোগ রন্ধন করিলেন। বিপ্রের ধ্যানে ভোগ-নিবেদনকালে দ্বিতীয়-বারও সেইরূপ ঘটনাই ঘটিল। বিশ্বরূপের অনুরোধে তৈর্থিক-বিপ্র তৃতীয়বার রন্ধন করিলেন। এবার বালককে বিশেষ সতর্কতার সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল; বালক নিদ্রিত থাকিবার অভিনয় দেখাইলেন। এদিকে রাত্রি অধিক হইল। গৌরহরির ইচ্ছায়

নিদ্রাদেবী সকলেরই নয়ন-কোণে অতিথি হইলে তাঁহারা সেই নিদ্রাদেবীর সৎকারেই ব্যস্ত হইয়া তৈর্থিক-অতিথির কথা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় তৈর্থিক-বিপ্র পুনরায় ধ্যানে গোপালকে পক্কান্ন নিবেদন করিতে উদ্যত হইলে নিমাই তৃতীয়বার হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ বিপ্রের নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহাকার করিতে থাকিলে নিমাই বিপ্রের নিকট চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে বিপ্র! তুমি আমার নিত্য-সেবক; আমি যখন ব্রজে নন্দদুলালরূপে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তখনও তোমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে দেখা দিলাম।" তখন ব্রাহ্মণ নিজ-ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহা-প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং আপনাকে ধন্য মানিয়া প্রভুর ভুক্তাবশেষ-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। প্রভু তৈর্থিক-বিপ্রকে এই গুপ্ত-লীলাটি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

নিমাইর বিদ্যারম্ভ ও চাঞ্চল্য

শ্রীজগন্নাথমিশ্র নিমাইর 'হাতে-খড়ি', 'কর্ণবেধ' ও 'চূড়াকরণ-সংস্কার' সমাপন করিলেন। দৃষ্টিমাত্রই নিমাই সমস্ত অক্ষর লিখিয়া যাইতেন। দুই তিন দিনে সমস্ত ফলা ও বানান আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন এবং 'রাম', 'কৃষ্ণ', 'মুরারি', 'মুকুন্দ', 'বনমালী'—এই সকল কৃষ্ণনাম লিখিতে লাগিলেন। নিমাই যখন মধুর স্বরে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' উচ্চারণ করিতেন, তখন সকলের প্রাণ কাড়িয়া লইতেন। শ্রীগৌর-গোপাল কখনও আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী, কখনও বা চন্দ্র ও তারাসমূহকে আনিয়া দিবার জন্য মাতা-পিতার নিকট আব্দার করিতেন ও ঐ সকল জিনিষ না পাইলে অত্যন্ত কাঁদিতে থাকিতেন। তখন হরিনাম-কীর্ত্তন ব্যতীত বালককে অপর কিছুতেই শান্ত করা যাইত না।

শ্রীমায়াপুরে মিশ্রভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে শ্রীজগদীশ ও শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের গৃহ। কোনও এক একাদশী তিথিতে তাঁহাদের গৃহে বিষ্ণুর ভোগ প্রস্তুত হইতেছিল। নিমাই সেই নৈবেদ্য ভোজন করিবার ইচ্ছায় শ্রীজগন্নাথমিশ্রকে হিরণ্য-জগদীশের গৃহে তাহা আনয়ন করিবার জন্য পাঠাইলেন। হিরণ্য-জগদীশ মিশ্রের মুখে বালকের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া

বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"অদ্য একাদশী, আর আমাদের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে—এই কথা শিশু কিরূপেই বা জানিল? অবশ্যই এ বালকে কোনও বৈষ্ণবী শক্তি আছে।" তাঁহারা এইরূপ বিচার করিয়া সেই নৈবেদ্য বালকের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিশুর পক্ষে এত দূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু অন্তর্য্যামী নিমাই ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য ও একাদশী-দিবসে একমাত্র ভগবান্ই ভোগ-গ্রহণের অধিকারী, তাহা সকলকে জানাইবার নিমিত্ত ঐরূপ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

নিমাইর চঞ্চলতা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। বয়স্যগণের সহিত পরিহাস ও কলহ এবং মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নানের সময় জলকেলি ইত্যাদি নানাপ্রকার চঞ্চলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিকে নদীয়ার পুরুষগণ যেরূপ জগন্নাথমিশ্রের নিকট প্রত্যহই নিমাইর দুর্ব্ব্যবহারের নানাপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিতে লাগিল, অপরদিকে বালিকাগণও নিমাইর নানাপ্রকার চাপল্যের কথা শচীমাতার কর্ণগোচর করিল। শ্রীশচীদেবী সকলকে মিষ্টবাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথমিশ্র নিমাইর ঐরূপ উপদ্রবের কথা শুনিয়া পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য মধ্যাহ্নকালে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। নিমাই ক্রুদ্ধ পিতার আগমন জানিতে পারিয়াই অন্যপথে গৃহে পলাইয়া গেলেন এবং বয়স্যগণকে বলিয়া গেলেন যে, যদি মিশ্র মহাশয় আসিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে যেন তাহারা মিশ্রকে

"অদ্য নিমাই গঙ্গাস্নানে আসে নাই" বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। গঙ্গার ঘাটে নিমাইকে না দেখিয়া শ্রীজগন্নাথমিশ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নিমাই অস্নাত অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে মসীবিন্দুলিপ্ত হইয়া বসিয়া আছেন। মিশ্র বাৎসল্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বালকের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। নিমাইকে অভিযোগকারী ব্যক্তি-গণের কথা জানাইলে নিমাই বলিলেন,—"আমি গঙ্গাস্নানে না গেলেও যখন তাহারা আমার সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, তখন আমি সত্যসত্যই তাহাদের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিব।" এইরূপ চাতুরী করিয়া নিমাই পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিলেন। এদিকে শচী-জগন্নাথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এ অদ্ভুত বালক কে? এ কি নন্দদুলালই গুপ্তভাবে আমাদের গৃহে আসিয়াছেন!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত-সভা—বিশ্বরূপের সন্ন্যাস

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী ছিল। তিনি নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের উত্তরে কিছু দূরে একটি টোল খুলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির প্রকটের পূর্ব্বে এই স্থানে তিনি ভগবানের আবির্ভাবের জন্য জল-তুলসী দিয়া শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিতেন এবং হুঙ্কার করিয়া ভগবানের নিকট সমস্ত জগতের

বিমুখতার কথা জানাইতেন। এই স্থানে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, চন্দ্রশেখর, মুরারি প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া ভগবানের কথা আলোচনা করিতেন।)

বিশ্বম্ভরের অগ্রজ বিশ্বরূপ বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্ব্বগুণে গুণী ছিলেন। সমস্ত সংসার জাগতিক কথায় মত্ত, সকলের হৃদয়েই ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তের প্রতি ন্যূনাধিক বিমুখতার ভাব, এমন কি, যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি পড়াইতেন, তাঁহাদেরও আন্তরিক হরিভক্তির অভাব দেখিয়া তিনি আর লোক-মুখ দর্শন করিবেন না,—এইরূপ বিচার করিলেন এবং অন্তরে অন্তরে সংসার-ত্যাগের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়াই তিনি অদ্বৈত-সভায় আসিতেন এবং শাস্ত্র হইতে হরিভক্তির ব্যাখ্যা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। ভোজনের বেলা অতিক্রান্ত দেখিয়া শচীদেবী প্রায়ই বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিবার জন্য নিমাইকে অদ্বৈত-সভায় পাঠাইয়া দিতেন। নিমাইর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া সভাস্থ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর চিত্ত মুগ্ধ হইত। বিশ্বরূপ গৃহে আসিয়া ভগবৎ-প্রসাদ সম্মান করিয়াই আবার অদ্বৈত-সভায় চলিয়া যাইতেন। গৃহে গমন করিলেও তিনি কোনপ্রকার গৃহ-কার্য্য করিতেন না; যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিতেন, ততক্ষণ ঠাকুর-ঘরেই অবস্থান করিতেন। মাতা-পিতা বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া বিশ্বরূপ অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও কিছু দিনের মধ্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া **'শঙ্করারণ্য'** নামে খ্যাত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উপনয়ন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন

বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিবার পর নিমাইর চঞ্চলতা হ্রাস হইল। এবার তিনি পাঠে মনোযোগ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীজগন্নাথমিশ্র কিন্তু বালকের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি ও পাঠে মনোনিবেশের কথা শুনিয়াও অন্তরে উৎফুল্ল হইতে পারিলেন না; কারণ, তাঁহার আশঙ্কা হইল,—বিশ্বরূপ শাস্ত্র পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন; কি জানি, নিমাইও পাছে লেখা-পড়া শিখিয়া অগ্রজেরই অনুসরণ করে! এজন্য মিশ্র নিমাইর পাঠ বন্ধ করাইলেন। নিমাই আবার প্রবলবেগে ঔদ্ধত্য ও চাপল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন নিমাই গৃহের বাহিরে বিষ্ণুর নৈবেদ্য রন্ধনের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা-লিপ্ত মৃৎপাত্র-সমূহের উপর গিয়া বসিয়া রহিলেন; শচীমাতা এই কথা জানিতে পারিয়া বালককে সেই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্নানাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলে বালক নিমাই মাতাকে জানাইলেন,—বিদ্যাহীন ব্যক্তি কি প্রকারেই বা ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি বিচার করিবে? আবার বলিলেন,—এই সকল ভাণ্ডে যখন বিষ্ণুর ভোগ রন্ধন হইয়াছে, তখন এই সকল ভাণ্ড কখনই অপবিত্র হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেস্থানে ভগবান্

উপবেশন করেন, সেই স্থান সর্ব্বপুণ্যময় ; তথায় গঙ্গাদি সর্ব্ব-তীর্থের অধিষ্ঠান হয়।

শুভমাসে, শুভদিনে শ্রীগৌরসুন্দরের উপনয়ন হইল। শ্রীঅনন্তদেব যজ্ঞসূত্ররূপে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। নিমাই বামনরূপে সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাই অধ্যয়ন করিতে গেলেন। গঙ্গাদাস তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে নিমাইকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী ও বিচক্ষণ দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। গঙ্গাদাসের শিষ্যগণের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি যে-সকল ছাত্র প্রধান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই নানাপ্রকার 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিয়া অপদস্থ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। গঙ্গার ঘাটে গিয়া নিমাই প্রত্যহই অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত তর্ক করিতেন। সূত্র-ব্যাখ্যার সময় নিজে যাহা স্থাপন করিতেন, তাহাই স্বয়ং খণ্ডন ও পুনঃ সংস্থাপন করিয়া ছাত্রগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতেন।

গঙ্গা অনেকদিন যাবৎ যমুনার ভাগ্য বাঞ্ছা করিতেছিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরহরি শ্রীগঙ্গাদেবীর সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে থাকিলেন। শ্রীনিমাই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুপূজা, শ্রীতুলসীকে জলপ্রদান ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া গৃহের মধ্যে নির্জ্জন-স্থানে অধ্যয়ন ও সূত্রের টিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন। শ্রীজগন্নাথমিশ্র এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন এবং বাৎসল্যপ্রেমের স্বভাব-বশতঃ নিজ-পুত্রের কল্যাণের জন্য

শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। তিনি ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন বাৎসল্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেন না যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একদিন শ্রীজগন্নাথমিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—শ্রীনিমাই নবীন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনামে হাস্য, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা নিমাই বিষ্ণুর সিংহাসনে উঠিয়া সকলের মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রমুখ দেবতাগণ "জয় শ্রীশচীনন্দন" বলিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্তুতি গান করিতেছেন; কখনও বা নিমাই নগরে-নগরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন, আর কোটি কোটি লোক নিমাইর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন; কখনও বা অপরূপ পরিব্রাজকবেশে নিমাই ভক্তগণের সঙ্গে মহা-রঙ্গে নীলাচলে গমন করিতেছেন।

এই স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীজগন্নাথমিশ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিমাই নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিবেন—এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। শ্রীশচীদেবী মিশ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"নিমাই যেরূপ লেখা-পড়ায় মনোনিবেশ করিয়াছে, তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না।" কিছুকাল পরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অন্তর্ধান হইল। শ্রীদশরথের বিজয়ে (ভক্ত-বিরহে) শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের তিরোধানেও শ্রীনিমাই তদ্রূপ ক্রন্দন করিলেন। নিমাই শচী-মাতাকে বহু সান্ত্বনা-বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন; বলিলেন,—

"মা, আমি তোমাকে ব্রহ্মা-মহেশ্বরেরও সুদুর্ল্লভ বস্তু প্রদান করিব; তুমি কোনও চিন্তা করিও না।"

একদিন নিমাই গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় শচীদেবীর নিকট গঙ্গা-পূজার জন্য তৈল, আমলকী, মালা, চন্দন প্রভৃতি উপায়ন চাহিলেন। শচীদেবী নিমাইকে একটুকু অপেক্ষা করিতে বলায় নিমাই ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহের যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, ঘর-দ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন ; কেবলমাত্র জননীর অঙ্গে হাত তুলিলেন না। সমস্ত বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর নিমাই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শচীদেবী গন্ধমাল্যাদি সংগ্রহ করিয়া নিমাইর গঙ্গা-পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। যশোদা যেরূপ গোকুলে বালকৃষ্ণের সমস্ত চঞ্চলতা সহ্য করিতেন, তদ্রূপ শচী-দেবীও নবদ্বীপে নিমাইর সকল চপলতা সহ্য করিতে লাগিলেন। নিমাই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গা-পূজা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং ভোজনাদি-কার্য্য সমাপন করিলেন। তখন শচীমাতা পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"তুমি পিতৃহীন বালক, গৃহসামগ্রী এইরূপে নষ্ট করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ? কাল কি খাইবে,—এমন কোন সম্বল আমাদের গৃহে নাই, এমতাবস্থায় গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট করা কি উচিত ?"

নিমাই জননীকে বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণই সকলের পালক। তাঁহার দাসের পক্ষে আহারের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।" ইহা বলিয়া নিমাই অধ্যয়নের জন্য বাহিরে গমন করিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া জননীর হাতে দুই তোলা স্বর্ণ প্রদান করিয়া

বলিলেন,—"কৃষ্ণ এই সম্বল পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা ভাঙ্গাইয়া তোমার ব্যয় নির্ব্বাহ কর।" শচীদেবী দেখিতে লাগিলেন—যখন গৃহে অর্থের অভাব হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে স্থবর্ণ লইয়া আসেন। শচীদেবী ইহাতে ভীতা হইলেন—কি জানি, পাছে কোন প্রমাদ ঘটে! দশ পাঁচ জনকে দেখাইয়া শচীদেবী সেই স্থবর্ণখণ্ডগুলিকে ভাঙ্গাইয়া ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করিতেন।

নিমাই ব্রহ্মচারিবেশে কপালে ঊর্দ্ধতিলক অঙ্কিত করিয়া প্রত্যহ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পড়িতে যাইতেন ও ছাত্রগণের মধ্যে সূত্রের এইরূপ নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিতেন যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিমাইকে ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন প্রদান করিয়া মধ্যস্থলে বসাইতেন। এই সময় স্নান, ভোজন, ভ্রমণ—সকল কার্য্যেই নিমাই শাস্ত্রচর্চ্চা ব্যতীত আর কিছু করিতেন না।

প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়াই নিমাই ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় পড়িতে বসিতেন এবং শাস্ত্রের বিচার লইয়া বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিতেন। যে-সকল ছাত্র নিমাইর অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করিতেন, নিমাই তাঁহাদিগের পাঠের নানা দোষ দেখাইতেন। মুরারিগুপ্ত নিমাইর অনুগত হইয়া পাঠ করেন না দেখিয়া একদিন নিমাই মুরারিকে বলিলেন—"মুরারি, তুমি বৈদ্য; লতা-পাতা-ঘাঁটাই তোমার সাজে; ব্যাকরণ-শাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র; ইহাতে কফ, পিত্ত বা অজীর্ণ রোগের ব্যবস্থা

নাই ; তুমি নিজে নিজে ইহা কি বুঝিবে ? যাও, গিয়া রোগীর চিকিৎসা কর ।”

সময় সময় মুরারিগুপ্ত মৌন থাকিতেন ; কখনও বা নিমাইর বাক্যের প্রতিবাদ করিতে যাইতেন । কিন্তু শেষে নিমাইর সহিত পারিয়া উঠিতেন না । তখন মনে মনে বুঝিতেন—নিমাই সাধারণ মনুষ্য নহেন, নিশ্চয়ই কোন অতিমর্ত্ত্য পুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন । মুরারিগুপ্ত এইরূপে পরাজিত হইয়া নিমাইর আনুগত্যে অধ্যয়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন ।

ষোলবৎসর-বয়স্ক যুবক নিমাইর শাস্ত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন । নবদ্বীপবাসী মুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই তাঁহার একটি বিদ্যা-চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন । তখন ‘হয়-ব্যাখ্যা নয় করা, নয়-ব্যাখ্যা হয় করা’, আর অন্যান্য অধ্যাপকগণের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব প্রমাণিত করা ও তাঁহাদিগকে বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করাই নিমাইর কার্য্য পড়িয়া গেল ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিমাইর প্রথম বিবাহ

নবদ্বীপে বল্লভাচার্য্য-নামে জনকতুল্য একজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীও মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। বল্লাভাচার্য্য কন্যাকে উপযুক্ত বরের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য চিন্তিত ছিলেন। একদিন লক্ষ্মী গঙ্গাস্নানে গমন করেন, দৈবক্রমে গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহারা উভয়েই মনে মনে একে অন্যকে অঙ্গীকার করিলেন।

এদিকে সেই দিনই বনমালী আচার্য্য-নামক এক ঘটক যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই শ্রীশচীদেবীর নিকট গমন করিয়া বল্লভাচার্য্যের কন্যার সহিত নিমাইর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। শচীদেবী বলিলেন,—"আমার নিমাই পিতৃহীন বালক, আগে বাঁচিয়া থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করুক, পরে তাঁহার বিবাহের চিন্তা করা যাইবে।" শচীর কথায় নিরাশ হইয়া বনমালী ঘটক চলিয়া গেলেন। দৈবাৎ পথে নিমাইর সহিত ঘটকের সাক্ষাৎকার হইল। ঘটক মহাশয় নিমাইর বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য তাঁহার মাতার নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু শচীদেবী সেই প্রস্তাব বিশেষ গ্রাহ্য করেন নাই—এই কথা ঘটক মহাশয় নিমাইকে জানাইলেন। নিমাই তখন গৃহে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে মাতাকে বলিলেন,—"মা, তুমি

আচার্য্যকে ভাল করিয়া সম্ভাষণ কর নাই কেন ?" নিমাইর বনমালী ঘটকের প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি আছে—এই ইঙ্গিত পাইয়া শচীদেবী তৎপর দিবস ঘটক মহাশয়কে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও শীঘ্রই শুভ-বিবাহ সম্পন্ন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বনমালী আচার্য্যও বল্লভাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বল্লভাচার্য্য তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন যে, তিনি অতি দরিদ্র, পাঁচটী হরিতকীমাত্র দিয়া জগন্নাথ-মিশ্রের পুত্ররত্নের হস্তে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিবেন। জামাতাকে তাঁহার অন্য কিছু যৌতুক-প্রদানের ক্ষমতা নাই।

বর ও কন্যা উভয়ের সম্মতিক্রমে শুভদিন স্থির হইল। বিবাহের পূর্ব্বদিন নিমাইর অধিবাস-ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। পরদিবস শুভ গোধূলি-লগ্নে যাত্রা করিয়া নিমাই বল্লভাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন ও যথাবিধি লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে নিমাই লক্ষ্মীর সহিত দোলায় চড়িয়া নিজ গৃহে ফিরিলেন। শচীমাতা মহা-লক্ষ্মী পুত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। তদবধি শচীদেবী নিজ-গৃহে অনেক অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কখনও ঘরের বাহিরে অদ্ভুত জ্যোতিঃ, কখনও নিমাইর পাশে অগ্নিশিখা দর্শন, কখনও বা পদ্মের গন্ধ পাইতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী মনুষ্য নহেন—বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে শ্রীলক্ষ্মী-গৌরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ—শচীদেবীর অন্তরে এইরূপ ভাব উদিত হইতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আত্ম-প্রকাশের ভবিষ্যদ্‌বাণী

নিমাই পণ্ডিত অধ্যয়ন-রসে মত্ত হইয়া ছাত্রগণের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপে অন্য কোন পণ্ডিতই নিমাইর ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন না। নদীয়ার নাগরিকগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তি অনুসারে নিমাইকে নানারূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড-প্রকৃতির লোকগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম, রমণীগণ মদন ও পণ্ডিতগণ বৃহস্পতিরূপে অনুভব করিলেন। এদিকে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তিহীন জগতে কবে আবার শুদ্ধভক্তি প্রকাশিত হইবে, সেই আশায় কোনরূপে প্রাণধারণ করিতেছিলেন। বিদ্যা-চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপে বিদ্যা-লাভের জন্য সকল দেশ হইতেই লোক আগমন করিতেন। চট্টগ্রামবাসী অনেক বৈষ্ণব সেই সময় গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া থাকিতেন। অপরাহ্ণকালে ভাগবতগণ সকলেই শ্রীঅদ্বৈত-সভায় আসিয়া মিলিতেন। শ্রীমুকুন্দদত্তের শ্রীহরিকীর্ত্তনে বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ ছুটিত। নিমাইও তজ্জন্য মুকুন্দের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। মুকুন্দকে দেখিলেই নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে উহা লইয়া প্রেমের

দ্বন্দ্ব চলিত। শ্রীবাসাদি বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তগণকেও নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িতেন না। নিমাইর ভয়ে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। এদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে ভালবাসিতেন না, আর নিমাইও ন্যায়ের ফাঁকি ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় মুকুন্দও গঙ্গাস্নানে চলিয়াছিলেন। নিমাইকে দেখিয়াই মুকুন্দ লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নিমাই মুকুন্দের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গী গোবিন্দের নিকট বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, মুকুন্দ কেন পলাইতেছে। মুকুন্দ মনে করে যে, আমার সহিত দেখা হইলে বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সম্ভাষণ হইয়া যাইবে! মুকুন্দের হৃদয়ের ভাব যে, সে নিজে বৈষ্ণবের শাস্ত্র পাঠ করে, আর আমি পাঁজি, বৃত্তি, টীকা প্রভৃতি জাগতিক শাস্ত্র পাঠ করি! আর বেশীদিন নয়, শীঘ্রই সে দেখিতে পাইবে,—আমি কত বড় বৈষ্ণব হই! আমি পৃথিবীর মধ্যে এত বড় বৈষ্ণব হইব যে, ব্রহ্মা-শিবাদি বৈষ্ণবগণ আমার দ্বারে গড়াগড়ি যাইবে। যাহারা এখন আমাকে দেখিয়া পলাইতেছে, তাহারাই তখন কোটি কণ্ঠে আমার গুণ-গান করিবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী

'ভক্তিরসের আদিসূত্রধার' * 'ভক্তিরসকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর' † সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব-গুরু। ইঁহারই শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামীর 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়', শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের 'প্রমেয়রত্নাবলীতে', শ্রীগোপাল-গুরু গোস্বামীর গ্রন্থে ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থের লেখক শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে বার বৎসর বয়সে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া আট বৎসর-কাল যাবৎ ভারতের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী। ইনি হালিসহরের নিকটবর্ত্তী কুমারহট্টে ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হন।

নিমাই পণ্ডিত যখন নবদ্বীপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মগ্ন ছিলেন, তখন একদিন ছদ্মবেশে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া

* চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৬০ † চৈঃ চঃ আঃ ৯।১০ ও অঃ ৮।৩৪

'অদ্বৈত-সভায়' উঠিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরপুরীর অপূর্ব্ব তেজঃ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে পারিলেন। মুকুন্দ তখন অদ্বৈত-সভায় একটি কৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরপুরীর অঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব্ব অষ্ট-সাত্ত্বিকবিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। পরে সকলেই এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে ঈশ্বর-পুরী বলিয়া জানিতে পারিলেন।

একদিন নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দৈবাৎ পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইল। ঈশ্বরপুরী নিমাইর অপূর্ব্ব কান্তি দেখিয়া তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং মহা-সমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। শচীমাতা কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া ঈশ্বরপুরীকে ভিক্ষা করাইলেন। নিমাইর সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গ বলিতে বলিতে ঈশ্বরপুরী প্রেমে বিহ্বল হইলেন। নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে শ্রীঈশ্বরপুরী কএক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই পরম-বিরক্ত গদাধর পণ্ডিতের প্রেমের লক্ষণ-সমূহ দেখিয়া ঈশ্বরপুরী গদাধরের প্রতি বড়ই স্নেহযুক্ত হইলেন এবং গদাধরকে পুরীপাদ তাঁহার স্ব-রচিত "**শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত**" পুঁথি পড়াইলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমাপ্ত করিয়া নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করিবার জন্য গোপীনাথের গৃহে যাইতেন। একদিন ঈশ্বরপুরী নিমাই পণ্ডিতকে "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" পুঁথির রচনায়

কোথায়ও কোন দোষ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"যে গ্রন্থ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তের রচিত, তাহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি তাহাতে দোষ দর্শন করে, তাহারই দোষ, সে ব্যক্তিই অপরাধী ও মূর্খ। শুদ্ধভক্তের কবিত্ব যে-কোনরূপই হউক না কেন, তাহাতেই কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি-ঘটিত কোনপ্রকার দোষ ভক্তিবশ ভাবগ্রাহী ভগবান্ গ্রহণ করেন না। এমন কোন্ দুঃসাহসী ব্যক্তি আছে, যে ঈশ্বর-পুরীর ন্যায় মহাভাগবতের ভগবৎকথা-বর্ণনের মধ্যে দোষ ধরিতে সমর্থ হইবে ?"

তথাপি ঈশ্বরপুরী স্বীয় গ্রন্থের সমালোচনার জন্য নিমাইকে প্রত্যহই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত প্রত্যহ দুই চারি দণ্ড নানাপ্রকার বিচার করিতেন। একদিন ঈশ্বরপুরীর একটি শ্লোক শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত রঙ্গচ্ছলে জানাইলেন যে, ঐ শ্লোকস্থিত ধাতুটি 'আত্মনেপদী' না হইয়া পরস্মৈপদী হইলেই ঠিক হয়। পরে আর একদিন নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট আসিলে পুরীপাদ নিমাইকে কহিলেন,—"তুমি যে ধাতুটি আত্মনেপদী বলিয়া স্বীকার কর নাই, আমি কিন্তু উহাকে আত্মনেপদি-রূপেই সাধিয়াছি।" প্রভুও ভৃত্যের জয়-প্রদর্শন ও মহিম-বর্দ্ধনের জন্য তাহাতে আর কোন দোষারোপ করিলেন না। ঈশ্বরপুরী তীর্থ-পর্য্যটন করিবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নিমাইর নগর-ভ্রমণ

সশিষ্য নিমাই যথেচ্ছভাবে নগর-ভ্রমণ করিতেন। একদিন পথে মুকুন্দের সহিত দৈবাৎ দেখা হইলে নিমাই মুকুন্দকে দূরে দূরে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং তৎসঙ্গে জানাইয়া দেন যে, এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্য্যন্ত মুকুন্দের পরিত্রাণ নাই। মুকুন্দ মনে করিয়াছিলেন, নিমাইর কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই অধিকার আছে, তাই মুকুন্দ নিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কতকগুলি কূট-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিরুত্তর করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু নিমাই মুকুন্দের সমস্ত কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিলেন। মুকুন্দ নিমাইর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা!
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১৮

যাঁহারা মনে করেন, নিমাই কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন, মুকুন্দ তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করিয়াছেন।

আর একদিন গদাধর পণ্ডিতের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইল। নিমাই গদাধরকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গদাধর ন্যায়-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী নিমাই পণ্ডিতের নিকট মুক্তির

লক্ষণ বর্ণন করিলে নিমাই তাহাতে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিলেন। "আত্যন্তিক দুঃখনাশই মুক্তির লক্ষণ"—গদাধরের এই উক্তিকে নিমাই খণ্ডন করিলেন।

প্রত্যহ অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে বসিয়া নিমাই ছাত্রগণের নিকট শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেন। বৈষ্ণবগণও নিমাইর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন; কিন্তু তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেন, নিমাইর ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তির কৃষ্ণভক্তি হইলেই সমস্ত সফল হইত। ভাগবতগণ "নিমাইর কৃষ্ণে মতি হউক"—অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদা এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। কেহ বা প্রেমের স্বভাব-বশতঃ "নিমাইর কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক"—এইরূপ আশীর্ব্বাদও করিতেন। প্রেমের এমনই স্বভাব—তাহা প্রেমাস্পদকে ঐশ্বর্য্যময় প্রভু-ভাবে না দেখিয়া পাল্যভাবে দেখিয়া থাকে। নতুবা যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের বেশে একদিন জগতে কৃষ্ণভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকেও "কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার রহস্য কি? শ্রীবাসাদি ভাগবতগণকে দেখিলেই নিমাই নমস্কার করিতেন ও ভক্তের আশীর্ব্বাদ ফলেই যে কৃষ্ণভক্তি সম্ভব, তাহা সকলকে জানাইতেন। বিধর্ম্মিগণও নিমাইকে একবার দর্শন করিলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না।

একবার নিমাই বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রকাশ করিলেন। তখন প্রেমস্বভাব বন্ধু-বান্ধবগণ নিমাইর মস্তকে নানাবিধ পাকতৈল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই

সময় নিমাই কোন কোন দিন আস্ফালন ও হুঙ্কারের সহিত নিজের স্বরূপ ও তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।

নিমাই দ্বিপ্রহরে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের পূজা, তুলসীকে জল-প্রদান ও তুলসী-পরিক্রমা করিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন; কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অধ্যাপনার জন্য গমন এবং নগরে আসিয়া নাগরিকগণের সহিত সহাস্য সম্ভাষণ ও বিবিধ কৌতুক-বিলাসাদি করিতেন।

কোনদিন নিমাই তন্তুবায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র যাচ্ঞা করিয়া ঐ সকল দ্রব্য বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতেন। কোনদিন বা তিনি গোপ-গৃহে উপস্থিত হইয়া গোপগণকে দধি-দুগ্ধ আনিতে বলিতেন। গোপগণও নিমাইকে 'মামা' বলিয়া সম্ভাষণ ও নানাবিধ রহস্য করিয়া বিনা মূল্যে প্রচুর দধি-দুগ্ধাদি প্রদান করিতেন। নিমাই উপহাসচ্ছলে তাঁহাদের নিকট নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। কোনও দিন গন্ধবণিকের গৃহ হইতে নানাবিধ দিব্যগন্ধ, কোনও দিন মালাকারের গৃহ হইতে নানাপ্রকার পুষ্পমাল্য, কোনও দিন বা তাম্বূলীর গৃহ হইতে বিনা মূল্যে তাম্বূলাদি গ্রহণ করিয়া নিমাই তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। সকলেই নিমাইর অনুপম রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিনা মূল্যেই তাঁহাকে যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেন। কোনও দিন শঙ্খবণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে বণিক্ শ্রীগৌরনারায়ণের হস্তে শঙ্খ প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেন, তৎপরিবর্ত্তে কোন মূল্য চাহিতেন না।

একদিন নিমাই কোনও এক দৈবজ্ঞের (জ্যোতিষীর) গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ গোপাল-মন্ত্র জপ করিয়া গণনা করিতে উদ্যত হইবা-মাত্র বিবিধ ঈশ্বরতত্ত্ব ও অদ্ভুত রূপরাশি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল অদ্ভুত অতিমর্ত্ত্য রূপ দেখিতে দেখিতে দৈবজ্ঞ সম্মুখস্থ শ্রীগৌরাঙ্গকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের মায়ার প্রভাবে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন না; পরম বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন,—বোধ হয়, কোন মহামন্ত্রবিৎ অথবা কোন দেবতা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

একদিন নিমাই খোলাবেচা-ব্রাহ্মণ শ্রীধরের গৃহে গমন করিলেন। শ্রীধর লোকচক্ষে অত্যন্ত দরিদ্র, তাঁহার পরিধানে শতছিদ্র বস্ত্র, তিনি জীর্ণশীর্ণ পর্ণকুটীরে বাস করেন, ঘরে তৈজসপত্র কিছুই নাই, সামান্য লৌহ-পাত্রে জল পান করেন, থোড়-কলা-মোচা প্রভৃতি সামান্য বস্তু বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পান, তাহা দ্বারাই অতি শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের সামান্য নৈবেদ্য সংগ্রহ করেন।

নিমাই শ্রীধরের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি লক্ষ্মীকান্তের সেবা কর, অথচ তোমার এই প্রকার দারিদ্র্য কেন? আর লোকে চণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া সাংসারিক কত উন্নতি করিতেছে!" উত্তরে শ্রীধর বলিলেন,— "রাজা প্রাসাদে বাস, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও দুগ্ধফেননিভশয্যায় শয়ন করিয়া যেরূপভাবে কাল কাটাইতেছেন, পক্ষিগণ বৃক্ষের

উপরে কুলায় বাঁধিয়া ও নানা স্থান হইতে আহৃত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ভোজন করিয়াও তদ্রূপই কাল কাটাইতেছে। সকলেই নিজ-নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে।"* নিমাই বলিলেন,—"তোমার অনেক গুপ্তধন আছে, তুমি তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছ—দেখি, কতদিন লুকাইয়া রাখিতে পার। শীঘ্রই লোকের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া দিব।" এইরূপে নিমাই শ্রীধরের সহিত রহস্যচ্ছলে ভক্তের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটন করিতেন ও শ্রীধরের নিকট হইতে প্রত্যহ বিনা মূল্যে থোড়-কলা-মূলা প্রভৃতি আদায় করিতেন।

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া নিমাইর বৃন্দাবন-চন্দ্রের ভাবের উদ্দীপনা হইল ও সেইভাবে অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। একমাত্র শ্রীশচীমাতা ব্যতীত আর কেহই সেই মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। শ্রীশচীদেবী ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—নিমাই বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। শচীদেবী সেখানে আসিয়া আর সেই বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু দেখিলেন,—পুত্রের বক্ষে সাক্ষাৎ চন্দ্রমণ্ডল শোভা পাইতেছে।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত পথে নিমাইকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—"নিমাই, তুমি এখনও কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ না

---

* রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিবা খায়, পরে।
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ-কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১৮৯-১৯০

করিয়া কেন বৃথা কাল কাটাইতেছ? রাত্রিদিন পড়িয়া ও পড়াইয়া তোমার কি লাভ হইবে? লোকে কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই পড়া-শুনা করে; যদি সেই কৃষ্ণভক্তিই না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিস্ফলা বিদ্যায় কি লাভ? অতএব আর বৃথা কাল নষ্ট করিও না।” নিমাই নিজের ভক্তের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—“পণ্ডিত, তুমি ভক্ত, তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।”

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দিগ্বিজয়ি-জয়

যখন নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপকগণের মুকুটমণি হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহা পণ্ডিত সকল দেশের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে জয় করিয়া পণ্ডিত-সমাজের প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে জয় করিতে আসিলেন। দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে ছিল—হস্তী, অশ্ব ও বহু শিষ্য। দিগ্বিজয়ী সগর্বে আসিয়া পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ এক মহা-দিগ্বিজয়ীর আগমনের সংবাদ পাইয়া অতিশয় চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

এদিকে নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ এই সংবাদ নিমাইর নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—"দর্পহারী ভগবান্ অহঙ্কারীর দর্প চিরদিনই হরণ করেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ জন চিরকালই বিনীত। হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ প্রভৃতি নৃপগণ মহা-দিগ্বিজয়ী বলিয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়াছিল। অবশেষে ভগবান্ তাহাদের সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে নবাগত এই দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবান্ই অচিরে চূর্ণ করিবেন।"

ইহা বলিয়া নিমাই পণ্ডিত সেইদিন সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাতীরে বসিয়া দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের কথা চিন্তা করিতে-ছিলেন। সেইদিন ছিল—পূর্ণিমা-তিথি; নিশার প্রাক্কালেই দিগ্বিজয়ী নিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া উপস্থিত। নিমাইর ছাত্রগণের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত-তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া দিগ্বিজয়ী নিমাইকে সম্ভাষণ করিলেন। নিমাই দিগ্বিজয়ীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"শুনিয়াছি, আপনি কাব্যশাস্ত্রে অতুলনীয় পণ্ডিত। যদি আপনি পাপনাশিনী গঙ্গার মহিমা বর্ণন করেন, তবে তাহা শুনিয়া সকলের পাপ-তাপ দূর হইতে পারে।" নিমাইর এই কথা শুনিবা-মাত্রই দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ যুগপৎ শত-মেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর স্বরে গঙ্গা-মহিমাত্মক শ্লোক অতি দ্রুতবেগে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিগ্বিজয়ী এক প্রহরকাল ঐরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া

বিরত হইলে নিমাই ঐ স্তবের মধ্য হইতে একটি পূর্ণ শ্লোক * উচ্চারণ করিয়া দিগ্বিজয়ীকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী বিস্মিত হইয়া নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি এতক্ষণ ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোক পড়িয়া গিয়াছি, আপনি কিরূপে উহার মধ্য হইতে এই শ্লোকটি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন?"

নিমাই ঐ শ্লোকে দুই স্থানে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ, বিরুদ্ধমতি-দোষ, পুনরুক্তি-দোষ ও ভগ্নক্রমদোষ ‡ এক একটি করিয়া এই পাঁচটি দোষ দেখাইয়া বলিলেন,—পাঁচটী অলঙ্কারগুণ থাকা-সত্ত্বেও এই পাঁচটি দোষে দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের কবিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

---

* দিগ্‌বিজয়ীর রচিত শ্লোকটি এই :—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

‡ এই শ্লোকে পাঁচটি দোষ আছে অর্থাৎ দুই স্থানে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ, আবার তিন স্থানে বিরুদ্ধমতি, পুনরুক্তি ও ভগ্নক্রম-দোষ আছে। প্রথম অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ এই যে, এই শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্বই মূল বিধেয় এবং 'ইদং' শব্দ—অনুবাদ; এই স্থলে 'গঙ্গার মহত্ত্ব' আগে লিখিয়া 'ইদং' শব্দ পশ্চাৎ লেখা অবৈধ হইয়াছে। অনুবাদ অর্থাৎ পরিজ্ঞাত বিষয় আগে না লিখিলে, অর্থের হানি হয়। দ্বিতীয় অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ এই যে 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব'—এই প্রয়োগে 'দ্বিতীয়ত্ব'—বিধেয় অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত বিষয়, তাহা অগ্রে লিখিয়া সমাস করায় অর্থ গৌণ হইয়া নষ্ট হইল অর্থাৎ লক্ষ্মীর সমতা-প্রকাশই অর্থের তাৎপর্য্য ছিল; তাহা সমাস-দোষে বিনষ্ট হইয়া গেল। তৃতীয় দোষটি বিরুদ্ধমতিকৃত, তাহা 'ভবানী-ভর্ত্তুঃ' এই শব্দে দৃষ্ট হইবে; এইরূপ প্রয়োগে 'ভবানী' শব্দে মহাদেবের পত্নীকে বুঝায়, 'ভবানীভর্ত্তা' শব্দে ভবানীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা,—এইরূপ দ্বিতীয় মতি উদিত হয়।

দিগ্বিজয়ীর সমস্ত প্রতিভা তখন ম্লান হইয়া পড়িল। নিমাইর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে নিমাই তাহাতে বাধা দিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পুনরায় পরদিন আসিতে বলিলেন।

দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ষড়্‌দর্শনের অসামান্য পণ্ডিতকেও তিনি পরাজিত করিয়াছেন; কিন্তু আজ দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ শেষকালে শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইল! ইহার রহস্য কি? হয় ত' বা সরস্বতীদেবীর চরণেই তাঁহার কোনপ্রকার অপরাধ ঘটিয়া থাকিবে—এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—সরস্বতীদেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন,—"নিমাই ঠাকুর পৃথিবীর পণ্ডিত নহেন, ইনি সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; আমি তাঁহারই স্বরূপশক্তি পরা বিদ্যার ছায়াশক্তি।

এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে কাব্য বিরুদ্ধমতি-কৃত দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ দোষ এই যে, 'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য শেষ হইল, সেস্থলে 'অদ্ভুতগুণ' বিশেষণ দেওয়া পুনরুক্তি-দোষ হইল। পঞ্চম দোষ—'ভগ্নক্রম'; ১ম, ৩য় ও ৪র্থ এই তিন পাদে 'ত'কার, 'র'কার ও 'ভ' কারের অনুপ্রাস আছে, ২য় পাদে অনুপ্রাস নাই, ইহাই 'ভগ্নক্রম' দোষ। পঞ্চালঙ্কার-গুণ-সত্ত্বেও এই পাঁচ দোষে শ্লোকটী ছারখার হইল। দশালঙ্কারযুক্ত শ্লোকে যদি একটী দোষও থাকে, তাহা হইলে শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত, ভূষণভূষিত সুন্দর শরীরের ন্যায় তাহা বিগীত অর্থাৎ নিন্দিত হয়। (চৈঃ চঃ আঃ ১৬।৪১ অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

এতদিনে তোমার মন্ত্রজপের ফল লাভ হইয়াছে, তুমি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শন পাইয়াছ, তুমি শীঘ্রই নিমাইর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণ কর।”

দিগ্বিজয়ী নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই নিমাইর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও সরস্বতীদেবীর উপদেশ জানাইলেন। নিমাই দিগ্বিজয়ীকে বেদের কথিত পরা বিদ্যার কথা জানাইলেন,—**ভক্তিই পরা বিদ্যা**, ভক্তিলাভই বিদ্যার অবধি। পরা বিদ্যা লাভ করিলে জীব তৃণাদপি সুনীচ হন। পরবিদ্যাবধূর জীবনই শ্রীহরিনাম। রাজার রাজ্যসুখ, যোগীর যোগসুখ, জ্ঞানীর ব্রহ্মসুখ বা মুক্তিসুখ—সকলই পরা বিদ্যার নিকট অতি তুচ্ছ।

নিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে জয় করিলে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ নিমাইকে **‘বাদিসিংহ’**-পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। দেশ-বিদেশে নিমাইর কীর্ত্তি বিঘোষিত হইল।

এই দিগ্বিজয়ীকে কেহ কেহ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গুল্য ভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট, আবার কেহ বা ইহাকে কেশবকাশ্মীরী বলিয়া থাকেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রধান গাদি সলিমাবাদে ঐ সম্প্রদায়ের শিষ্য-পরম্পরার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—গোপীনাথ ভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট, কেশবভট্টের শিষ্য গাঙ্গুল্যভট্ট ও গাঙ্গুল্যভট্টের শিষ্য কেশবকাশ্মীরী। ‘শ্রীভক্তিরত্নাকরে’ গাঙ্গুল্য-ভট্টের স্থানে গোকুলভট্ট-নাম দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ‘শ্রীহরিভক্তি-

বিলাস' ও উহার দিগ্‌দর্শিনী টীকায় 'ক্রমদীপিকা'র লেখক কেশবভট্টের নাম করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে এই কেশবভট্টকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে,—অনেকে এইরূপ বিচার করেন। পূর্ব্বে ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুরই নিকট উপদেশ ও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।*

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববঙ্গ-বিজয় ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান

নিমাই তাঁহার গার্হস্থ্য-লীলায় জীবজগৎকে আদর্শ গৃহস্থধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহদেবতা শ্রীবিষ্ণুর বিধিমত পূজানুষ্ঠান করিবেন। তিনি ভগবানের প্রসাদ, বস্ত্র প্রভৃতি অতিথি, বৈষ্ণব-অভ্যাগত ও সন্ন্যাসিগণকে বিতরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ অযাচিত প্রতিগ্রহধর্ম্ম স্বীকার করিলেও সমস্ত ভোজ্য-সামগ্রী, অর্থ, বস্ত্র মুক্তহস্তে দীন-দুঃখীকে দান করিবেন। অতিথি-সম্মান, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সম্মান গৃহস্থের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য; গৃহস্থ নিজ-পত্নীকে কখনও নিজের ভোগ-সুখে নিযুক্ত

* বিশেষ জানিতে হইলে 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা (১৩৩৪ সন) ৩-৫ পৃষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্যভাগবত 'গৌড়ীয় ভাষ্য' আঃ ১৩।১৯ সংখ্যা আলোচ্য।

না করিয়া অতিথিগণের ও ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষার উপযোগী বিষ্ণুনৈবেদ্য-রন্ধনে ও বিষ্ণুসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। গৃহস্থ যদি একান্ত দরিদ্রও হন, তথাপি তৃণ, জল, আসন অথবা মধুর বাক্যের দ্বারা অতিথি-পূজা করিবেন। অতিথি-সেবা গৃহস্থ-মাত্রেরই পরম ধর্ম্ম।

প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥

*　　*　　*

তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বইসে॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হৈতে 'অধম' বলি তারে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪শ অঃ

স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি ভিক্ষুকের বেশে শ্রীমায়াপুরে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিতেন।

আদর্শ কুলবধূ শ্রীলক্ষ্মীদেবী অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই বিষ্ণু-গৃহের যাবতীয় কার্য্য, ঠাকুর-পূজার সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ও তুলসীর সেবা করিতেন। তুলসীর সেবা অপেক্ষা শ্বশ্রূমাতা শচীদেবীর সেবায় লক্ষ্মীদেবীর সর্ব্বদাই অধিক মনোযোগ ছিল।

কিছুকাল পরে নিমাই পণ্ডিত অর্থ-সংগ্রহের ব্যপদেশে ছাত্রগণের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া পদ্মানদীর তীরে অবস্থান করিলেন। নিমাইর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে অসংখ্য ছাত্র নিমাইর নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পূর্ব্বদেশে শুভ-বিজয় হইয়াছিল বলিয়াই আজও পূর্ব্ববঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তনে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তবে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পাষণ্ডি-প্রকৃতির ব্যক্তি উদরভরণের সুবিধার জন্য আপনাদিগকে অবতার বলিয়া প্রচার-পূর্ব্বক দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত কলিকালে আর কোন ভগবদবতার নাই। রাঢ়দেশেও কতকগুলি লোক আপনাকে 'অবতার' বলিয়া জাহির করিয়াছে।*

নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীগৌর-নারায়ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া পতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে অন্তর্হিত হন।

* চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮২-৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিমাই পণ্ডিতের পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান-কালে তথায় তপনমিশ্র নামে এক মহাসৌভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণ নানা লোকের নিকট ধর্ম্মের নানাপ্রকার উপদেশ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু জীবের পক্ষে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা পরম-মঙ্গলজনক সাধন ও প্রয়োজন, তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া একদিন রাত্রিশেষে এক স্বপ্ন দর্শন করেন। তাহাতে তিনি নিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। তপনমিশ্র নিমাই পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে নিমাই বলিলেন,—"তুমি অনুক্ষণ,—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

—এই ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক-মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর। ইহাই সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রের একমাত্র সাধন ও প্রয়োজন। শয়ন, ভোজন, জাগরণ ও ভ্রমণাদি—সকল সময়েই এই নাম গ্রহণ করিবে। কপটতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঐকান্তিক হইয়া আর্ত্তির সহিত এই নামের ভজন করিবে।"

তপনমিশ্র নিমাই পণ্ডিতের অনুগমন করিবার অনুমতি চাহিলেন। তাহাতে তিনি মিশ্রকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র কাশী যাও, কাশীতে তোমার সহিত আমার পুনরায় মিলন হইবে।"

নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক জননীর নিকট সমস্ত অর্থ সমর্পণ করিলেন। অনেক পাঠার্থী তাঁহার সহিত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আসিলেন।

গৃহে আসিয়া পণ্ডিত গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানের কথা শ্রবণ করিয়া মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

—"মাতা, দুঃখ ভাব কি কারণে ?
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে ?
এইমত কাল-গতি, কেহ কারো নহে।
অতএব, 'সংসার অনিত্য,' বেদে কহে ॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল-সংসার।
সংযোগ-বিয়োগ কে করিতে পারে আর ?
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায় ?
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তাঁ'র বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী ?"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৮৩-১৮৭

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সদাচার-শিক্ষাদান

নিমাই পণ্ডিত যখন মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন, তখন যদি কোন ছাত্র কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র* তিলক না দিয়া পড়িতে আসিতেন, পণ্ডিত তাঁহাকে এইরূপ লজ্জা দিতেন যে, ঐ ছাত্র দ্বিতীয়বার আর তিলক না দিয়া পড়িতে

* বৈষ্ণবের কপালে যে ঊর্দ্ধতিলক, উহার অপর নাম—শ্রীহরিমন্দির।

আসিতে পারিতেন না। নিমাই পণ্ডিত বলিতেন,—"যে ব্রাহ্মণের কপালে তিলক নাই, বেদ সেই কপালকে শ্মশান-তুল্য বলিয়াছেন।" এই বলিয়া পণ্ডিত ঐ ছাত্রকে পুনরায় সর্ব্বাঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য গৃহে পাঠাইয়া দিতেন।

আমরা ত' স্বাদেশিকতার কত বড়াই করি; কিন্তু এই বঙ্গ-দেশেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণের যে বেদ-সম্মত সদাচার অবশ্য-পালনীয় ছিল, তাহাও এখন আমাদের নিকট লজ্জার বিষয় হইয়াছে! শিখা, তিলক, কণ্ঠে তুলসীমালিকা-ধারণ আধুনিক সভ্যসমাজে যেন অসভ্যতার লক্ষণ ও উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—না হয়, উহা সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে! ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়া বেদবিরোধী স্বেচ্ছাচারিতা বরণ করাই কি উদারতা ও সার্ব্বজনীনতার আদর্শ? অথবা সকলই কালের প্রভাব!

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ বাড়ী হইতে পুনরায় তিলক ধারণ করিয়া আসিলে তবে পণ্ডিতের নিকট পুনরায় পড়িবার অধিকার পাইতেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত সকলের সহিতই নানারূপ হাস্য-পরিহাস করিতেন,—বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসিগণের শব্দের উচ্চারণ লইয়া বেশ একটুকু রঙ্গরস করিতেন। কেবল পরস্ত্রীর সঙ্গে নিমাই কোন-প্রকার হাস্য-পরিহাস করিতেন না, তিনি পরস্ত্রীকে দৃষ্টিকোণেও দেখিতেন না। তিনি যে কেবল সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিবার পরই পরস্ত্রী সম্ভাষণে সাবধান ছিলেন, তাহা নহে; গার্হস্থ্যলীলা-কালেও

তিনি স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তিনি স্বীয় আচরণের দ্বারা এই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। এক শ্রেণীর লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলা-কালে তাঁহাকে নদীয়ার নাগরীগণের নাগর কল্পনা করিতে চাহেন; ইহা কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ। তাই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

এই মতে চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥
'স্ত্রী'-হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণও না করিলা,—বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২৮-৩০

বিংশ পরিচ্ছেদ

নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ

নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করেন, আবার অপরাহ্ণ হইতে অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত পাঠ আলোচনা করিয়া থাকেন। ছাত্রগণ একবৎসর কাল নিমাইর নিকট অধ্যয়ন করিয়াই সিদ্ধান্তে পণ্ডিত হন।

এদিকে শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীসনাতনমিশ্র-নামক এক পরম বিষ্ণুভক্ত, পরোপকারী, অতিথিসেবা-পরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল, তাঁহার পদবী ছিল—'রাজপণ্ডিত'। কাশীনাথ পণ্ডিতকে ঘটক করিয়া শচীমাতা সনাতনমিশ্রের পরমা ভক্তিমতী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করাইলেন। বুদ্ধিমন্ত খান্ নামে এক ধনাঢ্য সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পণ্ডিতের এই বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিলেন। শুভলগ্নে, শুভদিনে মহা-সমারোহের সহিত অধিবাস-উৎসব সম্পন্ন হইল। নিমাই পণ্ডিত সুসজ্জিত একটি দোলায় চড়িয়া গোধূলি-লগ্নে রাজ-পণ্ডিতের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই বিবাহের শোভাযাত্রা অতুলনীয় হইয়াছিল। পরম সমারোহের সহিত শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামনা করিয়া শ্রীসনাতনমিশ্র শ্রীনিমাই পণ্ডিতের হস্তে দুহিতাকে অর্পণ ও জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত দোলায় আরোহণ করিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত পুষ্পবৃষ্টি ও গীত-বাদ্য-নৃত্যাদির সহিত নিজ-গৃহে শুভবিজয় করিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগয়া-যাত্রা

একদিকে শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে অধ্যাপকের লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, অপর দিকে নবদ্বীপে ভক্তিবিরোধী নানা-প্রকার মতবাদ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কতকগুলি লোক শ্রীভগবানের সেবার কথা কাণে শুনিতেই পারিত না। তাহারা অযথা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিত। *

আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পাদনের ছলে বহু শিষ্য-সঙ্গে শ্রীগয়া-যাত্রার অভিনয় করিলেন। পণ্ডিতের এই গয়া-যাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিল না।

পথে যাইতে যাইতে নিমাই নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর কৌতুক ও স্বচ্ছন্দবিহার দেখিয়া সঙ্গের লোকদিগকে জানাইলেন,—

লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত সর্ব্বজন॥

* চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।
'ভক্তিযোগ'-নাম হইল শুনিতে দুষ্কর॥
নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে দুষ্টগণে।
নিন্দা করি' বুলে—তাহা শুনেন আপনে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫, ৮

সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্।
যে বুদ্ধি পশুতে, সে মানুষে বিদ্যমান ॥
কৃষ্ণজ্ঞান নাঞি মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ—পশু বলি তা'রে।
—চৈঃ মঃ আঃ কৈঃ লীঃ—গয়াযাত্রা ২৫-২৭

নিমাই চলিতে চলিতে 'চির' নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাহ্নিক করিয়া মন্দার-পর্ব্বতে আসিলেন।

যেমন, মথুরায়—কেশব; নীলাচলে—পুরুষোত্তম; প্রয়াগে—বিন্দুমাধব; কেরলদেশ, দাক্ষিণাত্য ও আনন্দারণ্যে—বাসুদেব, পদ্মনাভ ও জনার্দ্দন; বিষ্ণুকাঞ্চীতে—বরদরাজ-বিষ্ণু; শ্রীমায়াপুরে (হরিদ্বার ও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে)—হরি; তেমনি মন্দারে মধুসূদন। পণ্ডিত নিমাই এই স্থানে ১৪২৭ শকাব্দায় বা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে আগমন করিয়াছিলেন। তখন পর্ব্বতের নিম্নে শ্রীমধুসূদন-শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত এই পুণ্যতম স্থানের স্মৃতি-পূজার জন্য তথায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ গোলোকগত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইংরাজী ১৯২৯ সালের ১৫ই অক্টোবর শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্ক স্থাপন করিয়া ইহার উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

নিমাই পণ্ডিত গয়াভিমুখে আসিবার কালে লোকানুকরণে দেহে জ্বর প্রকাশ করিয়া এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পাদোদক-পানে স্বীয় জ্বর-মুক্তির অভিনয় করিলেন। নিমাইর এই লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ লোক ধরিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের পাদোদকের

শ্রীগৌরপদাঙ্কিত শ্রীমন্দারপর্ব্বত ও উপত্যকা ; পর্ব্বতপাদপ্রদেশে দক্ষিণে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরপাদপদ্মের শ্রীমন্দির, তৎপার্শ্বে শ্রীমধুসূদনদেবের পুরাতন শ্রীমন্দির ও ভগ্নাবশেষ।

শ্রীমন্দারে শ্রীমধুসূদনদেবের বর্ত্তমান শ্রীমন্দির
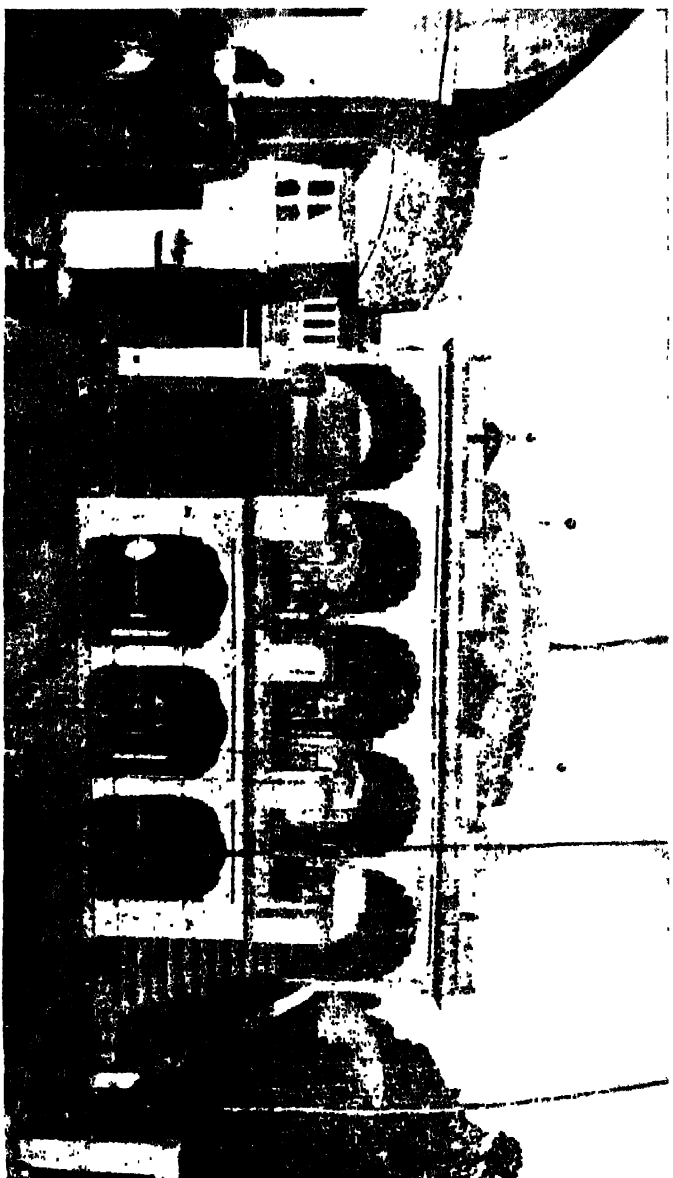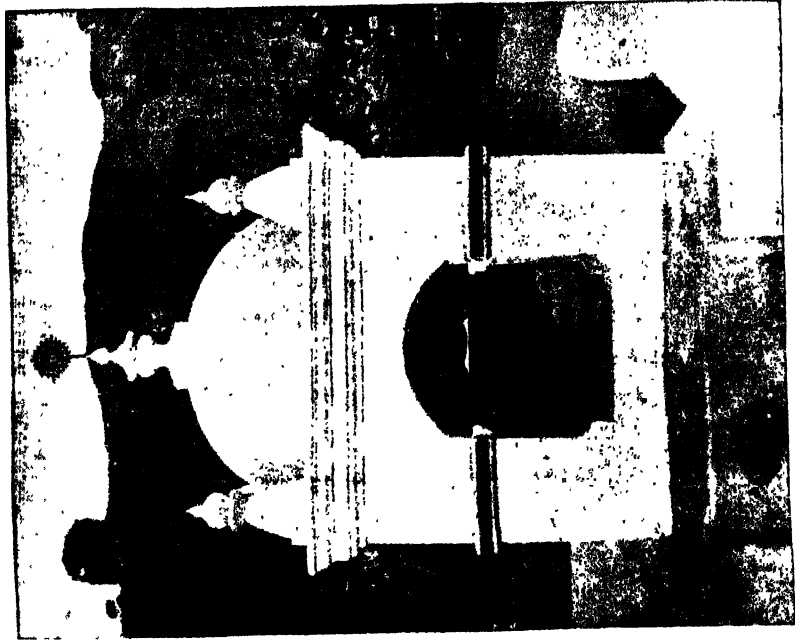
মধুসূদনদেব ; পাশে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বা
প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য পদ-চিহ্নের শ্রীমন্দির

দ্বারা জীবের ত্রিতাপজ্বালা নষ্ট হয় এবং বৈষ্ণবের পাদোদকের দ্বারা জীবের কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়,—এই শিক্ষা-প্রদানই ছিল মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য; আবার সাধারণ লোক যাহাতে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে না পারে—ইহাও ছিল তাঁহার অপর এক উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি প্রচ্ছন্ন অবতারী। ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া তৎপ্রসঙ্গে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—

কৃষ্ণ না ভজিলে 'দ্বিজ' নহে কদাচিৎ।
পুরাণ-প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত ॥
চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥*

—চৈঃ মঃ আঃ কৈঃ লীঃ গয়াযাত্রা ৫১-৫২

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও মহাপ্রভুর এই বিপ্র-পাদোদক-পানের রহস্য এইরূপ বলিয়াছেন,—

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহান অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর ॥
অতএব নাম তা'ন সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭৷২৫-২৬

* বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ-মুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

নিমাই শিষ্যগণ-সহ ক্রমশঃ পুন্‌পুন্‌ তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে পুন্‌পুনা নদী প্রবাহিতা। ইহা পাটনার ঠিক পরবর্ত্তী পুন্‌পুন্‌ ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত।

পুন্‌পুন্‌ তীর্থে আসিয়া নিমাই পিতৃদেব-পূজা করিলেন ও তৎপরে গয়ায় আসিলেন। গয়ায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও পিতৃপূজা করিয়া চক্রবেড়তীর্থে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। এখানে ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রীগদাধরের শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নিমাই প্রেমের সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশ করিলেন। এতদিনে মহাপ্রভু জগতের নিকট **আত্ম-প্রকাশ** করিলেন। লোকে এতদিন নিমাইকে পণ্ডিতমাত্র বলিয়াই জানিত, তাঁহার 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসার ভয়ে দূরে দূরে পলাইয়া থাকিত; এতাবৎকাল তিনি জগতে প্রেমভক্তি প্রদানের লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু গয়ায় আসিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমভক্তির উৎস উদ্‌ঘাটনের প্রথম সূচনা করিলেন। বেগবতী গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় নিমাইর নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুগঙ্গা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে সেই স্থানে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হওয়ায় উভয়ের দর্শনে উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। মহাপ্রভু তাঁহার গয়া-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া কহিলেন,—

প্রভু বলে,—গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ—যারে পিণ্ড দেয়, তরে সেই জন॥

তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান ॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি,—এই চাহি দান ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭অঃ ৫০-৫৫

নিমাই পণ্ডিত জানাইলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থফল—'সাধুসঙ্গ'। যতক্ষণ মানবের ভাগ্যে সদ্‌গুরুর দর্শন না হয়, যতদিন-না জীব সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানের সেবা-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারে, ততদিনই তাহাদের গয়াশ্রাদ্ধ, তীর্থস্নান, লৌকিক-পূজা-পার্ব্বণ, দান-ধ্যানাদিতে অধিকার—ততদিনই ঐ কার্য্যের জন্য রুচি ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। গয়ায় পিণ্ড-দান করিলে যাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা হয়, কেবল তাঁহারই উদ্ধার লাভ হয়; কিন্তু বৈষ্ণব, গুরু ও সাধু-দর্শন-মাত্রই কোটি কোটি পিতৃপুরুষ উদ্ধার লাভ করেন। অতএব বৈষ্ণব ও সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের সহিত তীর্থ সমান নহে। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম এত বলবান্ যে, তাঁহা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রেমামৃত-রস পান করাইতে পারেন।

যে-কাল-পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেব জগতে আবির্ভূত হইয়া সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করেন নাই, সে-কাল-পর্য্যন্তই সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণাদিতে স্নান-দানাদি পুণ্যকর্ম্মকে লোকে

বহুমানন করিতেন। যে-কাল-পর্য্যন্ত শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরপুরীর ন্যায় কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার লীলা প্রদর্শন না করিয়াছিলেন, সে-কাল-পর্য্যন্তই তিনি গয়া-শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা লোককে জানাইয়াছিলেন। যাঁহারা সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের আর পৃথগ্‌ভাবে গয়া-শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড-প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না,—ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।*

শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন ও স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। এমন সময় কৃষ্ণ-প্রেমাবিষ্ট ঈশ্বরপুরীও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন, সমস্তই ঈশ্বরপুরীপাদকে ভিক্ষা করাইবার জন্য তাহা স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার পর শিষ্যের স্বহস্তে গুরুকে নৈবেদ্য নিবেদনের বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শিষ্য সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার অবশেষ গ্রহণ করিবেন ও নিজ-ভোগ-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবের সেবা করিবেন,—নিমাই এই শিক্ষা দিলেন।‡

---

* এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাসের উপসংহারধৃত বিষ্ণুরহস্য-বাক্য)

‡ তবে প্রভু আগে তানে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া॥
তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব-অঙ্গে।
আপনে শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্যগন্ধে॥ —চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৯৪,৯৬।

একদিন একান্তে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর নিকট অত্যন্ত দীনতার সহিত মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করায় ঈশ্বরপুরী সানন্দে নিমাই পণ্ডিতকে দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীকে পরিক্রম করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ ও কৃষ্ণ-প্রেম-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। সর্ব্বজগতের গুরু লোক-শিক্ষার জন্য গুরু-পদাশ্রয়ের লীলা প্রকাশ করিলেন। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া আত্মসমর্পণ না করিলে কেহই কোন দিন পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই সর্ব্বজগদ্গুরুর গুরু শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের গুরু-গ্রহণের অভিনয়।

নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর সহিত কিছুকাল গয়ায় অবস্থান করিলেন। অবশেষে আত্মপ্রকাশের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনে-দিনে তাঁহার প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিবার কালে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া 'কৃষ্ণ রে! বাপ্‌রে! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব হরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করিয়া কোথায় লুকাইলে?"—এইরূপে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরম গম্ভীর নিমাই পণ্ডিত পরম বিহ্বল হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন! সঙ্গের ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য কতই-না চেষ্টা করিলেন, কিন্তু—

প্রভু বলে,—তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে॥

মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১২৩,১২৪

ছাত্রগণ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত পণ্ডিতকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহিণী গোপীর ভাবে মগ্ন নিমাই কোন কথায়ই সোয়াস্তি পাইলেন না। অবশেষে একদিন রাত্রিশেষে গভীর কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া মথুরার দিকে ধাইয়া চলিলেন, উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! তোমাকে কোথায় পাইব ?"—এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে ছুটিলেন। কিয়দ্দূর যাইতেই এক আকাশবাণী হইল,—

* * *

এখনে মথুরা না যাইবা, দ্বিজমণি!
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক-নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন॥
সেবক আমরা, তবু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাঙ চরণে তোমার॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১২৯ ১৩২,১৩৫

আকাশবাণী জানাইয়া দিল—নিমাইর এখনও গৃহত্যাগের কাল উপস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি কিছুকাল তাঁহার জন্মভূমি

নবদ্বীপ-মণ্ডলেই প্রেমভক্তি বিতরণ করা আবশ্যক। আকাশবাণী শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত নিবৃত্ত হইলেন ও বাসস্থানে ফিরিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক ছাত্রগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।
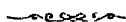
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে অধ্যাপনা

গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত সকলের নিকট গয়ার বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। নির্জ্জনে কএকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট গয়ার বিষ্ণুপাদ-তীর্থের কথা উচ্চারণ করিতেই নিমাইর দেহে অপূর্ব্ব প্রেমের বিকার প্রকাশিত হইল। ভক্তগণ নিমাইর সেই প্রেম-বিকার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নিমাইর ইচ্ছানুসারে তৎপর দিবস শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীসদাশিব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিত ইঁহাদের নিকট ভগবদ্-বিরহে উদ্দীপ্ত হইয়া "কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! তুমি দেখা দিয়া কোথা লুকা'লে"—এইরূপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। ভক্তগণও তখন প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল

পরে বিশ্বম্ভর বাহ্যদশা প্রকাশ করিয়া আবার উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—

"কৃষ্ণ রে, প্রভু রে মোর, কোন্‌দিকে গেলা ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভূমিতে পতিত হইলেন, ভক্তগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উচ্চকীর্ত্তনরোল ও প্রেমক্রন্দনে শ্রীশুক্লাম্বরের গৃহ মুখরিত হইল।

শ্রীশচীমাতা পুত্রের এই ভাব দেখিয়া বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ অন্তরে আশঙ্কিত হইলেন ও পুত্রের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। সময় সময় শ্রীশচীমাতা পুত্র-বধূকে আনিয়া পুত্রের নিকট বসাইতেন, কিন্তু কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তপ্রায় শ্রীনিমাই সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না।* কেবল সর্ব্বক্ষণ 'কোথা কৃষ্ণ', 'কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন ও হুঙ্কার করিতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভয়ে পলাইয়া যাইতেন, শ্রীশচীদেবীও ভয় পাইতেন। কৃষ্ণ-বিরহ-বিধুর নিমাইর রাত্রিতে নিদ্রা ছিল না ; কখনও উঠিতেন, কখনও বসিতেন, কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেন। কিন্তু বাহিরের লোক দেখিলে তিনি তাঁহার অন্তরের ভাব গোপন করিতেন।

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীনিমাই পণ্ডিত গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বের ছাত্রগণ পাঠ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ছাত্রগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে শ্রীনিমাই পণ্ডিত পড়াইতে বসিলেন, ছাত্রগণ 'হরি'

---

* লক্ষীরে আনিঞা পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥ —চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৩৭

বলিয়া পুঁথি খুলিলেন। ইহাতে পণ্ডিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ; হরিনাম শুনিয়াই তাঁহার 'বাহ্য লোপ' পাইল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত আবিষ্ট হইয়া সূত্র, বৃত্তি, টীকায় কেবল হরিনাম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কোথায়ও কিছু নাই—

প্রভু বলে,—সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন ॥
হর্ত্তা, কর্ত্তা, পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তা'র অসত্য-বচনে ॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন' ॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায় ॥

*　　　*　　　*

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে ॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥
পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ

শ্রীনিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ আমি কিরূপ সূত্র-ব্যাখ্যা করিলাম ?" ছাত্রগণ বলিলেন,—"আপনার

ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনি কেবল প্রত্যেক শব্দকেই 'কৃষ্ণ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি ?" পণ্ডিত বলিলেন,—"আজ পুঁথি বাঁধিয়া রাখ, চল গঙ্গাস্নানে যাই।" গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, শ্রীতুলসীকে জল দিলেন, যথাবিধি শ্রীগোবিন্দপূজা করিলেন, তুলসীমঞ্জরীদ্বারা কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ সেবন করিলেন।

শ্রীশচীমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নিমাই ! তুমি আজ কি পুঁথি পড়িলে ?" নিমাই তদুত্তরে বলিলেন,—

* *—"আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণচরণ-কমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে জন ॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ

ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব যেরূপ মাতা দেবহূতিকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিমাই পণ্ডিতও স্বীয় জননীকে ভাগবত-ধর্ম্মের কথা উপদেশ করিলেন, জীবের জন্ম-মরণ-মালা ও গর্ভবাস-দুঃখের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর মঙ্গলের উপায় নাই,—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী-পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ

শ্রীনিমাই পণ্ডিত আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে অহর্নিশ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন কথা শুনেন না ও বলেন না। ছাত্রগণ প্রত্যূষে তাঁহার নিকট পড়িবার জন্য আসেন, কিন্তু পড়াইতে বসিয়া পণ্ডিতের মুখে কৃষ্ণ-শব্দ-ব্যতীত আর কিছুই আসে না,—

"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ"* —বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে,—"সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥"
শিষ্য বলে,—"বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?"
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে ॥"†
শিষ্য বলে,—"পণ্ডিত, উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বলে,—"সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সোঙর ॥"
কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়।
আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায় ॥"‡

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম অঃ

* কলাপ বা কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র—"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠক্রম স্থির প্রসিদ্ধ। প্রভুর ছাত্রগণ কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ রীতি ত' সুপ্রসিদ্ধ ? তদুত্তরে প্রভু বলিলেন যে, সকল বর্ণ নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত চিন্ময়ী শব্দমূর্ত্তি বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে শ্রীনারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন।—গৌঃ ভাঃ

† ছাত্রগণের বর্ণসিদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন যে, বাচ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণ-হেতু অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য-মুক্ত-বাচক ব্যঞ্জক বা সূচক অথবা দ্যোতক হওয়ায় প্রত্যেক বর্ণই নিত্যসিদ্ধ।— ঐ

‡ সম্যক্ আম্নায়,—"আমনন্তি উপদিশন্তি বিপ্রা পরমং পদম্; আম্নায়তে সমভ্যস্যতে মুনিভিরসৌ, আম্নায়তে উপদিশ্যতে পরমার্থোঽনেনেতি আম্নায়ঃ 'বেদঃ' সমাম্নায়ঃ"। ভাঃ ১০।৪৭।৩৩ শ্লোকে 'সমাম্নায়'-শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃতা টীকায়—"সমাম্নায়ো বেদঃ"।—গৌঃ ভাঃ

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রগণ হাসিতে লাগিলেন ; কেহ বা বলিলেন,—"বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ পণ্ডিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।" একদিন ছাত্রগণ নিমাইর অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গিয়া নিমাই পণ্ডিতের ঐরূপ বিকৃত-ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। উপাধ্যায় গঙ্গাদাস বৈকালে নিমাইকে ছাত্রগণের দ্বারা ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—"নিমাই, তুমি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর ন্যায় পণ্ডিতের দৌহিত্র, মিশ্র পুরন্দরের ন্যায় পিতার পুত্র, তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েই পাণ্ডিত্য-গৌরবে বিভূষিত। শুনিতে পাইতেছি,—তুমি আজকাল লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছ, ভালমত অধ্যাপনা করিতেছ না! অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিলেই কি ভক্তি হয়? তোমার বাপ ও মাতামহ কি ভক্ত নহেন? আমার মাথা খাও, তুমি পাগ্‌লামি ছাড়িয়া এখন হইতে ভাল করিয়া শাস্ত্র পড়াও।"

শ্রীনিমাই শ্রীগঙ্গাদাসকে বলিলেন,—"আপনার শ্রীচরণের কৃপায় নবদ্বীপে এমন কেহ নাই—যিনি আমার সহিত তর্কে জয়ী হইতে পারেন! আমি যাহা খণ্ডন করি, দেখি ত' নবদ্বীপে এমন কে আছেন—যিনি তাহা স্থাপন করিতে পারেন! আমি নগরের মধ্যে বসিয়া সকলের সম্মুখে অধ্যাপনা করিব, দেখি, কাহার শক্তি আছে—আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে!"

গঙ্গাতীরে জনৈক পৌরবাসীর গৃহে বসিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত এইরূপ নিজের ব্যাখ্যার গৌরব ও আত্মশ্লাঘা করিতেন। একদিন ভাগবত-পাঠক শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে

যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের কৃষ্ণের রূপ-দর্শনের শ্লোকটী পড়িতে-ছিলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কর্ণে সেই শ্লোক প্রবিষ্ট হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন, পরে বাহ্যদশা লাভ করিয়া পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাতীরে গেলেন। পরদিন ভোরে নিমাই পণ্ডিত আবার ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধাতু কাহাকে বলে?" পণ্ডিত বলিলেন,—"কৃষ্ণের শক্তিই ধাতু, দেখি কাহার শক্তি আছে আমার এই ধাতুর অর্থ খণ্ডন করিতে পারে?" ইহা বলিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। দশদিন ধরিয়া এইরূপে ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রকে কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা করিয়া শেষে ছাত্রদিগকে চিরবিদায় দিয়া বলিলেন,—"তোমরা আমার নিকট আর পড়িতে আসিও না, আমার কৃষ্ণছাড়া অন্য কোন কথা স্ফূর্ত্তি হয় না; তোমাদের যাঁহার নিকট সুবিধা হয়, তাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন কর।" ইহা বলিয়া নিমাই পণ্ডিত অশ্রুপূর্ণ-নয়নে পুঁথিতে 'ডোরি' বন্ধন করিলেন এবং সর্ব্বশেষে কৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে চরম উপদেশ দান করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রকে যেরূপ কৃষ্ণনাম-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, লোকে যাহাতে সেইরূপ আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতেও কৃষ্ণনামের অনুশীলন করিতে পারে, তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু **"শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ"** রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্র হরিনামপর করিয়া গ্রথিত হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব-সেবা-শিক্ষাদান

শ্রীনিমাই পণ্ডিত জড়বিদ্যার অনুশীলন—জড়বিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার লীলা পরিত্যাগ করিয়া পরা বিদ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। ভগবদ্ভক্তের সেবা-ব্যতীত কাহারও ভক্তিবিদ্যা লাভ হয় না,---ইহা জানাইবার জন্য তিনি ভগবান্ হইয়াও ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভক্তের সেবা করিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণব-গণকে দেখিলেই নিমাই পণ্ডিত তাঁহাদিগকে নমস্কার ও তাঁহাদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। যখন বৈষ্ণবগণ গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর অতি যত্নে কাহারও কাপড়ের জল নিংড়াইয়া দিতেন, কাহারও হাতে ধুতিবস্ত্র তুলিয়া দিতেন, কাহাকেও বা গঙ্গামৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন, আবার কাহারও বা ফুলের সাজি বহন করিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিতেন।*

ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের বৈষ্ণব-ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট বহুদিনের সঞ্চিত মনের ব্যথা খুলিয়া বলিতেন,—

এই নবদ্বীপে, বাপ! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় 'বক'!

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৬৬

---

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৪৪-৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

কখনও কখনও শ্রীগৌরসুন্দর অভক্ত-সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া—

'সংহারিমু' সব বলি' করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলে বারে-বার॥
—চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৮৬

শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের এই সকল ভাব দেখিয়া তাঁহার বায়ুব্যাধি হইয়াছে মনে করিতে লাগিলেন। তখন নানালোকে নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থাও দিতে লাগিলেন। পুত্র-বৎসলা সরলা শ্রীশচীমাতা শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গৌরসুন্দরের দেহে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীবাসের কথায় শ্রীশচীমাতা আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুত্র পাছে কৃষ্ণভক্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করে,—এই চিন্তাই অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসমুগ্ধা শ্রীশচীমাতার হৃদয় অধিকার করিল।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিতে গেলেন; দেখিলেন—আচার্য্য দুই বাহু তুলিয়া হুঙ্কার করিয়া গঙ্গাজল-তুলসীর দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রচ্ছন্নাবতারী গৌরসুন্দরকে এবার চিনিতে পারিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য পূজার উপকরণ লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ পূজা করিতে করিতে "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"—শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন।

গদাধর অদ্বৈতাচার্য্যকে এইরূপ করিতে দেখিয়া জিহ্বা কামড়াইয়া আচার্য্যকে বালক গৌরসুন্দরের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন। আচার্য্য বলিলেন,—"গদাধর, তুমি কএক দিন পরেই এই বালককে জানিতে পারিবে—ইনি কে?" শ্রীগৌরসুন্দর আত্মগোপন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের স্তুতি আরম্ভ করিলেন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে

শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমেই তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে শ্রীবরাহ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা ভগবান্‌কে চরমে নিরাকার নির্ব্বিশেষ কল্পনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য * শক্তিকে অস্বীকার করেন, শ্রীগৌরসুন্দর বরাহরূপে তাঁহাদের প্রতি এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,

হস্ত-পদ-মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥

---

* মানবের চিন্তার অতীত।

বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাঁহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা,' বলে বেটা কেমন সাহসে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৩৬-৪০

মহাপ্রভু শ্রীবরাহ-মূর্ত্তিতে বলিতেছেন—"কাশীতে প্রকাশানন্দ নামক একজন সোঽহংবাদী অধ্যাপক বেদের ব্যাখ্যাকালে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ আকারকে নিন্দা করিয়া থাকে। প্রকাশানন্দ ভগবানের নিত্য আকার স্বীকার না করায় ভগবানের চরণে অত্যন্ত অপরাধী। এই অপরাধের ফলস্বরূপ তাহার সর্ব্ব-শরীরে কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল, তথাপি তাহার জ্ঞানের উদয় হয় নাই। আমি আমার ভক্তের চরণে অপরাধকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। যদি আমার পুত্রও আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে সেই প্রিয় পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি; আমি ভক্তের জন্য আমার নিজের পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি। 'নরক' নামে আমার এক মহাবলশালী পুত্র হইয়াছিল। আমি তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলাম। আমার সদুপদেশ লাভ করিয়া তাহার জীবন কিছুদিনের জন্য পবিত্র ছিল, কিন্তু কালক্রমে বাণ রাজার দুষ্ট সংসর্গে উহার ভক্তির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তজ্জন্য

আমি ঐ ভক্তদ্রোহী পুত্রকে কাটিয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলাম। আমার প্রতি অপরাধী ব্যক্তিকে আমি ক্ষমা করি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি অপরাধীকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করি না।”

বেদ জড়ীয় আকার নিষেধ করিবার জন্যই পরব্রহ্মকে নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা জড়ীয় আকার ও জড়ীয় বিশেষ-ধর্ম্ম নিষেধ করিয়া জড়াতীত নিত্য সচ্চিদানন্দ আকারই স্থাপিত হইয়াছে। ভগবান্—সর্ব্বশক্তিমান্। আমরা যাহা আমাদের চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারি না, তাহাও ভগবানে সম্ভব। ভগবানের নিত্য চিদানন্দ আকারও আমাদেরই আকারের ন্যায় অনিত্য আকার হইবে, এইরূপ **অনুমান** করা ভগবানের **সর্ব্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার** করা মাত্র,—ইহাই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার সকল শক্তিই আছে। যাঁহার সকল শক্তি নাই, তিনি পরমেশ্বর নহেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীহরিদাস

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন যশোহর প্রদেশের বুঢ়ন * গ্রামে মুসলমান-কুলে ঠাকুর শ্রীহরিদাস আবির্ভূত হন। হরিদাস বাল্যকাল হইতেই হরিনামে স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। পিতৃ-মাতৃকুলের আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া তিনি যশোহর জেলার বেনাপোলে নির্জ্জন বনে একটি কুটীর বাঁধিয়া প্রত্যহ রাত্রিদিনে তিন লক্ষ হরিনাম-সংকীর্ত্তন ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। হরিদাসের এইরূপ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত লোকই হরিদাসকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। কিন্তু সেই গ্রামের তদানীন্তন জমিদার মৎসর-স্বভাব রামচন্দ্র খাঁ যুবক হরিদাসের বৈরাগ্য নষ্ট করিবার জন্য একটি সুন্দরী বেশ্যাকে হরিদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই কুলটা হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মুহূর্ত্তকালও হরিদাসকে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-ব্যতীত আর

---

* চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত; কিন্তু বর্ত্তমান খুলনা জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় এই বুঢ়ন পরগণায় ৬৫টী মৌজা আছে; কিন্তু বুঢ়নগ্রামটী কোথায় ছিল, তাহা এখনও ঠিক জানা যাইতেছে না।

কোন কার্য্য করিতে না দেখিয়া সেই বেশ্যার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বেশ্যা তখন হরিদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহার পাপময় জীবন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নামাচার্য্য হরিদাস বেশ্যাকে তাহার গৃহের সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সর্ব্বক্ষণ তুলসীর সেবা ও রাত্রিদিনে তিন লক্ষ হরিনাম করিবার উপদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং বেনাপোল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চাঁদপুরে আসিয়া বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। তথা হইতে গমন করিয়া হরিদাস ফুলিয়া* ও শান্তিপুর এই উভয় স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। ফুলিয়া ও শান্তিপুরে তখন ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রবল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীহরিদাসের শ্রীনাম-ভজনের জন্য তাঁহাকে একটি নির্জ্জন স্থানে 'গোফা' (গুহা) প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। আচার্য্য প্রত্যহ হরিদাসকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করাইতেন। এই সময় অদ্বৈতাচার্য্যের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-কাল উপস্থিত হইলে তিনি আচার্য্য হরিদাসকে সেই শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিলেন,—

তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইলা ভোজন॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৩।২২০

এই সময় এক রাত্রিতে স্বয়ং মায়াদেবী হরিদাসকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু হরিদাসের কৃপায় মায়াও কৃষ্ণনাম

* শান্তিপুরের নিকট একটি গণ্ডগ্রাম।

পাইয়া ধন্যা হইলেন। মুসলমানকুলে উদ্ভূত হইয়া হরিদাস হরিনাম করেন, ইহা শুনিতে পাইয়া কাজী নবাবের নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। নবাবের কর্ম্মচারিগণ হরিদাসকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীহরিদাস কারাগারের মধ্যেও অন্যান্য অপরাধী বন্দিগণকে সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। নবাব হরিদাসকে তাঁহার জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

* * *

শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥
নাম- মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৭

শ্রীহরিদাসের এই কথায় কাজী সন্তুষ্ট না হইয়া হরিদাসের দণ্ডবিধান করিতে নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাবের নানা-প্রকার ভয়-প্রদর্শন সত্ত্বেও হরিদাস ঠাকুর ভীত না হইয়া বজ্রগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪

কাজীর আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ শ্রীহরিদাসকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিলেও হরিদাসের অঙ্গে

কোনপ্রকার দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত কিংবা প্রাণবিয়োগ না হওয়ায় উহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। পাছে প্রহারকারিগণের কোনপ্রকার অমঙ্গল হয়, এই ভাবিয়া হরিদাস কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাইলেন,—

এ-সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১৩

হরিদাসকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় কাজীর কর্ম্মচারিগণ কাজীর নিকট কঠোর শাস্তি পাইবে শুনিয়া হরিদাস কৃষ্ণধ্যান-সমাধি-দ্বারা নিজকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলেন। হরিদাসকে কবর দিলে পাছে তাঁহার সদ্গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া হরিদাসের অসদ্গতি-লাভের উদ্দেশ্যে কাজী হরিদাসকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন। হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে তীরের নিকট আসিলেন ও বাহ্যদশা লাভ করিয়া পুনরায় ফুলিয়া-গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে থাকিলেন।

ফুলিয়ায় যে গুহার মধ্যে শ্রীহরিদাস ভজন করিতেন, তথায় একটি ভীষণ বিষধর সর্প বাস করিত। ওঝাগণের অনুরোধে হরিদাস ঐ গুহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে ঐ সর্পটী আপনা হইতেই গুহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কতিপয় ব্যক্তি নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের উচ্চ-সংকীর্ত্তন অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু

ঠাকুর হরিদাস শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, মনে মনে নাম জপ করিলে কেবল নিজের উপকার হয় ; কিন্তু উচ্চকীর্ত্তনের দ্বারা নিজের ও পরের উপকার হইয়া থাকে,—এমন কি, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতারও তাহাতে সুকৃতি সঞ্চিত হয়।

জগতের এইরূপ বহির্ম্মুখ অবস্থা দেখিয়া শ্রীহরিদাস বৈষ্ণব-সঙ্গ করিবার জন্য কিছুকাল পরে শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিলেন। তখন শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোল ও বৈষ্ণব-সভা ছিল। নবদ্বীপে শ্রীহরিদাসকে পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

গয়া হইতে ফিরিবার পর ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরসুন্দর হরি-সংকীর্ত্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে শ্রীবাসের গৃহে যে নিত্য-সংকীর্ত্তনোৎসব আরম্ভ হইল, তাহার প্রধান সহায় হইলেন—ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিত।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলন ও শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার বার বৎসর বয়সে নিজ জন্মলীলা-স্থান একচক্রা-নগরী হইতে এক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সহিত ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান ঘুরিয়া অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। সেই সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেন শ্রীগৌরসুন্দরের মহাপ্রকাশ অপেক্ষা করিয়াই বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বৃন্দাবন হইতে অনতিবিলম্বে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীনন্দনাচার্য্য নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব ছিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের আগমনের পূর্ব্বেই বৈষ্ণবগণের নিকট বলিতেছিলেন যে, দুই তিন দিনের মধ্যেই কোন এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিবেন। তখন বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর কথার রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। যে-দিন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিন মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবের নিকট বলিলেন যে, তিনি গতরাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যেন তালধ্বজরথে চড়িয়া নীলবস্ত্র-পরিহিত এক

মহাপুরুষ তাঁহার গৃহ-দ্বারে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে নবদ্বীপে ঐ মহাপুরুষের সন্ধান করিতে বলিলেন। পণ্ডিত শ্রীবাস ও শ্রীহরিদাস সমস্ত নবদ্বীপে ও পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহের প্রত্যেক ঘরে অনুসন্ধান করিয়াও কোন মহাপুরুষকে কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না। মহাপ্রভুর নিকট তাঁহারা এই কথা জানাইলে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইয়া বরাবর নন্দনাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে দেখাইয়া দিলেন। ইনিই সেই পতিত-পাবন শ্রীনিত্যানন্দ।

মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা প্রকাশ করিলেন। এক পূর্ণিমা-রাত্রিতে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীব্যাসপূজা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সর্ব্বশাস্ত্রকর্ত্তা শ্রীব্যাসের কৃপায়ই আমরা ভগবানের সকল কথা জানিতে পারি, এজন্য সাধুগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সদ্গুরুর পূজাও—'ব্যাসপূজা'। শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই ব্যাসপূজার আয়োজন হইল। শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য্য হইলেন। পূর্ব্বদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণের সহিত অধিবাস-সঙ্কীর্ত্তন করিলেন। তৎপর-দিবস প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানাদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর গলায় ব্যাস-পূজার্থ গৃহীতা মালা পরাইয়া দিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট আত্মপ্রকাশ

শ্রীব্যাসপূজার পর শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামাই পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শান্তিপুরে পাঠাইয়া নিজের প্রকাশ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য যাঁহার জন্য এত আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই প্রভুই গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তৎসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দও নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য রামাই পণ্ডিতকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন ও রামাইর নিকট সকল কথা শুনিয়া পত্নী শ্রীসীতাদেবীর সহিত নানাপ্রকার উপায়ন লইয়া মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আচার্য্য মহাপ্রভুর সহিত রহস্য করিবার জন্য পথে রামাইকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন মহাপ্রভুর নিকট গিয়া বলেন,—আচার্য্য আপনার অনুরোধসত্ত্বেও নবদ্বীপে আসিতে স্বীকৃত হইলেন না। এদিকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গোপনে শ্রীনন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর আচার্য্যের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া ভাবাবেশে বিষ্ণুর সিংহাসনের উপর উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আচার্য্য আসিতেছেন! আচার্য্য আসিতেছেন!

আচার্য্য আমার অন্তর্য্যামিত্ব পরীক্ষা করিতে চাহেন ! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, অদ্বৈতাচার্য্য নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া রহিয়াছেন। রামাই, তুমি এখনই গিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস।" মহাপ্রভুর আদেশানুসারে রামাই অদ্বৈতাচার্য্যকে আনিবার জন্য নন্দনাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া সকল কথা বলিলেন; তখন সহধর্ম্মিণীর সহিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সানন্দে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ ও স্তব পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর মহিমা ও অহৈতুকী দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রক্ষালন করিয়া পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা ও "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" শ্লোক-উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীগৌরনারায়ণকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু নিজের গলার মালা অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন,—"প্রভো! আমি আর কি বর যাচ্ঞা করিব? যে বর চাহিয়াছিলাম, তাহা সকলই পাইয়াছি। তোমার সাক্ষাতে নৃত্য করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। প্রভো! যদি তুমি আমাকে বর দিতেই চাহ, তবে তোমার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করি যে, বিদ্যা, ধন, কুল ও তপস্যার মদে মত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত পৃথিবীর স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল, অধম সকলেই যেন তোমার প্রেমরসে আপ্লুত হইতে পারে।"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের এই প্রার্থনার প্রভাবেই পৃথিবীর আপামর জীব শ্রীগৌরসুন্দরের অপার্থিব প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন হঠাৎ 'পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে মনে করিলেন,—কৃষ্ণের এক নাম 'পুণ্ডরীক'; বোধ হয়, মহাপ্রভু কৃষ্ণকে ডাকিতেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু সকলের নিকট বলিলেন,—"পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামক এক অদ্ভুত-চরিত্র ভক্ত শীঘ্রই শ্রীমায়াপুরে আসিবেন।" সত্য সত্যই অবিলম্বে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে হাটহাজারি থানার অন্তর্গত ও তৎস্থানের ২ মাইল পূর্ব্বদিকে মেখলা-গ্রামে ১৪০৭ শকাব্দায় মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গাদেবীর গৃহে শ্রীপুণ্ডরীক আবির্ভূত হন। বাণেশ্বর ঘোর শাক্ত ছিলেন ও কৌলাচার্য্য বলিয়া ভৈরবীচক্রে সম্মান পাইয়াছিলেন। পুণ্ডরীক ঘোর শাক্ত-সমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও শিশুকাল হইতেই বিদ্ধ-শাক্তধর্ম্মের * প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ

---

* যাঁহারা অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার দাসীগণের আনুগত্যে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারা শুদ্ধ-শাক্ত; আর, যাহারা অচিৎশক্তির সেবক, তাহারা বিদ্ধ-শাক্ত

নবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার বাসাবাটী ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে বিচরণ করিতেন, সেই সময় শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে যে,

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভজন-কুটীর

যখন শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল মাধবেন্দ্রের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল পুরী গোস্বামী শ্রীপুণ্ডরীককে বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ সকলেই শক্তি-উপাসক। যদি তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার উপর

ভীষণ নির্য্যাতন আরম্ভ হইবে ; এমন কি, ইহাতে তোমার প্রাণ-সংশয় হইতে পারে।”

তখন শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল পুরী গোস্বামীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন,—“প্রভো, আমি নির্য্যাতনের ভয়ে কাতর নহি। শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ও দৈত্য-সমাজের লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া হরিভজন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমিও সেরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি ; আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার কৃপা না পাইলে আমি এই জীবনধারণ করিব না।”

ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র শ্রীপুণ্ডরীককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক নবদ্বীপে অধ্যয়ন শেষ করিয়া পণ্ডিত-সমাজ হইতে ‘বিদ্যানিধি’ উপাধি প্রাপ্ত হন। দীক্ষা-লাভের পর যখন তিনি চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার বৈষ্ণব-বেষ দর্শন করিয়া স্থানীয় বিদ্ধশাক্ত-সমাজ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। বিদ্যানিধি সমাজকে কোন গ্রাহ্যই করিতেছেন না দেখিয়া সামাজিকগণ তাঁহার মাতা-পিতাকে বলিলেন যে, যদি তাঁহারা ঐরূপ “কুলাঙ্গার পুত্র”কে (?) পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সমাজ-চ্যুত করিবেন। সমাজের শাসন, নিষ্পেষণ ও শত শত নির্য্যাতনের ভয়ে পুণ্ডরীক বিন্দুমাত্রও শুদ্ধভক্তি হইতে বিচলিত হইতেছেন না দেখিয়া শাক্ত-সমাজ বিদ্যানিধি ‘বহিস্তন্ত্র’ হইয়াছেন অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত কার্য্যের বহির্ভূত অধর্ম্ম কার্য্য করিতেছেন বলিয়া প্রচার করিলেন।

শ্রীমথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্রজবাসিগণের যে বিপ্রলম্ভ প্রেম, তাহা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট যেমন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়, সনোড়িয়া বিপ্র প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রজলীলায় যিনি বৃষভানু রাজা, তিনিই গৌর-লীলায় শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর (শ্রীরাধার ভাবে) শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শ্রীল পুণ্ডরীকের লৌকিক উপাধি ছিল—'বিদ্যানিধি'। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম দিয়াছিলেন—'প্রেমনিধি' ও 'আচার্য্যনিধি'। শ্রীল পুণ্ডরীক সর্ব্বত্র পরবিদ্যাবধূর জীবন শ্রীহরিনামের প্রচার করিয়াছিলেন; এইজন্যই তাঁহার নাম আচার্য্যনিধি। গৃহস্থের আকারে, বিষয়ীর আকারে মহাপুরুষ বা মহাভাগবত আচার্য্য অবস্থান করিলে তাঁহাকে গৃহস্থ বা বিষয়ি-সামান্যে দর্শন করা অপরাধ, এই শিক্ষা-প্রচারের জন্য আচার্য্যনিধি শ্রীল পুণ্ডরীক বৈষ্ণববিরোধিকুলে ও সমাজে বিষয়ী ও গৃহস্থের আকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু এক অভিনয় প্রকট করিয়া আমাদিগকে ঐ অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার 'ছনহরা' গ্রামে শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুণ্ডরীকের মহিমা অবগত ছিলেন। তিনি গদাধর পণ্ডিতকে পুণ্ডরীকের মহিমা জানাইয়া সেই অদ্ভুত বৈষ্ণবকে

দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গদাধর পণ্ডিত আকুমার ব্রহ্মচারী,—বিষয়ে বিরক্ত। পুণ্ডরীককে দেখিয়া তাঁহার ভক্তি হওয়া দূরে থাকুক, অশ্রদ্ধারই উদয় হইল। পুণ্ডরীক রাজপুত্রের ন্যায় চন্দ্রাতপের তলে, বহুমূল্য খট্টায়, উচ্চ গদীর উপরে বসিয়া রহিয়াছেন, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়াছেন, তাঁহার চারি পাশে কত প্রকার বিলাসের দ্রব্য! দুই জন লোক সর্ব্বদা ময়ূর-পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছেন। গদাধর মনে করিলেন,—এইরূপ বিলাসী লোক কি আবার ভক্ত হইতে পারেন! মুকুন্দ গদাধরের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক একটি শ্লোক পাঠ করিলেন, অমনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অদ্ভুত অপ্রাকৃত প্রেমের আবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক-বিকার-সকল প্রকাশিত হইল। গদাধর বিদ্যানিধির অদ্ভুত চরিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ও তিনি যে এই মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া অপরাধ ক্ষালন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীবিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া মহাপ্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু অবিলম্বে শ্রীবিদ্যানিধির শ্রীচরণাশ্রয় করিবার জন্য শ্রীগদাধরকে আদেশ করিলেন।

বাহ্য আকৃতি ও ক্রিয়া-মুদ্রা দেখিয়া মহাভাগবত বা মহা-পুরুষের চরিত্র বুঝা যায় না। মহাপ্রভু শ্রীবিদ্যানিধির চরিত্রের দ্বারা এই শিক্ষা দান করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীবাস-মন্দিরে সংকীর্ত্তন-রাস

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবাস-ভবন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সংকীর্ত্তন-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইল। এজন্যই শ্রীবাস-অঙ্গন মহাপ্রভুর 'সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী' বলিয়া কথিত হয়। শ্রীবাস-গৃহে এক বৎসর ব্যাপিয়া এই সঙ্কীর্ত্তন-রাস হইয়াছিল। বলিতে কি, এই স্থান হইতেই ভুবনমঙ্গল সংকীর্ত্তন সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি আমার একান্ত গুপ্ত সম্পত্তি শ্রীনিত্যানন্দকে যখন বিশেষভাবে চিনিতে পারিয়াছ, তখন তোমাকে আমি একটি বর দিতেছি,—

বিড়াল-কুক্কুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।২১

যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবায় অকপট অনুরাগী, এইরূপ ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতি-রাত্রে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কোন কোন দিন আচার্য্য শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনেও এইরূপ কীর্ত্তন হইত।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীহরিদাস, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীবিদ্যানিধি, শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীহিরণ্য, শ্রীগঙ্গাদাস, শ্রীবনমালী,

শ্রীবিজয়, শ্রীনন্দনাচার্য্য, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্, শ্রীনারায়ণ, শ্রীকাশীশ্বর, শ্রীবাসুদেব, শ্রীরাম, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীজগদীশ, শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত, শ্রীশ্রীমান্, শ্রীসদাশিব, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীশ্রীগর্ভ, শ্রীশুক্লাম্বর, শ্রীব্রহ্মানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীসঞ্জয় প্রভৃতি একপ্রাণ ভক্তগণ মহাপ্রভুর সহিত প্রতি-রাত্রে শ্রীবাস-মন্দিরে সংকীর্ত্তন-নৃত্য করিতেন।

অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতা যখন চিত্তরাজ্যকে অধিকার করে, তখনই হৃদয় হইতে জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনামের প্লুতধ্বনি বহির্গত হয়। যাহারা নাস্তিক, যাহারা দেহসর্ব্বস্ব, ইহলোকসর্ব্বস্ব, তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না। বন্ধ্যা যেরূপ পুত্রস্নেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহসর্ব্বস্ববাদিগণও তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রীতির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ইহাদিগকেই 'পাষণ্ডী' বলা হয়। এই পাষণ্ডী ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্যকে নানা চক্ষে দেখিত ও নানাভাবে সমালোচনা করিত। কতকগুলি লোক বলিত যে, ভক্তগণ অনর্থক চীৎকার করিয়া মরিতেছে; কেহ বা বলিত, ইহারা মদ্যপান করিয়া অত্যন্ত মাতাল হইয়া প্রলাপ বকিতেছে; কেহ বা বলিত, ইহারা মধুমতীসিদ্ধি-বিদ্যায়-পারদর্শী, সেই মন্ত্রের প্রভাবে গোপনে নীতি-বিরুদ্ধ-কার্য্য করিতেছে! যাহার যেরূপ চিত্ত, সে সেইরূপ ভাবেই মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিত।

পাষণ্ডি-সম্প্রদায় শ্রীবাসের গৃহে প্রবেশের অধিকার না পাইয়া মহাপ্রভু ও ভক্তগণের সম্বন্ধে নানা-প্রকার কুৎসা রটনা

ও নানাভাবে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বে ভাল ছিল, এখন সঙ্গদোষে অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে, মদ্যপান-ব্যভিচার প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইয়াছে,'—এরূপ নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বা বলিল,—ইহাদের জন্যই দেশে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি হইতেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে! কেহ বা বলিল,—ইহারা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ভুলিয়া মূর্খ ও ভাবুকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, লোকের জাতি নষ্ট করিয়া দিতেছে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ব্যভিচার আনয়ন করিতেছে! কেহ বা বলিল,—শ্রীবাস পণ্ডিতই যত অনর্থের মূল। ইহার ঘর, দ্বার ভাঙ্গিয়া নদীর স্রোতে ফেলিয়া দিয়া ইহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইতে না প্যারিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। ইহার গৃহে যেরূপ কীর্ত্তন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে অচিরেই অহিন্দু শাসনকর্ত্তা গ্রামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবে।

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের এই সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিকীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকিতেন।

প্রেমকল্পতরু মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া অনুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। একাদশীর দিন প্রত্যূষ হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া সারা-রাত্র কীর্ত্তন হইত। মহাপ্রভুর ক্রন্দন ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইত। এই সংকীর্ত্তন-রাস দর্শন করিবার জন্য—এই ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিধ্বনি শ্রবণের জন্য অলক্ষ্যে কোটি কোটি বৈষ্ণব ও দেবতাবৃন্দ উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার

ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন এই সংকীর্ত্তন-রাসের বর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, তখন না হইল।
হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল॥
—চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।১৯৮

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে অপমান করিবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিত। একদিন 'গোপাল চাপাল' নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তান দেবীপূজার উপহারসহ মদ্যভাণ্ড রুদ্ধ-দ্বারের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। সেই বৈষ্ণবাপরাধে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিলেও তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া মহাপ্রভু তৎকালে তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন কুলিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গোপাল চাপাল মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের সন্তোষ বিধান করিতে উপদেশ করিলেন। শ্রীবাসের কৃপায় গোপালের অপরাধ ভঞ্জন হইল।

আর এক রাত্রিতে শ্রীবাসের বাড়ীর যে গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই গৃহের এক কোণে শ্রীবাসের শাশুড়ী লুকাইয়া ছিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন,—"কোন বহির্ম্মুখ ব্যক্তি নিশ্চয়ই

কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছে, নতুবা আজ কীর্ত্তনে আমার আনন্দ হইতেছে না কেন?" শ্রীবাস বহু অনুসন্ধানের পর গৃহের কোণে লুক্কায়িত নিজ-শাশুড়ীকে চুলে ধরিয়া বাহির করিবার আদেশ দিলেন। ইহা দ্বারা পণ্ডিতবর ভক্তরাজ শ্রীবাস জানাইলেন যে, ভগবানের সেবাই সকল মর্য্যাদার শিরোমণি। শ্রীগৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়তর্পণের অর্থাৎ সংকীর্ত্তনের প্রতিকূল বস্তুর পারমার্থিক সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তবে লৌকিক বা সামাজিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করা সাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"সাতপ্রহরিয়া ভাব" বা "মহাপ্রকাশ"

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের খাটের উপর বসিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু একে একে বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ভাব সপ্তপ্রহর পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকায় ভক্তগণ তাহাকে 'সাতপ্রহরিয়া ভাব' বা 'মহাপ্রকাশ' বলেন। ভক্তগণ 'পুরুষসূক্তে'র * মন্ত্রসকল পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে মহাপ্রভুর

* পুরুষসূক্ত—ঋগ্‌বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র।

অভিষেক ও বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া ভোগ দিলেন। এই অভিষেক 'রাজরাজেশ্বর-অভিষেক' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

মহাপ্রভু শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সকলের নিকট শ্রীধরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকে শ্রীধরকে থোড়-মোচা-বিক্রেতা দরিদ্র-ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া তাঁহার মহিমা জানিত না। পক্ষান্তরে বহির্ম্মুখ পাষণ্ডী ব্যক্তিগণ শ্রীধরকে কত কিছু বলিত,—

মহা চাষা-বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে॥
—চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।১৪৮

শ্রীধর উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু শ্রীধরের হরিসেবার কথা সকলকে জানাইলেন, শ্রীধরও মহাপ্রভুকে স্তব করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে বলিলেন,—"তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধির বর দিতেছি।" শ্রীধর বলিলেন,—"প্রভো, আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন কেন? সসাগরা পৃথিবীর অধিপতির নিকট কি কেহ এক মুষ্টি ধূলি প্রার্থনা করে? আমি এ-সমস্ত কিছুই চাহি না, অষ্ট-সিদ্ধি ত' ছার, জ্ঞানি-যোগি-ঋষিগণ যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাও শ্রীভগবানের সেবার নিকট অতি তুচ্ছ। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আমার থোড়-কলা-মোচা কাড়িয়া ল'ন সেই ব্রাহ্মণ জন্মে-জন্মে আমার প্রভু হউন—ইহাই আমার প্রার্থনা, আমি আর কিছুই চাই না। এজন্য ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীধরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে ॥
কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা ॥
অহঙ্কার-দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪-২৩৬

মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে কৃপা করিলেন এবং সকলের নিকট মুরারির মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, একবারও যে ব্যক্তি মুরারির নিন্দা করিবে, কোটি গঙ্গাস্নানেও তাহার নিস্তার হইবে না, গঙ্গা-হরিনামই তাহাকে সংহার করিবে। *

ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—

"এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩৬

পাপিষ্ঠ বিধর্ম্মিগণ তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহা আমার নিজের শরীরে গ্রহণ করিয়াছি; এই দেখ, আমার শরীরে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে!" মহাপ্রভু তখন হরিদাসকে বর প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কখনও কোন অপরাধ হইবে না, তিনি ভক্তির স্বাভাবিক অধিকারী। ঠাকুর শ্রীহরিদাসের চরিত্র-দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

* চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন, আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৯৯-১০০

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"খড় ও জাঠিয়া বেটা"

মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের দিন সকল ভক্তই তাঁহার নিকট আসিবার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুও একে একে সমবেত ভক্তগণকে কৃপা করিতেছিলেন। মহপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া মুকুন্দ তখন পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। মুকুন্দ মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া থাকেন, আজ সেই মুকুন্দের প্রতি মহাপ্রভুর এইরূপ অসন্তোষ কেন, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীবাস মুকুন্দকে কৃপা করিবার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি উহাকে কৃপা করিতে পারি না, মুকুন্দ সমন্বয়বাদী—'খড় ও জাঠিয়া বেটা'।* যাহারা সকলের ধর্ম্মমতেই 'হাঁ জী,

* খড়—তৃণ, জাঠি—যষ্টি বা লাঠি।

হাঁ জী' করিয়া সকল দলে মিশে, আত্মার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম যে অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তি, তাহাকেও অন্যান্য মতের ন্যায়ই একটি মতবিশেষ মনে করে, যখন যে সভায় যায়, তাহাদেরই অনুরূপ কথা বলে, সেইরূপ সমন্বয়বাদিগণ আমার পায়ে এক হাত ও গলায় আর এক হাত দিয়া থাকে। কোন সময় তাহারা লোক-দেখান দৈন্য করিয়া দন্তে তৃণ ধারণ করে, আবার কোন সময় লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আসে। যথেচ্ছাচারিতা কখনই উদারতা নহে। ভক্তি ও অভক্তি, মুড়ি ও মিছরিকে একাকার করিলে কেহ কখনও ভগবানের কৃপা পায় না। যাহারা ভক্তির সহিত অপর সাধনকেও সমান জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহারা আমার গায়ে লাঠি মারে।* তাহারা যদিও সময় সময় ভক্তির ভাণ দেখাইয়া পূজা, কীর্ত্তন, পাঠ প্রভৃতির অভিনয় করিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের ঐরূপ কপটতায় আমি সন্তুষ্ট হই না। তাহাদের ঐ সকল স্তব-স্তুতি আমার অঙ্গে বজ্রাঘাততুল্য বোধ হয়। মুকুন্দ ভক্ত-সমাজে হরিকীর্ত্তন করে, ভক্তির কথা বলে, আবার মায়াবাদীর নিকট যোগবাশিষ্ঠের মায়াবাদ স্বীকার করিয়া থাকে।"

মুকুন্দ ঘরের বাহিরে থাকিয়াই মহাপ্রভুর সকল এই কথা শুনিতেছিলেন ও মনে মনে বিচার করিতেছিলেন যে, যখন শুদ্ধা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ-বশতঃ তিনি মহাপ্রভুর কৃপা-বঞ্চিত হইলেন, তখন তাঁহার পক্ষে অপরাধময় দেহ ত্যাগ করাই সমীচীন।

---

* চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৩-১৮৫, ১৮৮-১৯২

মুকুন্দ দেহত্যাগের পূর্ব্বে একবার মহাপ্রভুকে একটি শেষ কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারা মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি কি কোন দিনই মহাপ্রভুর দর্শন পাইবেন না? মুকুন্দ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অনর্গল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের দুঃখ দেখিয়া ভক্তগণও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইলেন যে, কোটি-জন্ম পরে মুকুন্দ মহাপ্রভুর দর্শন পাইবেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর এই বাণী শুনিয়া 'পাইব' 'পাইব' বলিয়া পরমানন্দে মহা নৃত্য করিতে লাগিলেন। যত বিলম্বেই হউক না কেন, কোনও-দিন-না-কোনও-দিন ত' মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ ঘটিবে, এই আশাবন্ধই মুকুন্দের হৃদয়কে উল্লসিত করিয়া তুলিল। মায়াবাদিগণ চিদ্বিলাস স্বীকার করে না, এজন্য তাহাদের আত্মার (জীবাত্মার) নিত্যবৃত্তির বিনাশ ঘটিয়া থাকে। অতএব তাহারা কোনদিনই লীলাপুরুষোত্তমের নিত্য-সেবার অধিকারী হয় না—এই অবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দ আনন্দে এত উল্লসিত হইলেন।

মুকুন্দের এইরূপ উল্লাসের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন,—"মুকুন্দকে আমার নিকট এখনই লইয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"মুকুন্দ, তোমার অপরাধ নষ্ট হইয়াছে, এখন তুমি আমার কৃপা গ্রহণ

কর। তুমি যখন কোটি-জন্ম পরেও ভক্তি লাভ করিবে—এই বাক্যকে অব্যর্থ জানিয়া উল্লসিত হইয়াছ, তখন তোমার হৃদয়ে ঐকান্তিকী ভক্তি বিরাজিতা আছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার দ্বারা লোকশিক্ষার জন্য আমি এইরূপ আদর্শ দেখাইলাম। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ ভক্তির চরণে অপরাধী। তাহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক,—এই শিক্ষাই তোমার আদর্শের দ্বারা প্রচার করিলাম। বস্তুতঃ তুমি আমার নিত্য-দাস। সুতরাং তোমার হৃদয়ে কখনও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের অনর্থ প্রবেশ করিতে পারে না।”

মহাপ্রভুর বাক্যে মুকুন্দ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া অধিকতর দৈন্য-ভরে বলিতে লাগিলেন,—“আমি সেবা-রহিত মন্দভাগ্য ব্যক্তি। এইজন্যই কায়মনোবাক্যে ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব স্বীকার করি নাই। ভক্তি সুখময় বস্তু। ভক্তিহীন হইয়া তোমাকে দেখিবার অভিনয় করিলেই বা কি সুখ পাইব? দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্ রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তির অভাবে কোন সুখ লাভ করিতে পারেন নাই এবং ঐ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণী-হরণে গমন করেন, তখন শিশুপালের পক্ষীয় বহু নৃপতি গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মঙ্গল হয় নাই। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু শ্রীবরাহদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন লাভ করিয়াও ভক্তির অভাবে তাঁহাদের সেবাধিকার লাভ করেন নাই; যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার প্রভৃতি সামান্য ব্যক্তিগণও ভক্তি-

যোগ-প্রভাবে শ্রীভগবানের সেবাধিকার লাভ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সেবা-লাভই তাঁহার প্রকৃত দর্শন-লাভ।”

মুকুন্দের শুদ্ধা ভক্তির প্রতি অনুরাগ দেখিয়া মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন ও মুকুন্দকে বর প্রদান করিয়া বলিলেন যে, মুকুন্দের কণ্ঠস্বরে তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন। যেখানে যেখানে প্রভুর অবতার হইবে, সেখানে সেখানেই মুকুন্দ মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-গায়ক হইবেন।

এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু একটি বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন। অনেক সময়ই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা মনে করিয়া লোক-প্রীতি অর্জ্জনের জন্য সকল দলের সকল কথায় ‘হাঁ হাঁ’ বলিবার যে প্রবৃত্তি লোক-সমাজে দেখা যায়, তাহা উদারতা নহে; উহা কপটতা ও পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী প্রীতির অভাব-জ্ঞাপক। ভগবানে অনুরাগি-জনের চরিত্রে ভগবানের সেবা অর্থাৎ তাঁহার তৃপ্তি-বিধানের প্রতিই একান্ত নিষ্ঠা থাকিবে,—তাহা কল্পিত নিষ্ঠা নহে—গোঁড়ামি নহে। গোঁড়ামিতে তত্ত্বান্ধতা আছে ও শ্রীহরির প্রতি প্রীতি নাই; আর অব্যভিচারিণী ভক্তিতে তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে পারদর্শিতা এবং যাহাতে যাহাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ের প্রতি সর্ব্বতোভাবে তীব্র নিরপেক্ষতা আছে। লোক-প্রীতি বা নিজেন্দ্রিয়-প্রীতির যূপকাষ্ঠে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতিকে বলি দেওয়া কখনই উদারতা নহে,—উহা উচ্ছৃঙ্খলতা ও হীনতম নাস্তিকতা-মাত্র।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জগাই-মাধাই-উদ্ধার

শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপের নগরে-নগরে, ঘরে-ঘরে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচারের জন্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন নিত্যানন্দ-প্রভু গৃহে গৃহে নাম প্রচার করিয়া নিশাকালে মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় 'জগাই' 'মাধাই' নামে দুই জন মাতাল ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হইল। ইহারা না করিয়াছে, জগতে এমন কোন পাপ অদ্যাবধি সৃষ্ট হয় নাই। সকল সময়েই মাতালগণের সহিত অবস্থান করায় তাহারা কেবলমাত্র 'বৈষ্ণব-নিন্দা' করিবার সুযোগ পায় নাই। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর শ্রীহরিদাস জগাই-মাধাইকে কৃপা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যেন তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই সেই নিশাতে নবদ্বীপে বেড়াইতেছিলেন। জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে দেখিতে পাইল। মাধাই 'অবধূত' নাম শুনিয়াই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিরে 'মুটকী'* নিক্ষেপ করিল। জগাই ইহা দেখিয়া মাধাইকে বাধা দিল। এমন সময় মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধে

---

* ভাঙ্গা হাড়ী।

সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাইর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ইহাতে মাধাইর চিত্তেরও পরিবর্ত্তন হইল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মাধাইকে ক্ষমা করিলেন। তাহারা উভয়েই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল। **জীবনে আর কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করিবে না,** কেবলমাত্র **নিষ্কপট হরিসেবাতেই জীবন যাপন** করিবে,—এইরূপ **প্রতিজ্ঞা** করিল। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি মহাপ্রভু এবং ভক্তগণেরও কৃপা হইল। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় দুইজন দস্যুও তাঁহাদের পাপ-প্রবৃত্তি চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়া 'মহা-ভাগবত' হইলেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব-চরিত্র স্মরণ করিয়া কেহ যেন ইঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অনাদর না করেন, মহাপ্রভু ভক্তগণকে এইরূপ আদেশ দিলেন।

ব্রাহ্মণ-কুলীন-প্রধান নদীয়া-নগরে মুসলমানকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর শ্রীহরিদাসের দ্বারা নাম-প্রচারের আদর্শ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা জগাই-মাধাইর উদ্ধার-লীলা প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু জানাইলেন,—বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাকৃত জাতি-কুলের অন্তর্গত নহেন, তিনি অতিমর্ত্ত্য বস্তু—জগদ্‌গুরু। তিনি আরও জানাইলেন,—যাঁহারা হরিনাম প্রচার করিবেন, হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহারা হরিকথা ও হরিনাম-বিতরণের বিনিময়ে কোন প্রকার অর্থ-দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন না। শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিনাম—সাক্ষাৎ শ্রীহরি। হরিকে বিক্রয় করিবার চেষ্টার ন্যায় অপরাধ আর নাই। এই

লীলায় মহাপ্রভুর আরও একটি শিক্ষা এই যে,—সর্ব্বপ্রকার অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিবার সামর্থ্য স্বয়ং শ্রীভগবানেরও নাই। যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইয়াছে, তাঁহার নিকট অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ-নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিকেই শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করেন।

মহাপ্রভু যে ক্রোধভরে সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারও রহস্য আছে। ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ-প্রদর্শনই ক্রোধ-বৃত্তির সদ্ব্যবহার ; যেমন,—হনুমান্ রাবণের প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন।

যে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি যাহার আসক্তি, সেই ব্যক্তি বা বস্তুর লঙ্ঘনকারীর প্রতি ক্রোধই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভগবানের ভক্তের প্রতি আসক্তি, আর ভক্তের শ্রীভগবানের প্রতি আসক্তি। শ্রীভগবানকে লঙ্ঘন করিলে যদি ভক্তের ও ভক্তকে লঙ্ঘন করিলে যদি ভগবানের লঙ্ঘনকারীর প্রতি ক্রোধ উদিত না হয়, নিরপেক্ষতা-মাত্র থাকে, তবে প্রেমের অভাবই প্রমাণিত হয়। প্রেমিক ভক্ত—ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ করেন। তাঁহার ক্রোধ সাধারণ প্রাকৃত লোকের ক্রোধের ন্যায় জগজ্জঞ্জাল-কর নহে। তাহা সুমঙ্গলপ্রসূ।

জগাই-মাধাই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়া পূর্ব্বের নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকিলেন ও সাধুসঙ্গে তীব্রভাবে হরিভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বের যাবতীয় সঙ্গ ও স্মৃতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহারা প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান ও দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন এবং পূর্ব্বের দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া শ্রীগৌরনাম করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেন। মাধাই নিত্যানন্দ-প্রভুর চরণ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে মাধাই প্রতিদিন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গাঘাটের সেবা, ঘাটে সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং তাঁহাদের নিকট পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যা-প্রভাবে মাধাইর 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি হইল। মাধাই স্বহস্তে কোদালী লইয়া গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতেন। এই ঘাট 'মাধাইর ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইল। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পথে শ্রীমায়াপুরে এই 'মাধাইর ঘাট' এখনও দেখা যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন লীলা

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভিখারী বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবতা বুঝিতে পারিত না। মহাপ্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ক্ষুদকণা-সংযুক্ত চাউল কাড়িয়া খাইতেন। শ্রীভগবান্ অর্থের বশ

নহেন,—সেবার বশ। দাম্ভিক ধনবানের কোন নৈবেদ্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না; কিন্তু অকিঞ্চনের অতি সামান্য বস্তুও নিজে যাচিয়া গ্রহণ করেন।

একদিন নিশাকালে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন-নৃত্য সমাপ্ত করিয়াছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণী আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ হইতে পুনঃ পুনঃ ধূলি লইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে সবেগে ছুটিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুকে ধরিয়া গঙ্গা হইতে উঠাইলেন। সেই রাত্রিতে মহাপ্রভু বিজয় আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন।

তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার গার্হস্থ্য-লীলাকালেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা গৃহী বা সন্ন্যাসী গুরু-গোস্বামীর বেশে স্ত্রীলোকের দ্বারা পদসেবা, পাদস্পর্শ প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া থাকেন বা উহাতে প্রশ্রয় দান করেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। গৃহস্থ ব্যক্তিও চরণধূলি-দান প্রভৃতির ছলে পরস্ত্রী স্পর্শ করিবেন না। ছোট হরিদাসের দণ্ড-লীলা-দ্বারা মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণের আচার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীবাসের গৃহের নিকটবর্ত্তী কোন মুসলমান দর্জ্জি শ্রীবাসের জামা সেলাই করিতেন। দর্জ্জি শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে মহাপ্রভু সেই ভাগ্যবান্ দর্জ্জিকে নিজ-রূপ প্রদর্শন করিলেন। সেই দর্জ্জি তখন হইতে "আমি কি দেখিনু!

আমি কি দেখিনু !!”—এইরূপ বলিতে বলিতে প্রেমে পাগল হইয়া আনন্দভরে নাচিতে লাগিলেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া কোন ছাত্র বলিয়া উঠিল,—“নামের আবার এত মহিমা কি! ইহা কেবল নামকে বড় করিবার জন্য অতিস্তুতি! এক নামেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে, আর কিছুতেই হইবে না,—এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি পণ্ডিত-সমাজে চলিবে না।” নামের অতুলনীয় মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা—‘নামাপরাধ’, ইহাই সৎশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই শাস্ত্রের সম্মান-রক্ষাকারী মহাপ্রভু সেই নামাপরাধী ছাত্রের মুখ দর্শন করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া ভক্তগণের সহিত তৎক্ষণাৎ সচেল * গঙ্গাস্নান করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল, প্রভু মেঘকে দূর হইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। মেঘ তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। এইজন্য ঐ গঙ্গাচড়া-ভূমিকে লোকে ‘মেঘের চর’ বলিত। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলদেবের আবেশে যমুনাকর্ষণ-লীলা প্রকাশ করিয়া ‘মধু আন’, ‘মধু আন’ বলিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীবনমালী আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর হস্তে স্বর্ণ-মুষল দর্শন করিয়াছিলেন।

* চেল —বস্ত্র, সচেল অর্থে—পরিহিত বস্ত্রের সহিত।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আম্র-মহোৎসব

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া নগর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমায়াপুর হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালে ভক্তগণ শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের সেবার জন্য একটী ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন।

সপার্ষদ মহাপ্রভু যে-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানের এক ভক্তের অঙ্গনেই মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলেন ও তথায় একটি আম্র-বীজ রোপণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে এক মুহূর্ত্তে তথায় একটি আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে লাগিল ও সেই বৃক্ষে অসংখ্য পক্ক আম্র ফলিতে লাগিল। মহাপ্রভু অবিলম্বে সেই বৃক্ষ হইতে দুইশত আম্র ফল সংগ্রহ করাইয়া লইলেন, উহাদিগকে জলে ধৌত করিয়া কৃষ্ণের ভোগে লাগাইলেন ও তৎপরে ভক্তগণ সেই আম্র-প্রসাদ সম্মান করিলেন। এরূপ অপূর্ব্ব আম্র কেহ কখনও দেখেন নাই। আম্রের অষ্ঠি ও বল্কল নাই, সুন্দর পীত ও রক্ত বর্ণ। এক একটি আম্র ভোজন করিলেই এক এক জনের উদর-পূর্ত্তি ও পরিতুষ্টি হয়।

বৈষ্ণবগণ আম্রফল ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন। মহাপ্রভু এই স্থানে এইরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন যে, সেই ভক্তের অঙ্গনে বার মাসই ঐরূপ আম্র ফলিতে থাকিল এবং মহাপ্রভুও নগরকীর্ত্তনের পর প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া ভক্তগণের সহিত এইরূপ আম্র-মহোৎসব করিতে লাগিলেন।

যে-স্থানে মহাপ্রভুর এই আম্র-মহোৎসব হইয়াছিল, সেই স্থান 'আম্রঘট্ট' বা 'আমঘাটা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নবদ্বীপ-ঘাট হইতে কৃষ্ণনগর যাইতে যে ই, বি, আর্ লাইট্ রেলওয়ে আছে, তথায় মহেশগঞ্জ ষ্টেশনের পরেই এই আমঘাটা-ষ্টেশন। এই আমঘাটা-ষ্টেশনের সন্নিকটেই সুবর্ণবিহার, ইহাও মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মাঙ্কিত সংকীর্ত্তন-স্থান। এই সুবর্ণবিহারে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীসুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই সুবর্ণবিহার অতি প্রাচীনকালে গৌড়দেশের রাজধানী ছিল। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম খুব প্রসার লাভ করে, তখনই এই স্থানের নাম সুবর্ণবিহার হয়। এই স্থান হইতে মালদহ জেলার নিকটবর্ত্তী কর্ণসুবর্ণ ও ঢাকা জেলার সুবর্ণগ্রাম (সোণার গাঁ) ত্রিকোণা-বস্থিত ভূখণ্ড গৌড়ের প্রাদেশিক রাজধানী বলিয়া মাধ্যমিক যুগে বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণবিহারে কিছুদিন পালরাজগণ বাস করেন। বর্ত্তমানকালে উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা শ্রীমায়াপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে জলঙ্গী নদীর অপর পারে অবস্থিত। আতোপুর

বা অন্তর্দ্বীপের মাঠ হইতে ঐ স্থানের উচ্চভূমি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস প্রভুকে শ্রীঈশান ঠাকুর আতোপুরের মাঠ হইতে স্থবর্ণ-বিহার দেখাইয়াছিলেন। সত্যযুগে শ্রীস্থবর্ণসেন নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন বিশেষ স্থকৃতির ফলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ স্থবর্ণসেনের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ স্থবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অতিথি ও বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ ছিলেন। তিনি নারদকে অতীব আদরের সহিত পূজা করিলেন। শ্রীনারদ মুনি মহারাজকে কৃপা-পূর্ব্বক যে-সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, যে-স্থানে তিনি বাস করিতেছেন, সেই স্থান শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কলিকালে এই স্থানে স্থবর্ণবর্ণ শ্রীগৌরহরি সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অভূতপূর্ব্বা লীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদ মুনি 'গৌর'-নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বীণা-যন্ত্রে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন,— "কবে সেই ধন্য কলি আগমন করিবে, যে-দিন গৌরহরি সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বময় প্রেমের বন্যা ছুটাইবেন!" শ্রীনারদ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। শ্রীনারদ-মুখনিঃসৃত গৌরনাম শ্রবণ করিয়া রাজার বিষয়-বাসনার বীজ নির্ম্মূল হইল। তিনি প্রেমে 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হইল। একদিন মহারাজ স্থবর্ণসেন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীগৌরগদাধর

সপার্ষদ মহারাজের অঙ্গনে 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলকে আলিঙ্গন দ্বারা কৃতার্থ করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিলেন, গৌরহরি যেন একটি সাক্ষাৎ সুবর্ণের পুত্তলি ; উপ-নিষদোক্ত "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্" (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।৩)। রুক্মবর্ণ—সোনার রং, অনর্পিতচর—যাহা পূর্ব্বে প্রদত্ত হয় নাই। রুক্মবর্ণ পুরুষ অনর্পিতচর প্রেম-প্রদানের জন্য সেই পসরা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে অত্যন্ত বিরহ-কাতর হইয়া তিনি 'গৌর' 'গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"হে মহারাজ, আপনি আশ্বস্ত হউন, গৌরহরি যখন কলিকালে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি বুদ্ধিমন্ত খান্ নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদ-মধ্যে পরিগণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ-সেবায় অধিকার পাইবেন।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধিমন্ত খান্

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান্।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক-প্রধান।

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৪

বুদ্ধিমন্ত খান্ মহাপ্রভুর প্রতিবেশী ও একান্ত অনুগত ধনবান্ ব্রাহ্মণ ভক্ত। মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে অধ্যাপকের লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন বায়ুব্যাধিচ্ছলে অপূর্ব্ব প্রেমভক্তির বিকারসমূহ দর্শন করেন; ইহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছেন। সেই সময় বুদ্ধিমন্ত খান্ অত্যন্ত বৎসলরসমুগ্ধ হইয়া নিমাই পণ্ডিতের বায়ুব্যাধির চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন, তখন বুদ্ধিমন্ত খান্ই বরপক্ষের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খান্ অতি উৎসাহভরে বলিয়াছিলেন,—

এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।৭২

পৃথিবীর লোক, অধিক কি, সমসাময়িক নবদ্বীপের অধিবাসিগণ নিজের পুত্র-কন্যার বিবাহে, সৌখিন ধনাঢ্যগণ কুকুর-বিড়ালের বিবাহে কত অর্থ ব্যয় করিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া থাকিত ; কিন্তু বুদ্ধিমন্ত খান্ সত্য-সত্যই এইরূপ সুবুদ্ধি ছিলেন যে, তিনি একমাত্র নিত্য-সেব্য শ্রীগৌর-নারায়ণের বিবাহে তাঁহার সমস্ত ধন নিয়োগ করিয়াছিলেন ; ইহাই বৈষ্ণব-মহাজনের ভাষায় —'কনকের দ্বারা মাধবের সেবা।'

নবদ্বীপ-লীলায় বুদ্ধিমন্ত খান্ অর্থের দ্বারা লক্ষ্মীপতি শ্রীগৌর-হরির সেবা করিয়াছেন। যখন চন্দ্রশেখর-গৃহে মহাপ্রভু পারমার্থিক নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন করেন, তখন বুদ্ধিমন্ত খান্ সেই অভিনয়ের যাবতীয় বস্ত্র ও ভূষণাদি সংগ্রহ করাইয়াছিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয়

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মেসো শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীহট্টে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে আসিয়া বাস করেন। ইনি নবনিধির অন্যতম বলিয়া 'আচার্য্যরত্ন'-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার গৃহে সময় সময় মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাস হইত। শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভু

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন শ্রীমন্দির

বর্ত্তমান শ্রীমন্দি
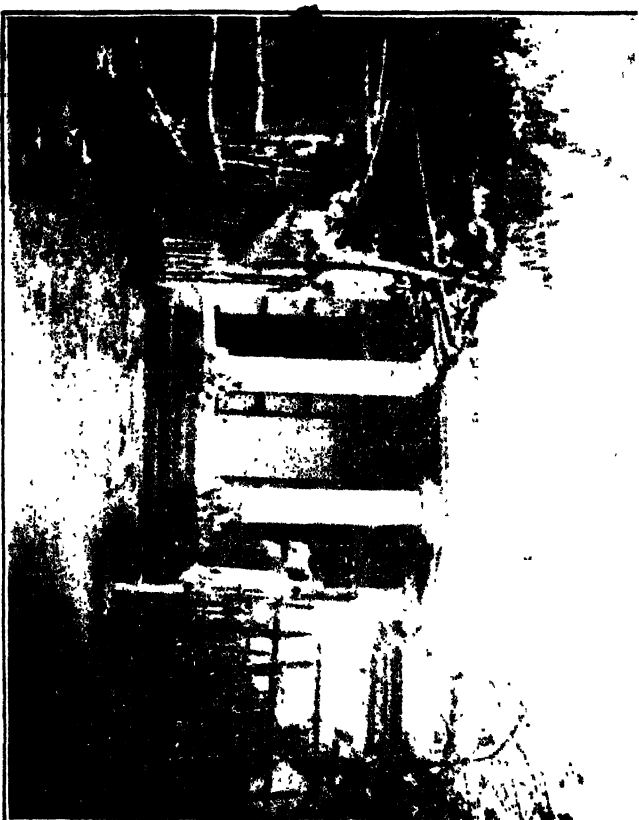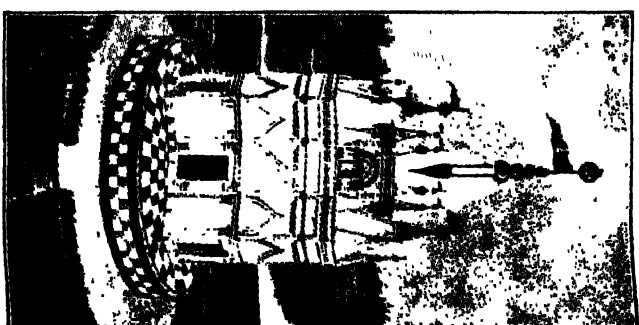
ব্রজলীলা-নাট্যাভিনয়ের প্রথম প্রবর্ত্তন বা পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান 'ব্রজপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-মিশনের আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট ব্রজলীলাভিনয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ধনাঢ্য ভক্তবর শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্‌কে অভিনয়ের যাবতীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে বলিলেন। শ্রীগদাধর—শ্রীরুক্মিণী, শ্রীব্রহ্মানন্দ—শ্রীরুক্মিণীর সখী, শ্রীনিত্যা-নন্দ—শ্রীযোগমায়া, ঠাকুর শ্রীহরিদাস—কোতোয়াল, শ্রীশ্রীবাস—শ্রীনারদ ও শ্রীশ্রীরাম পণ্ডিত—স্নাতকের বেশ গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিবেন, মহাপ্রভু ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; আর মহাপ্রভু স্বয়ং লক্ষ্মীর বেশ গ্রহণ করিয়া নৃত্য করিবেন ও যাঁহারা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদেরই সেই নৃত্য-দর্শনে অধিকার হইবে,—ইহা জানাইয়া দিলেন।

প্রকৃতি-স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তা'র অধিকার॥
সেই সে যাইবে আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।১৮-১৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাগ্রেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য লোক-শিক্ষার নিমিত্ত দৈন্যভরে বলিলেন,—"এই নৃত্য-দর্শনে আমার অধিকার হইবে না। কারণ, আমি অজিতেন্দ্রিয়।" শ্রীবাস-পণ্ডিত বলিলেন,—"আমারও সেই কথা।" ইঁহাদের বাক্য শ্রবণ

করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমরা ইহাতে যোগদান না করিলে কাঁহাদিগকে লইয়া আমার অভিনয় হইবে?" সকল বৈষ্ণবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"কাহারও কোন চিন্তা নাই। তোমরা সকলেই মহাযোগেশ্বর হইতে পারিবে, কেহই আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবে না, আমি এই আশ্বাস প্রদান করিতেছি।"

শ্রীগৌরসুন্দরের এই ব্রজলীলাভিনয় দর্শন করিবার জন্য নবদ্বীপবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শ্রদ্ধাবান্ সকলেই চন্দ্রশেখর-ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশচীমাতার সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও বৈষ্ণব-বর্গের পরিবার ব্রজলীলাভিনয় দর্শন করিবার জন্য শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে সমবেত হইলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহা-বিদূষকের ন্যায় নানা ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। "রামকৃষ্ণ বল, হরি গোপাল গোবিন্দ"—এই বলিয়া মুকুন্দ কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলেন। ঠাকুর শ্রীহরিদাস বৈকুণ্ঠের কোতোয়ালের বেশে হস্তে দণ্ড-ধারণ-পূর্ব্বক সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন,—"সাধু সাবধান! আজ জগতের জীবাতু লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন। তোমরা সকলে কৃষ্ণভজন কর, কৃষ্ণের সেবা কর, আর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর।" শ্রীহরিদাসকে দেখিয়া অন্যান্য অভিনয়কারী ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? এই স্থানেই বা কেন আসিয়াছ?" শ্রীহরিদাস বলিলেন,—"আমি বৈকুণ্ঠের কোতোয়াল। আমি চিরকাল কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া জগৎকে জাগাইয়া থাকি। আমার প্রভু বৈকুণ্ঠ হইতে এই ভূলোকে প্রেমভক্তি বিতরণ

করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজ তোমরা সাবধানে সেই প্রেম-ভক্তি লুটিয়া লও।" ইহা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীহরিদাস মুরারিগুপ্তের সহিত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীনারদের বেশ ধারণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন; রামাই-পণ্ডিত হস্তে আসন ও কমণ্ডলু লইয়া শ্রীবাসের অনুগমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অভিনয় করিয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছ?" শ্রীবাস বলিলেন,—"আমার নাম নারদ। আমি কৃষ্ণের গায়ন, আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিয়া থাকি, আমি কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, তিনি নদীয়া নগরে গিয়াছেন, এজন্য আমি এখানে আসিয়াছি।"

শ্রীমহাপ্রভু গৃহান্তরে রুক্মিণীর বেশে সাজিতে সাজিতে রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অশ্রুজল মসী (কালি), হস্তের অঙ্গুলি লেখনী (কলম) ও পৃথিবীর পৃষ্ঠ পত্র (কাগজ) রূপে পরিণত হইল। শ্রীরুক্মিণীর ভাবে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে পত্র * লিখিতে লাগিলেন,—

যাঁহার চরণধূলি সর্ব্ব-অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান॥

* শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৫২ অধ্যায়ে ৭টি শ্লোকে শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে পত্র লিখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবা-বিরহকাতরা শ্রীরুক্মিণীর ভাবে মহাপ্রভু মগ্ন হইলেন।

হেন ধূলি-প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ।
তাবৎ মরিব, শুন কমল-লোচন॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।৯৪-৯৬

প্রথম প্রহরে এই অভিনয় হইল, দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর ও শ্রীব্রহ্মানন্দের অভিনয়কালে যখন বৈষ্ণবগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি হইতেছিল, তখন শ্রীগৌরসুন্দর আদ্যাশক্তির বেশে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীযোগমায়ার বেশে প্রেমরসে ভাসিতে ভাসিতে বাঁকিয়া বাঁকিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীযোগমায়ার বেশ দেখিয়াই লোকে শ্রীগৌর-সুন্দরকে চিনিতে পারিলেন; নতুবা শ্রীগৌরসুন্দরের বেশ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছিলেন না। মহাপ্রভুকে কেহ বা লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ বা মহামায়া প্রভৃতি নিজ-নিজ ভাব-অনুরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আজন্ম শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। অধিক কি, শ্রীশচীমাতাও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিনয়ে বিস্মিতা হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"ইনি কি স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছেন?"

যে-রূপ দর্শন করিয়া মহাযোগেশ্বর মহাদেব পর্য্যন্ত মোহিত হন, সেই রূপ-দর্শনে যে বৈষ্ণবগণের মোহ হইল না, ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপারই একমাত্র নিদর্শন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায়

সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে মাতৃভাবের উদয় হইল। শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জননীর ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার অনুচরগণ সময়োচিত গান গাহিতে লাগিলেন। এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভু বিষ্ণুশক্তির যথাযথ স্বরূপ সকলকে শিক্ষা দিলেন। বিষ্ণুর একই শক্তি 'যোগমায়া' ও 'মহামায়া' নামে প্রকাশিতা। যোগমায়াই—উন্মুখমোহিনী স্বরূপশক্তি, আর মহামায়া—বিমুখমোহিনী ছায়াশক্তি। ভগবদ্ভক্তগণ একই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ যথাযথ অবগত হইয়া একমাত্র স্বরূপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর আত্মাশক্তিবেশে নৃত্যকালে শ্রীনিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া মহা-লক্ষ্মীর ভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ভক্তগণও তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। এইরূপ অভিনয়-আনন্দোৎসবে যেন অতি শীঘ্রই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল! বৈষ্ণববৃন্দ ও পতিব্রতাগণ বিষাদে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু একাধারে লক্ষ্মী, পার্ব্বতী, দয়া ও মহা-নারায়ণীর ভাবে সকলকে স্তন্য-পান করাইতে লাগিলেন। ইহাতে ভক্তগণের দুঃখ দূরীভূত হইল ও সকলেই প্রেমরসে মত্ত হইলেন।

এইরূপে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ও সংকীর্ত্তনধর্ম্মের আদি আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং সংকীর্ত্তন-

প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় পারমার্থিক রঙ্গ-মঞ্চের উদ্বোধন হইল। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস-লেখকগণ শ্রীগৌরসুন্দরের এই কৃপার অনুসন্ধান করিলে ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবেন। *

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দারি-সন্ন্যাসীর গৃহে

একদিন শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমায়াপুর হইতে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইতেছিলেন। মধ্যপথে ললিতপুর-নামে এক গ্রামে আসিয়া পেঁাছিলেন। গঙ্গার পূর্ব্বপারে হাট-ডাঙ্গার পরে এই গ্রাম অবস্থিত। ললিতপুরে এক গৃহি-বাউল বা দারি-সন্ন্যাসী ‡ বাস করিত। শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ ঐ সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী ‘ধন ও বংশবৃদ্ধি এবং উত্তম বিবাহ হউক্’—এই বলিয়া মহাপ্রভুকে আশীর্ব্বাদ

* ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের ‘ভারতবর্ষ’ পত্রে “চারিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বের নাট্যাভিনয়” শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু এম-এ মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন,—ইহাই বাঙ্গালার প্রাচীনতম অভিনয়ের নিদর্শন।

‡ যে-সকল তামসিক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী (?) সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিয়াও গৃহস্থের (?) ন্যায় পরস্ত্রী লইয়া বাস করে, তাহারাই দারি সন্ন্যাসী।

করিল। ইহাতে মহাপ্রভু বলিলেন,—"সন্ন্যাসিবর! ইহা ত' আশীর্ব্বাদ নহে, 'কৃষ্ণের কৃপা হউক্'—ইহারই নাম আশীর্ব্বাদ। 'বিষ্ণুভক্তি লাভ হউক্'—এই আশীর্ব্বাদই অক্ষয় ও অব্যয়। অতএব এইরূপ আশীর্ব্বাদ করা তোমার উচিত নহে।"

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল,—"পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইলাম। আজকাল লোককে ভাল বলিলে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসে! কোথায় আমি ছেলেটীকে মনের সন্তোষে উত্তম আশীর্ব্বাদ করিলাম, আর সে তাহাতে দোষ ধরিল! পৃথিবীতে জন্মিয়া যাহার সুন্দরী কামিনী-সম্ভোগ ও ধন-দৌলত লাভ না হইল, তাহার জীবনই বৃথা! তোমার শরীরে যদি 'বিষ্ণুভক্তি' হয়, আর তোমার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে তুমি কি খাইয়া বাঁচিবে?"

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"লোক নিজ-নিজ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। ধন-জনের জন্য কামনা করিয়াও ত' লোকে তাহা পায় না। শরীরকে ভাল করিবার বহু চেষ্টা করিলেও শরীরে অলক্ষিতভাবে রোগ প্রবেশ করে। এ সকল কথা সকলে বুঝে না। বিষয়সুখে লোকের রুচি দেখিয়া বেদ নানাপ্রকার কাম্যকর্ম্মের প্ররোচনা দিয়া থাকেন। শ্রীগঙ্গাস্নান ও শ্রীহরিনাম করিলে ধন-পুত্র পাওয়া যাইবে, এই লোভেই যদি বিষয়ী লোক শ্রীগঙ্গাস্নান ও শ্রীহরিনাম করিতে উদ্যত হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীগঙ্গা ও শ্রীহরিনামের প্রকৃত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তবে তাহাদের মঙ্গল হইবে—এই উদ্দেশ্যেই বেদে কর্ম্মের নানা ফলশ্রুতি বর্ণিত

আছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কোন উৎকৃষ্ট বর নাই।"*

মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া দারি-সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বালক ও নিজকে বহুতীর্থ-পর্য্যটক পরম জ্ঞানী বলিয়া কল্পনা করিল!

অনধিকারী ব্যক্তির নিকট মহাপ্রভুর ঐ সকল কথার আদর হইবে না বুঝিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দারি-সন্ন্যাসীকে মৌখিক সম্মান দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং সন্ন্যাসীর গৃহে দুগ্ধ-ফলাদি ভোজন করিলেন। দারি-সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ইঙ্গিতে কিছু মদ্যপানের জন্য অনুরোধ করিল। শ্রীমহাপ্রভু ইহা শুনিবা-মাত্র 'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করিয়া আচমন করিলেন এবং অতি সত্বর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন ও গঙ্গা সন্তরণ করিয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিলেন।

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

স্ত্রৈণ-মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক-বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৯৫

"এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর এই কথা মহাপ্রভুর চরিত্রে সর্ব্বদাই দেখা যায়। দারি-সন্ন্যাসীর গৃহে আসিয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রকৃত আশীর্ব্বাদ কি, তাহা জানাইলেন; আরও জানাইলেন,—ভগবান্ কখনও কখনও স্ত্রৈণ, মদ্যপায়ী প্রভৃতি পাপী ব্যক্তিগণকেও স্বেচ্ছায় কৃপা

* চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৬০-৬৯

করিতে পারেন,—যদি তাহারা ঐ সকল পাপ চিরতরে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলাকে স্বীকার করেন না, সেই সকল নিন্দক, জ্ঞানী যতই ত্যাগী ও পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না। এই স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর একটি শিক্ষা এই যে, যাহারা মদ্যপান ও পরস্ত্রী-সঙ্গ প্রভৃতি পাপ-কার্য্য করে, তাহাদের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। মদ্যপানের নাম শুনিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণু-স্মরণ-পূর্ব্বক গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তের চরিত্র কখনও পাপযুক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্য বা নেশার বশীভূত নহেন।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু—ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদ লাভের জন্য জ্ঞানকে বড় বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্যের পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। তখন অদ্বৈত-প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন,—"তুমি আমাকে পূর্ব্বে সম্মান দিতে বলিয়া তোমার কৃপা-দণ্ড লাভের জন্যই আমি এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, আমি জন্মে-জন্মে যেন তোমার দাস থাকিতে পারি।"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবানন্দ পণ্ডিত

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিত নামে মোক্ষকামী এক পরম সুশান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দেবানন্দ আজন্ম সংসারে বিরক্ত, তপস্বী ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের মহা-অধ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ভাগবত পাঠ করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ছিল না—তাঁহার হৃদয়ে মুক্তির বাসনা প্রবল ছিল। দৈবাৎ একদিন মহাপ্রভু সেই পথে গমনকালে দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

* *,—বেটা কি অর্থ বাখানে !
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥

* * *

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায় ॥

*

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২১শ অঃ

মহাপ্রভুর এই লীলাতে ভাগবত-পাঠের অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে। জাগতিক পাণ্ডিত্য বা উচ্চবংশে জন্ম, কিংবা জাগতিক পুণ্য-পবিত্রতা থাকিলেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের সিদ্ধান্ত বুঝা যায় না। ভগবানে একান্ত সেবা-বৃত্তি-দ্বারাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থ উপলব্ধি হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের চরণে দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ হইয়াছিল। একদিন ভাগবত-পাঠকালে দেবানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে সাধারণ ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীবাসের অসম্মান করেন। তিনি গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মনে করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের ঠাঁই যা'র হয় অপরাধ।
কৃষ্ণকৃপা হইলেও তা'র প্রেমবাধ॥
—চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৮

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশচীমাতা ও বৈষ্ণবাপরাধ

প্রকৃত সাধুর নিন্দার ন্যায় অপরাধ আর কিছুই নাই। অনেক প্রকারে সাধুর নিন্দা হয়। সাধু বা বৈষ্ণবকে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে সাধুর নিন্দা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ, বৈষ্ণবের ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বের দোষ, পূর্ব্ব-দোষের

ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ, দৈবোৎপন্ন দোষ, তাঁহার শরীরগত দোষ বা প্রকৃতিগত দোষ, যেমন—তাঁহার জাতি-বর্ণ প্রভৃতি এবং কদাকার বা কর্কশ-স্বভাবাদি লইয়া হরিনাম-ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিকে নিন্দা করিলে 'বৈষ্ণবাপরাধ' হয়। বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনামের কৃপা পাওয়া যায় না, কৃষ্ণ-কৃপা হইলেও প্রেম-লাভ হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দরও নিজ-জননীকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র আত্মমঙ্গল-কামী জগৎকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীবিষ্ণু-গৃহের খাটের উপর উঠিয়া নিজের স্বরূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন ও সকলকে বর প্রদান করিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত শ্রীশচীমাতাকে প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি এ কথা মুখে আনিও না। আমি মাতা-ঠাকুরাণীকে প্রেমভক্তি প্রদান করিতে পারি না ; কারণ, বৈষ্ণবের নিকট তাঁহার অপরাধ আছে।" ইহা শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো ! তোমার এ কথা শুনিয়া আমাদের দেহ-ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। তোমার ন্যায় পুত্রকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার কি প্রেমযোগে অধিকার নাই ! শচীমাতা সকলের জীবনস্বরূপ। তুমি বঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি দান কর। পুত্রের নিকট আবার মাতার কি অপরাধ থাকিতে পারে ? আর যদি অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ হইয়াই থাকে, তবে তাহা খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে কৃপা কর।"

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি অপরাধ খণ্ডনের উপায়মাত্র বলিতে পারি, বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা আমার

নাই। যে বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয়, তিনি কৃপা করিয়া ক্ষমা করিলেই সেই অপরাধের মোচন হইতে পারে, নতুবা নহে। অম্বরীষের নিকট দুর্ব্বাসার অপরাধ হইয়াছিল, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। অম্বরীষ যখন ক্ষমা করিলেন, তখনই দুর্ব্বাসা অপরাধ হইতে মুক্তি পাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট মাতা-ঠাকুরাণীর অপরাধ হইয়াছে। তিনি ক্ষমা করিলে মাতার প্রেম-লাভের যোগ্যতা হইবে। মাতা-ঠাকুরাণী যদি আচার্য্যের চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করেন, তবেই আমার আজ্ঞায় তাঁহার প্রেমভক্তি লাভ হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তখনই সকলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া এই সকল কথা বর্ণন করিলেন। আচার্য্য এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন,—"তোমরা কি আমাকে বধ করিতে চাহ? যাঁহার গর্ভসিন্ধুতে আমার প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইয়াছেন, তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার পুত্র; আমি তাঁহারই চরণ-ধূলির অধিকারী। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী। শ্রীদেবকী ও শ্রীযশোমতী যে বস্তু, শ্রীশচীমাতাও সেই বস্তু।"

শ্রীশচীমাতার এইরূপ স্বরূপ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতা-চার্য্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ হইল। ইহাই উত্তম সুযোগ ও অবসর বুঝিয়া শ্রীশচীমাতা সেই সময় আচার্য্যের চরণধূলি শিরে গ্রহণ করিলেন ও প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বৈষ্ণবগণ উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া

উঠিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এতক্ষণে মাতা-ঠাকুরাণীর বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন হইল ও তাঁহার বিষ্ণুভক্তি লাভ হইল।"

এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের ভাষায় উদ্ধার করিতেছি,—

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥
অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি' গণি॥

শ্রীশচীমাতা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বস্তুতঃ কোন নিন্দা করেন নাই; কেবলমাত্র অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসময়ী শ্রীশচীদেবী নিজ-পুত্র বিশ্বরূপ পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গ লাভ করিয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরও অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনাদিতে প্রমত্ত থাকিয়া সংসার-সুখে উদাসীন হইয়াছেন, এইরূপ আলোচনামাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ইহার দ্বারাও শ্রীশচীদেবীর অপরাধাভাসের অভিনয় ঘটিয়াছিল, ইহা লোকশিক্ষার্থ প্রদর্শন করিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে প্রতি-নিশায় সংকীর্ত্তন করেন শুনিয়া একজন ব্রহ্মচারীর সেই সংকীর্ত্তন-নৃত্য দেখিবার সাধ হইল। ব্রহ্মচারী আকুমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক কেবল দুগ্ধপান ও ফল ভক্ষণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেন। তাঁহার জীবনে কোন পাপ-স্পর্শ হয় নাই। তিনি 'দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী,' বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্য দর্শনের জন্য শ্রীবাসের গৃহে স্থান ভিক্ষা করিলেন। শ্রীবাস, ব্রহ্মচারীর একান্ত অনুরোধে এবং তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, তপস্যা ও নিষ্পাপ-জীবন স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচারীজীকে গৃহে প্রবেশের অধিকার দিয়া গুপ্ত-ভাবে অবস্থান করিবার কথা বলিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত হরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণ পরেই বলিতে লাগিলেন,—"আজ যেন আমার হৃদয়ে আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, মনে হয়, এখানে কোন বহিরঙ্গ লোক প্রবেশ করিয়াছে।" শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,— "এখানে কোন অসৎ লোক প্রবেশ করে নাই, একজন নিষ্পাপ আকুমার-ব্রহ্মচারী, দুগ্ধপায়ী, তপস্বী ব্রাহ্মণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত

আপনার সংকীর্ত্তন ও নৃত্য শ্রবণ ও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।” ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন,—

দুই ভুজ তুলি’ প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুঞি তা’র, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন॥
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি, তা’রা মোরে কেমতে পাইল॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনা মোর শরণ লইলে নাহি পার॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৪২-৪৬

ভয়ে ও লজ্জায় ব্রহ্মচারী শ্রীবাসের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গেলেন; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর উপর ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে মনে মনে ভাবিলেন,—“আমার আজ পরম সৌভাগ্য! আমি যে অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহারই দণ্ড পাইলাম; কিন্তু আমি আজ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ দর্শন করিলাম।”

অন্যান্য বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় ব্রাহ্মচারীর মহাপ্রভুর বা তাঁহার ভক্তগণকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাই তিনি অচিরে মহাপ্রভুর কৃপা পাইলেন। পরে মহাপ্রভু ব্রহ্মচারীকে

নিজ-সমীপে আহ্বান করিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপন-পূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিলেন—

প্রভু বলে,—তপঃ করি' না করিহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৫৪

অনেকে নিজের ব্রহ্মচর্য্য, আভিজাত্য, তপস্যার অভিমানে গর্ব্বিত হইয়া মনে করেন, ভগবদ্ভক্তগণ কেনই বা তাঁহাদিগকে হরি-সংকীর্ত্তন প্রভৃতিতে অধিকার বা ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিবেন না? কিন্তু লোক-শিক্ষক মহাপ্রভু ঐ লীলাদ্বারা এইরূপ বিচারের অসারতা শিক্ষা দিলেন। আরও জানাইলেন যে, কেবল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস বা নিষ্পাপ জীবনের দ্বারাই মহাপ্রভুর কৃপা বা ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না। সুনীতি বা দুর্নীতি কোনটিই ভগবদ্ভক্তির সোপান বা অঙ্গ নহে। ভগবদ্ভক্তি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের অহৈতুকী কৃপার দ্বারাই লাভ হয়।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁদকাজী

মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম-প্রচারের প্রারম্ভে শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকট-বর্ত্তী নগরবাসিদিগকে প্রথমে হস্তে করতালির সহিত 'হরিনাম' করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপের দ্বারে-দ্বারে মৃদঙ্গ-করতালাদি-বাদ্যের সহিত সংকীর্ত্তনের প্রচার আরম্ভ হইল। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পর হইতে নবদ্বীপের ফৌজদার চাঁদকাজীর সময় পর্য্যন্ত 'হিন্দুয়ানী' অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ ভয়ে কখনও ভগবানের নাম প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহসী হইতেন না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দ্দেশানু-সারে যখন নবদ্বীপের ঘরে-ঘরে মৃদঙ্গ-করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইতে থাকিল, তখন নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসন-কর্ত্তা চাঁদকাজী ইহা জানিতে পাইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী জনৈক কীর্ত্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। ভবিষ্যতে কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত এবং তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট করা হইবে,—এইরূপ ভয়ও তিনি দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজী নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই স্থান তখন হইতে 'খোলভাঙ্গার

ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

নগরবাসী ক্ষুব্ধ সজ্জনগণ এই সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলকে আরও প্রবলভাবে সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। নগরিয়াগণের অন্তরে কাজীর ভয় রহিয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেইদিনই সন্ধ্যাকালে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং সমস্ত নগরবাসীকে একত্রিত করিয়া তিনটি বিভিন্ন সম্প্রাদায়ে বিরাট্ কীর্ত্তনমণ্ডলী গঠন করিলেন; পরে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া নবদ্বীপ-নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে তাঁহার গৃহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু কাজীকে বাহিরে ডাকাইয়া আনাইয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী মহাপ্রভুর মুখে ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর হইলেন। কাজী বলিলেন,—"যে-দিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবদ্বীপবাসিদিগকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই রাত্রেই মানুষের মত শরীর ও সিংহের মত মস্তকবিশিষ্ট এক মহাভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি তাঁহার বুকের উপরে একলম্ফে আরোহণ করিয়া দন্ত কড়মড় করিতে করিতে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিতেছিলেন,—"তুমি কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়াছ, আমি তোমার বক্ষ বিদারণ করিব,—তোমাকে সবংশে বধ করিব।" কাজী ইহা বলিয়া মহাপ্রভুকে নিজের বক্ষে নখের আঁচড়

দেখাইলেন। কাজী আরও বলিলেন,—সেই দিন তাঁহার এক পেয়াদা—যাহাকে তিনি কীর্ত্তনে বাধা দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার (কাজীর) নিকট আসিয়া বলিয়াছে যে, কোথা হইতে হঠাৎ অগ্নি-উল্কা আসিয়া তাঁহার মুখে লাগিয়া তাঁহার সমস্ত দাড়ি পুড়াইয়া মুখ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই পেয়াদা তাঁহাকে আরও জানাইয়াছে,—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, তোমরা কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, রামদাস, হরিদাস—এইরূপ নাম-পরিচয়ে 'হরি হরি' বলিয়া থাক ; 'হরি হরি' শব্দে 'চুরি করি, চুরি করি',—এই অর্থ হয় ; তাহাতে বোধ হয়, অপরের গৃহের ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমরা 'হরি হরি' উচ্চারণ কর। যে-দিন আমি তাঁহাদের সহিত এরূপ পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'হরি হরি' বলিতেছে।" কাজী আরও জানাইলেন,—ইহার পর একদিন কতকগুলি ('পাষণ্ডী') হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিয়াছে,—"নিমাই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে ; পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজায় রাত্রি জাগরণ করা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম-মত প্রবর্ত্তন করিয়াছে! মৃদঙ্গ-করতালের সহিত সময়ে-অসময়ে উচ্চ-কীর্ত্তনে তাহাদের কাণে তালা লাগিতেছে, রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত ও নগরে শান্তিভঙ্গ হইতেছে! নিমাই নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখন আবার সর্ব্বত্র আপনাকে 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করিতেছে! ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল, নবদ্বীপ উৎসন্ন

হইল ! ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুর ধর্ম্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে মনে লইবারই ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু এই নিমাই বিপরীত মত প্রচলন করিয়া সমস্ত নবদ্বীপের শান্তিভঙ্গ করিতেছে ! অতএব আপনি যখন আমাদের গ্রামের শাসনকর্ত্তা, তখন ইহার একটা ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া অবিলম্বে তাহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিন।"

মহাপ্রভু কাজীর মুখে শ্রীহরিনাম-উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন। যাহাতে নবদ্বীপে আর সঙ্কীর্ত্তন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, মহাপ্রভু কাজীর নিকট এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,— "আমার বংশের কেহই কোনদিন কীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না। আমি আমার বংশে এই 'তালাক' * দিয়া যাইব।" অদ্যাপি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে কাজীর বংশধরগণ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিলে এই চাঁদকাজীর প্রাচীন সমাধি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের গভর্ণিংবডি (পরিচালক-সমিতি) এই চাঁদকাজীর সমাধি-পাট রক্ষা করিতেছেন।

---

* দিব্য বা শপথ।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ-প্রদর্শন

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস-অঙ্গনে গোপীভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কিছুতেই নৃত্য সম্বরণ করিতেছেন না দেখিয়া ভক্তগণ সকলে মিলিয়া আচার্য্যকে স্থির করাইলেন। শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীরামাই স্নানার্থ গমন করিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রেমভরে শ্রীবাস-অঙ্গনে পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আচার্য্যের এই আর্ত্তির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার গৃহে পৌঁছিল। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে লইয়া শ্রীবিষ্ণু-মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিলেন এবং আচার্য্যের কি অভিলাষ আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন,—"প্রভো! তুমি শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীঅর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলে, তাহা আমাকে দেখাও।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে এই বিশ্বরূপের বর্ণনা আছে। বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিবার প্রাক্কালে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

> পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
> নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥
> পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
> বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥

ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

—গীতা ১১।৫-৮

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ। আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানাবিধ দিব্য রূপ ও নানা বর্ণের আকৃতি প্রত্যক্ষ কর। হে ভারত! আদিত্যসমূহ, বসুসমূহ, রুদ্রসমূহ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসমূহ ও অনেক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপ দেখ। সচরাচর জগৎ ও যাহা কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই আমার এই ঐশ্বর্য্যময়-স্বরূপের মধ্যে অবস্থিত। অতএব হে অর্জ্জুন! সে সমুদয়ই তুমি আমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একদেশে দর্শন কর। তুমি আমার নিত্য-পার্ষদ। তোমার স্বাভাবিক যে নিরুপাধিক প্রেম-চক্ষু, তাহার দ্বারা কৃষ্ণ-স্বরূপ দর্শন হয়। এই কৃষ্ণস্বরূপই আমার নিত্য-স্বরূপ, আর আমার যোগৈশ্বর্য্যময় বিরাট্ রূপটী প্রাকৃত ও অনিত্য; কারণ, তাহা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব তোমাকে আমি দেবতাগণের উপযোগী ঐশ্বর্য্যময় দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার ঐশ্বর্য্যময়-স্বরূপ দর্শন কর।"

নিত্যসিদ্ধ নিজ-পার্ষদ অর্জ্জুনকে যেরূপ দেবতাগণের উপযোগী চক্ষু দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যময় রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিত্য-দ্বিভুজ-রূপ সঙ্গোপন করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট তাহাই করিলেন।

নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে অন্তর্যামী শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরের বিষ্ণুগৃহের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া নিজের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর দ্বারোন্মোচন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

জড়জগতের যাবতীয় চিন্তাস্রোতের প্রকাণ্ড মূর্ত্তিই বিশ্বরূপ; তাহা নিত্য নহে, তাহা বিষ্ণুর অবতারের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পার্ষদ ও লীলার সহিত সমান নহে। অর্জ্জুন এই বিচারই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বরূপের উপসংহার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয় দ্বিভুজরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বিশ্বের প্রকাণ্ড প্রাকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিবার অভিলাষের অভিনয় ও মহাপ্রভুর তাহা প্রদর্শনের মধ্যে একটি গূঢ় রহস্য আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক যুগেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ও অনুগতের পরিচয় প্রদান করিয়া কতকগুলি লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর সেবক বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। বিশ্বরূপ-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, বিশ্বের উপাদান-কারণের অধীশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুরও প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভু। বিশ্বের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি গৌরকৃষ্ণস্বরূপের একদেশে অবস্থিত।

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'দুঃখী,' না 'সুখী' ?

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় শুনিতে পাই,—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৮

—এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বত্রই তাঁহার আচরণের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন,—"যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।" সত্য সত্যই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস গাহিয়াছেন,—

শ্রীবাসের দাস-দাসী যাঁহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাঁহা না জানিল॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল॥
যাবৎ কাল গীতা-ভাগবত সবে পড়ে।
কেহ বা পড়ায়, কারও ধর্ম্ম নাহি নড়ে॥
কেহ কেহ পরিগ্রহ কিছু নাহি লয়।
বৃথা আকুমার-ধর্ম্মে শরীর শোষয়॥
বড কীর্ত্তি হইলে চৈতন্য নাহি পায়।
ভক্তি-বশ সবে প্রভু—চারি বেদে গায়॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৭৭-২৭৮,২৭৪-২৭৫, ২৮০

শ্রীবাসের বাড়ীর দাসী, মুরারি গুপ্তের বাড়ীর চাকর যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য পালন-পূর্ব্বক শরীর শোষণ করিয়া, অপরের দানাদি গ্রহণে বীতস্পৃহা প্রদর্শন করিয়া, গীতার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও অনেক তপস্বী, কুলীন, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ধনবান্ ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন নাই। লোকের নিকট কীর্ত্তিমান্ হইলেই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করা যায় না। একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিতেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বশীভূত হন, ইহারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য আমরা শ্রীবাসের বাড়ীর এক দাসীর চরিত্রে দেখিতে পাই।

শ্রীবাস পণ্ডিত সন্ন্যাসী ছিলেন না, তথা-কথিত আকুমার ব্রহ্মচারীও ছিলেন না, তিনি ছিলেন,—সহজ সরল, ঐকান্তিক হরিসেবাপরায়ণ গৃহস্থ। তিনি ভক্তিদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এইরূপ বশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গৃহে প্রভুর নিত্য সংকীর্ত্তন-বিলাস হইত। সংকীর্ত্তনের পর যখন মহাপ্রভু ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীবাস অঙ্গনে উপবেশন করিতেন, তখন কোন কোন দিন ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরেই স্নান করাইয়া দিতেন। যতক্ষণ মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন, ততক্ষণ শ্রীবাসের গৃহের এক দাসী মহাপ্রভুর স্নানের জন্য গঙ্গা হইতে বহু কলসী জল বহন করিয়া লইয়া যাইত। সেই দাসীর নাম ছিল—'দুঃখী'। 'দুঃখী' গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী চতুর্দ্দিকে সারি করিয়া রাখিয়াছেন দেখিয়া একদিন মহাপ্রভু পণ্ডিত শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রত্যহই কে গঙ্গা হইতে এই সকল জল আনয়ন করিয়া থাকে ?" পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো !

'দুঃখী' এই সেবাটি করিয়া থাকে।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"আজ হইতে তোমরা আর কেহই তাঁহাকে 'দুঃখী' বলিও না, সকলে তাঁহাকে 'সুখী' বলিয়া ডাকিও। এইরূপ ভক্তিমতীর কিছুতেই 'দুঃখী' নাম থাকা যোগ্য নহে। যিনি বৈষ্ণবের গৃহের পরিচারিকা, বৈষ্ণব-সেবাই যাঁহার ব্রত, পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় সুখী আর কে?"

শ্রীবাসের পরিচারিকার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আশীর্ব্বাদ-বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হইলেন এবং সেইদিন হইতেই তাঁহাকে 'সুখী' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও আর সেই মহা-ভাগ্যবতী গৌর-সেবিকার প্রতি দাসী-বুদ্ধি না করিয়া নিত্য-গৌরসেবিকারূপে দর্শন করিতে লাগিলেন।

পাঠক! এই স্থানে শ্রীবাসের দাসীর ভাগ্যের সহিত শ্রীবাসের শাশুড়ীর ভাগ্যের তুলনা করুন। দাসী হইয়াও অকপটতা ও অহৈতুকী সেবাবৃত্তির বলে একজন পরমসুখী হইলেন, আর শ্রীবাসের শাশুড়ীর অভিমান করিয়াও আর একজন শ্রীবাসের গৃহ হইতে বিতাড়িত ও মহা-দুঃখী হইলেন। দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারীর ন্যায় দাসী কি কোন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন? না, তাঁহার কোন ধন, কুল, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, তপস্যা ছিল? তাই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥
দাসী হই যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥"

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি

শ্রীবাস-পণ্ডিত শুদ্ধভক্তগণের আদর্শস্বরূপ। কিরূপভাবে বৈষ্ণব-গৃহস্থ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন-বিলাসের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন, সেই সর্ব্বোত্তম আদর্শ শ্রীবাস-পণ্ডিত গৃহস্থ-লীলার অভিনয় করিয়া জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শাস্ত্রে 'গৃহস্থ' ও 'গৃহব্রত'—এই দুইটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা হরিসেবাপরায়ণ গৃহস্থ, তাঁহাদের আত্মা, দেহ, গৃহ, পুত্র, পরিজন সমস্তই কৃষ্ণসেবার উপকরণ, তাঁহাদের সংসার কৃষ্ণের সংসার। আর যাহারা গৃহব্রত বা গৃহমেধী, তাহাদের ভোগের সংসার—মায়ার সংসার। তাহারা দেহ-গেহাদিতে আসক্ত হইয়া পুণ্য ও পাপের ভোক্তৃরূপে সুখ ও দুঃখের নাগরদোলায় ঘূর্ণিত হয়।

গৃহস্থের পক্ষে ভগবদর্চ্চন কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রৌঢ়াধিকারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মনিয়োগ ও পরিজনবর্গকেও সেই পথের অনুকূল উপকরণরূপে পরিণত করাই আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। বিশ্বে যে শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব-গৃহস্থের লীলাভিনয়কারী শ্রীবাসের ভজনময় গৃহ হইতেই প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার অখিল চেষ্টা সেই

সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেরই ইন্ধন-স্বরূপ হইয়াছে। অতএব শ্রীবাসের গৃহ, ভোগের আগার নহে, তাহা ভূলোকে গোলোকের অবতার।

একদিন শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসাদি ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তন-বিলাসে প্রমত্ত ছিলেন। অকস্মাৎ ব্যাধিযোগে শ্রীবাসের পুত্র শ্রীবাসের গৃহেই পরলোক-গমন করিলেন। পুরনারীগণ শোকে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীবাস অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি ইহাতে অধৈর্য্য হইবেন কেন? তাই 'পরম-গম্ভীর মহাতত্ত্বজ্ঞানী' ভক্তরাজ শ্রীবাস নারীগণকে এইরূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন,—"তোমরা শান্ত হও, ক্রন্দন করিও না। যাঁহার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে মহাপাতকীও শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করেন, সেই প্রভু সপার্ষদ সাক্ষাদ্ভাবে এই স্থানে নৃত্য করিতেছেন, এই সময় যাঁহার পরলোক-গমন হইয়াছে, তাঁহার জন্য কি শোক করিতে হয়? যদি কোন কালে এই শিশুর মত ভাগ্য পাই, তবে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব। যদি বল, তোমরা সংসারধর্ম্মে আসক্ত বলিয়া শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছ না, তবে বলি, ক্রন্দনের অনেক সময় আছে। এখন তোমাদের ক্রন্দনে যেন মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্য-সুখের কোনও রূপে বাধা না হয়। যদি তোমাদের কলরব শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনরূপে বাহ্যদশা লাভ করেন, তবে নিশ্চয় জানিও আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিব।"

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরনারীগণ সকলে স্থির হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পুনরায় মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া নিরুদ্বেগে ও পরমানন্দে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে ভক্তগণ পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, পণ্ডিতের পুত্র পরলোক-গমন করিয়াছেন, তথাপি কেহ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু স্বয়ংই বলিলেন,—"আজ যেন আমার চিত্ত কিরূপ করিতেছে! মনে হয়, পণ্ডিতের গৃহে কোন দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।" শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো! যে-স্থানে তুমি সানন্দে নৃত্য করিতেছ, সে-স্থানে আবার কি দুঃখ হইতে পারে?"

অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তির বৃত্তান্ত বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতক্ষণ পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে?" ভক্তগণ বলিলেন,—"আড়াই প্রহর হইবে। কিন্তু পণ্ডিত আপনার সংকীর্ত্তনানন্দ-ভঙ্গের ভয়ে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই।" এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,— "আমি এইরূপ ভক্তের সঙ্গ কিরূপে পরিত্যাগ করিব!"

পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৫২

—ইহা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ইঙ্গিতগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ

সকলেই চিন্তাকুল হইলেন,—"না জানি, মহাপ্রভু গৃহস্থ-লীলা পরিত্যাগ করিয়া অচিরেই সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করেন!"

পরলোকগত শিশুর সৎকারের জন্য সকলে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু মহাপ্রভু মৃতশিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি শ্রীবাসের ঘর পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য অন্যত্র যাইতেছ?"

কি আশ্চর্য্য! মহাপ্রভুর কৃপা-প্রভাবে মৃতশিশুর মুখেও তত্ত্ব-কথা বহির্গত হইল! শিশু বলিতে লাগিল,—"প্রভো! আপনি যাহার প্রতি যেরূপ বিধান করেন, উহার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহার আছে? আমাকে বর্ত্তমানে যে-স্থানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি তথায়ই গমন করিতেছি। যতদিন পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য ছিল, ততদিন সে-স্থানে বাস করিলাম, এখন আবার অন্য স্থানে যাইতেছি। সপার্ষদ আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি নমস্কার। আপনি আমার শত অপরাধ নিজগুণে মার্জ্জনা করুন।"

ইহা বলিয়া শিশু নীরব হইল। মৃতপুত্রের মুখে এইরূপ অপূর্ব্ব তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস-গোষ্ঠী পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন। শ্রীবাস পরিবারবর্গের সহিত মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর চরণে অহৈতুকী প্রেমভক্তি যাচ্ঞা করিলেন।

পাঠক, শ্রীবাসের এই আদর্শের দ্বারা মহাপ্রভু আমাদিগকে যে মহতী শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সাধারণ গৃহব্রত মনুষ্য ও হরিভজনপরায়ণ গৃহস্থের আকার বাহ্যদৃষ্টিতে

দেখিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠা সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কৃষ্ণের সংসার করেন, তিনি মায়ার সংসার করেন না। কৃষ্ণের সংসার অর্থই—নাম-সংকীর্ত্তনের সংসার। সেই সংসারের প্রভুই—শ্রীকৃষ্ণ-নাম। শুদ্ধ বৈষ্ণব কখনও নিজকে 'প্রভু' অভিমান করেন না। শ্রীকৃষ্ণ-নামকে 'সংসারের প্রভু' বলিয়া উপলব্ধি হইলে শোক-মোহাদি-ধর্ম্ম আক্রমণ করিতে পারে না, তখন সমস্তই কৃষ্ণের সেবার অনুকূল-ব্যাপাররূপে দৃষ্ট হয়। শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় শরণাগত আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহস্থের কিরূপ চিত্তবৃত্তি হওয়া উচিত, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বিপদে বা শোকে মুহ্যমান না হইয়া মহাপ্রভুকে জানাইয়াছেন,—

ওহে প্রাণেশ্বর, এ-হেন বিপদ,
প্রতিদিন যেন হয়।
যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে,
আসক্তি বাড়িতে রয়॥
বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল,
যে-দিন তোমারে স্মরি।
তোমার স্মরণ- রহিত যে-দিন,
সে-দিন বিপদ হরি॥"

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সূচনা

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিজের ঘরে বসিয়া কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা গোপীর ভাবে বিরহ-ব্যাকুল-হৃদয়ে 'গোপী, গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন পাষণ্ড-প্রকৃতির ছাত্র মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিল,—"আপনি কৃষ্ণনাম না করিয়া 'গোপী, গোপী',—এইরূপ স্ত্রীলোকের নাম উচ্চারণ করিতেছেন কেন ? 'গোপী' নাম করিলে কি পুণ্য হইবে ?" এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপ করিতে লাগিলেন, দুর্ভাগা ছাত্র তাহা বুঝিতে পারিল না। গোপীভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষপাতী কোনও ব্যক্তিজ্ঞানে 'ঠেঙ্গা' লইয়া মারিবার জন্য ক্রোধভরে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ছাত্রটি পলায়ন করিল। ইহা শুনিয়া নবদ্বীপের যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও ছাত্র-সমাজ ক্ষেপিয়া উঠিল ও শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রহার করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

মহাপ্রভু ইহা জানিতে পারিয়া হেঁয়ালিচ্ছলে বলিলেন,—

করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরও কফ বাড়িল দেহেতে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১২১

কোথায় নদীয়াবাসীর নিত্যমঙ্গলের জন্য শ্রীহরিনাম প্রচার করিলাম, আজ কি না, তাহাদিগের জন্য ব্যবস্থিত ঔষধই তাহাদের অপরাধবুদ্ধির কারণ হইল !

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন নিত্যানন্দকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া নিজের সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প ও উহার কারণ-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি জগতের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু নবদ্বীপবাসী তাঁহার চরণে অপরাধ করিতেছে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারে ভিক্ষুক হইলে সন্ন্যাসি-বুদ্ধিতেও হয় ত' তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন ও মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

মহাপ্রভু মুকুন্দের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণমঙ্গল' গান করিতে বলিলেন এবং পরে তাঁহার নিকটও সন্ন্যাস-গ্রহণের অভি-প্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীগদাধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার নিকটও সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। গদাধর নানাভাবে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"নিমাই ! সন্ন্যাসী হইলেই কি কৃষ্ণ পাওয়া যায় ? গৃহস্থ ব্যক্তি কি বৈষ্ণব হইতে পারেন না ? তুমি অনাথিনী মাতাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে ? প্রথমেই ত' তোমাকে জননী-বধের ভাগী হইতে হইবে !"*

এইরূপে মহাপ্রভু আরও কএকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট তাঁহার সন্ন্যাসের কথা ব্যক্ত করিলেন। সকলেরই মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল ! মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইবেন শুনিয়া ভক্তগণ ক্রন্দন

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১৭২-১৭৪

করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় শচীমাতার কর্ণেও এই দারুণ সংবাদ পৌঁছিল। শচীমাতা বিলাপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাইকে কত বুঝাইলেন,

না যাইহ, না যাইহ বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।২২

শ্রীশচীমাতার বিলাপ শুনিয়া পাষাণও দ্রবীভূত হইল; কিন্তু বজ্র হইতেও কঠোর, আবার কুসুম হইতেও কোমল যাঁহার হৃদয়, সেই লোকশিক্ষক মহাপ্রভুকে তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে কেহই বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি মাতাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

আনের (১) তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম (২)॥
*   *   *   *
আমি আনি' দিব কৃষ্ণ-প্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ॥

—চৈঃ মঃ মঃ ১৪৮ পৃঃ গোঃ সং

কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনামরূপে ও শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতীর্ণ হন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচীমাতাকে বলিলেন,—"শীঘ্রই আমার দুইটি অবতার হইবে অর্থাৎ আমার শ্রীনাম ও শ্রীমূর্ত্তি পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবে।" *

(১) আনের—অপরের, (২) পরধর্ম্ম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্ম বা ভগবৎসেবাধর্ম্ম।

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।৪৭-৪৯

মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অবিলম্বেই সফল হইয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাসের পরেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরহ-ব্যথিতা হইয়া হৃদয় হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে সকলে শ্রীগৌর-নাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মাতা, পিতা ও ভার্য্যার সেবা ছাড়িয়া ভগবানের সেবা বা ভগবদ্ভক্তি প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে অনেকে অন্যায় মনে করেন; বস্তুতঃ যাঁহারা হরিসেবার মর্ম্ম বুঝেন না, তাঁহারাই ঐরূপ বিচার করেন। শ্রীহরিসেবা দ্বারাই মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেশ, সমাজ ও বিশ্বের যথার্থ উপকার করা হয়। গাছের মূলে জল দিলেই শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল—সকলই সঞ্জীবিত ও সংবর্দ্ধিত হয়। এইরূপ সন্ন্যাসের উজ্জ্বল আদর্শ ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব ও মুক্তকুলশিরোমণি শ্রীশুকদেবেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলদেব স্বামিহীনা জননী দেবহূতিকে, শ্রীশুকদেব স্বীয় পিতা শ্রীব্যাসদেবকে গৃহে রাখিয়া যেরূপ শ্রীহরিকীর্ত্তনে সর্ব্বস্ব ডালি দিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীনিমাইও—

শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১০৩-১০৪

এক সময়ে একজন ব্রাহ্মণ শ্রীবাস পণ্ডিতের রুদ্ধ-দ্বার গৃহে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-নৃত্যে যোগদান করিতে না পারিয়া অন্যদিন

মহাপ্রভুকে গঙ্গার ঘাটে পাইয়া মনের দুঃখে অভিশাপ প্রদান-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক।" মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণের এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন।* এই ঘটনার পরে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছিলেন, **জগতের লোকের অমঙ্গলসূচক অভিশাপও কৃষ্ণ-সেবার আনুকূল্যে গৃহীত হইলে তাহা আত্মার নিত্যমঙ্গল-সাধক হয়।** বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কোন অভিশাপের পাত্র হইতে পারেন না। তাঁহার ঐ লীলা জীব-শিক্ষার জন্য।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিমাইর সন্ন্যাস

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের নিকট তাঁহার সন্ন্যাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখ ও কাটোয়া-নগরে ‡ শ্রীকেশবভারতী নামক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইয়া শ্রীশচীমাতা, শ্রীগদাধর, শ্রীব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীমুকুন্দ—মাত্র এই পাঁচ-

---

* চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৬২-৬৩

‡ ই, আই, আর ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লাইনে বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া নামক রেল-ষ্টেসন। এই স্থানটী এখন গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

জনের নিকট ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বদিন মহাপ্রভু সকল ভক্তকে লইয়া সমস্ত দিন সংকীর্ত্তন করিলেন, সন্ধ্যায় গঙ্গার দর্শন ও নমস্কার করিতে গেলেন, গৃহে ফিরিয়া ভক্তগণ-বেষ্টিত হইয়া বসিলেন। সকলকে নিজের গলার প্রসাদী মালা প্রদান করিয়া বলিলেন,—

যদি আমা-প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৭-২৮

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীধর একটি লাউ হাতে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন এবং আর একজন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কিছু পরেই কিছু দুগ্ধ উপহার দিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শচীমাতাকে দিয়া দুগ্ধ-লাউ পাক করাইলেন এবং তাহা ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। শ্রীগদাধর ও শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করিয়া থাকিলেন। শ্রীশচীমাতা জানিতেন—আজ নিমাই গৃহত্যাগ করিবে। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই,—দুই চক্ষু হইতে অনুক্ষণ অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইতে আর চারি দণ্ড বাকী আছে জানিয়া মহাপ্রভু গৃহত্যাগের উদ্‌যোগ করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিতে চাহিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু একাকী গমনের ইচ্ছা জানাইলেন। শ্রীশচীদেবী নিমাইর গমনের উদ্‌যোগ বুঝিতে পারিয়া দ্বারে বসিয়া রহিলেন;

নিমাই জননীকে তখন অনেক প্রবোধ দান করিয়া ও তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া যাত্রা করিলেন। শ্রীশচীমাতা শোকের আধিক্যে জড়প্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রাতে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীশচীমাতা বহির্দ্বারে বসিয়া আছেন। শ্রীবাস, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শচীমাতা কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, কেবল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; পরে অতি কষ্টে কোনপ্রকারে বলিলেন,—"ভক্তগণই ভগবানের বস্তুর অধিকারী; সুতরাং নিমাইর যে-কিছু জিনিষ আছে, তাহা ভক্তগণ লইয়া যাইতে পারেন। আমি যথা ইচ্ছা, তথা চলিয়া যাইব।" ভক্তগণ মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ বুঝিতে পারিয়া অচেতনপ্রায় হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া সকলেই শচীমাতাকে বেষ্টন-পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। সমগ্র নদীয়ায় মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের বার্ত্তা প্রচারিত হইল; তাহা শুনিয়া পূর্ব্বের নিন্দক পাষণ্ডিগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নিমাইকে পূর্ব্বে চিনিতে না পারায় বিশেষ পরিতাপ করিতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার চব্বিশ বৎসরের শেষে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে উত্তরায়ণ-সময়ে সংক্রমণ-দিনে রাত্রিশেষে নবদ্বীপ হইতে নিদয়ার ঘাটে আসিলেন। শুনা যায়,—নদীয়ার নির্দ্দয় নিমাইর সন্ন্যাস-লীলার স্মৃতিতে এই ঘাটের নাম 'নিদয়ার ঘাট' হইয়াছে। এই ঘাটটি যেন নির্দ্দয় বা নিদয় হইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প নিমাইকে কাটোয়ায় যাইবার পথ দিয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিদয়ার ঘাটে গঙ্গা সন্তরণ-পূর্ব্বক কাটোয়া-গ্রামে শ্রীকেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, শ্রীচন্দ্রশেখর সন্ন্যাস-বিধির অনুষ্ঠানসমূহ করিতে লাগিলেন। নাপিত নিমাইর কেশ-মুণ্ডন করিতে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ অনর্গল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে দিবা প্রায় অবসান হইল। কোনপ্রকারে ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত হইলে লোকশিক্ষাগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকেশব ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্রটি বলিয়া ইহাই তাঁহার সন্ন্যাস-মন্ত্র কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীকেশবভারতী সেই মন্ত্রই মহাপ্রভুর কর্ণে দিলেন। সর্ব্বগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু বস্তুতঃ শ্রীকেশবভারতীকেই মন্ত্র প্রদান করিয়া শিষ্য করিলেন। কিন্তু জগতে সদ্‌গুরু-গ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা জানাইবার জন্য শ্রীকেশবভারতীর নিকট হইতে কর্ণে মন্ত্র শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৈরিক বসন পরিধান করিলেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার করিয়া জগতের চৈতন্য বিধান করিতেছেন বলিয়া ভগবদিচ্ছায় শ্রীকেশবভারতী শ্রীনিমাইর সন্ন্যাস-নাম রাখিলেন—**'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'**। চতুর্দ্দিকে 'জয় জয়' ধ্বনি উঠিল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পরিব্রাজকরূপে শ্রীগৌরহরি

শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই রাত্রি কাটোয়ায় যাপন করিলেন এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যকে শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়া তিনি ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রে শ্রীকেশবভারতী, পশ্চাতে শ্রীগোবিন্দ এবং সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর ও শ্রীমুকুন্দ। চলিতে চলিতে মহাপ্রভু অবন্তীদেশের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি গান* করিতে করিতে রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন ও তিন দিন ধরিয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিলনে। শ্রীনিত্যানন্দের চাতুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরের নিকট—পশ্চিম পারে আসিয়া পড়িলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্থানীয় গোপবালকগণকে গোপনে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যদি মহাপ্রভু তাহাদের নিকট শ্রীবৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন, তবে যেন তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দেয়। নিত্যানন্দের কথামত তাহারা তাহাই করিল। মহাপ্রভুও গঙ্গাকে যমুনা মনে করিয়া স্তব করিলেন। মহাপ্রভু কেবল কৌপীন-মাত্র সম্বল করিয়া চলিয়াছিলেন, আর দ্বিতীয় কোন বস্ত্র ছিল না। এমন সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নৌকায় চড়িয়া নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস লইয়া অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে

* ভা: ১১।২৩।৫৭

সেই কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইয়া নৌকাযোগে শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী শ্রীসীতাদেবী বহুবিধ ভোজ্যসামগ্রী রন্ধন করিলেন, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু তাহা শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ভোগ দিলেন। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও অহিন্দুকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার সহিত একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ-সেবা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর অবশেষ ভোজন করিবেন—এই ইচ্ছায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ভোজনের পর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিবার জন্য চেষ্টা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,-

বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥ *

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ সম্মান করিলেন।

মহাপ্রভুর এই লীলায় দুইটি শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ—তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইলেও, শ্রীব্রহ্মা-শ্রীশিবাদি দেবতা-গণ নিত্যকাল তাঁহার পাদসেবা করিলেও তিনি লোক-শিক্ষার্থ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর পাদসেবা স্বীকার করিলেন না। সাধক-সন্ন্যাসী বা সাধক-জীবের পাদসম্বাহনাদি সেবা-গ্রহণ অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মর্য্যাদা-সংরক্ষণ আচার্য্যের কর্ত্তব্য।

---

* চৈঃ চঃ মঃ ৩।১০৬

দ্বিতীয় শিক্ষা এই—শ্রীভগবানের প্রকৃত ভক্তে জাতিবুদ্ধি ও শ্রীভগবানের প্রসাদে স্থান-কাল-পাত্র-সম্পর্কে স্পর্শ-দোষ বিচার করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে পতন হয়। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর লৌকিক ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত নহেন, আর শ্রীঠাকুর হরিদাস ত' বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত অহিন্দুকুলেই আবির্ভূত; কিন্তু শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষস্থানীয় আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ-গৃহে যথেচ্ছভাবে মহাপ্রসাদ সেবা করিলেন; ইহাতে মহাপ্রভুরও সাক্ষাৎ আদেশ ছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, একমাত্র শ্রীক্ষেত্রেই মহাপ্রসাদে স্পর্শ-দোষ বিচার করিতে হয় না; কিন্তু শান্তিপুরে গৃহস্থ-লীলার অভিনয়কারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর আচরণ ঐরূপ উক্তির অসারতা প্রমাণ করিয়াছে। এই লীলা-প্রকাশেরও পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে নিজ-পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, আধুনিক যুগে যে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, মহাপ্রভুই উহার প্রবর্ত্তক,—বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে প্রথম পথ-প্রদর্শক। কিন্তু মহাপ্রভুর চরিত্রের প্রত্যেক ঘটনা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, যাঁহারা প্রকৃত পরমার্থ আশ্রয় করিয়াছেন, মহাপ্রভু একমাত্র তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই জাতিবুদ্ধি ও কেবল মাত্র মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে স্পর্শ-দোষের জাগতিক বিচার নিষেধ করিয়াছেন। নানাপ্রকার ভোগ বা সুবিধাবাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-সকল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, মহাপ্রভু সেই

সকলের প্রবর্ত্তক বা সমর্থক নহেন। তিনি পরমার্থ-সমাজেরই শিক্ষক ও নিয়ামক।

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীগৌরহরির অদ্বৈতগৃহে অবস্থান-কালে শান্তি-পুরের সমস্ত লোক তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করিতে থাকিলেন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ হইল। শ্রীমুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার-সমূহ যুগপৎ প্রকাশিত হইতে থাকিল। পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপের বহু ভক্তের সহিত শ্রীশচীমাতা দোলায় চড়িয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিলেন—সন্ন্যাসী পুত্রের সহিত শচীমাতার সাক্ষাৎকার হইল। মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে দশ দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীশচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান, নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিকীর্ত্তন এবং শ্রীশচীমাতার হস্তপাচিত দ্রব্য ভিক্ষা করিলেন। সন্ন্যাসিগণের আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি শ্রীনবদ্বীপবাসিগণকে বলিলেন,—"সন্ন্যাস করিয়া কাহারও আত্মীয়-স্বজনের সহিত নিজ-জন্মস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।"

শ্রীশচীমাতাও পুত্রের এই কথা শুনিয়া 'নিমাইর যাহাতে সুখ, তাহাই হউক', বিচার করিয়া তাঁহাকে নীলাচলে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী সকলকে নিরন্তর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথার সহিত জীবন-যাপনের উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক শান্তিপুরের ভক্তগণ ও শ্রীশচীমাতাকে বিদায় দিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীদামোদরের সহিত ছত্রভোগের পথে শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পুরীর পথে ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে

শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর হইয়া উৎকল-রাজ্যের এক সীমায় উপনীত হইলেন ; পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা-গ্রামে 'ক্ষীরচোরা শ্রীগোপীনাথ' দর্শন এবং তথায় ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরীর কথিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী ও গোপীনাথের প্রসঙ্গ বর্ণন করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী-কীর্ত্তিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ !" * শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহ অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তথায় সেই রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন পুরীর অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিয়া যাজপুর হইয়া কটকে পৌঁছিলেন। তথায় 'সাক্ষিগোপাল' ‡ শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মুখে শ্রীগোপালের ইতিহাস শ্রবণ করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বর

---

* অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

'ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ ! ওহে মথুরানাথ ! কবে তোমাকে দর্শন করিব ! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে ! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব ?

‡ তখন কটকে 'সাক্ষিগোপাল' শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। পরে পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী' গ্রামে অবস্থিত হন।

শ্রীগৌরপদাঙ্কিত শ্রীসাক্ষিগোপাল-স্থান
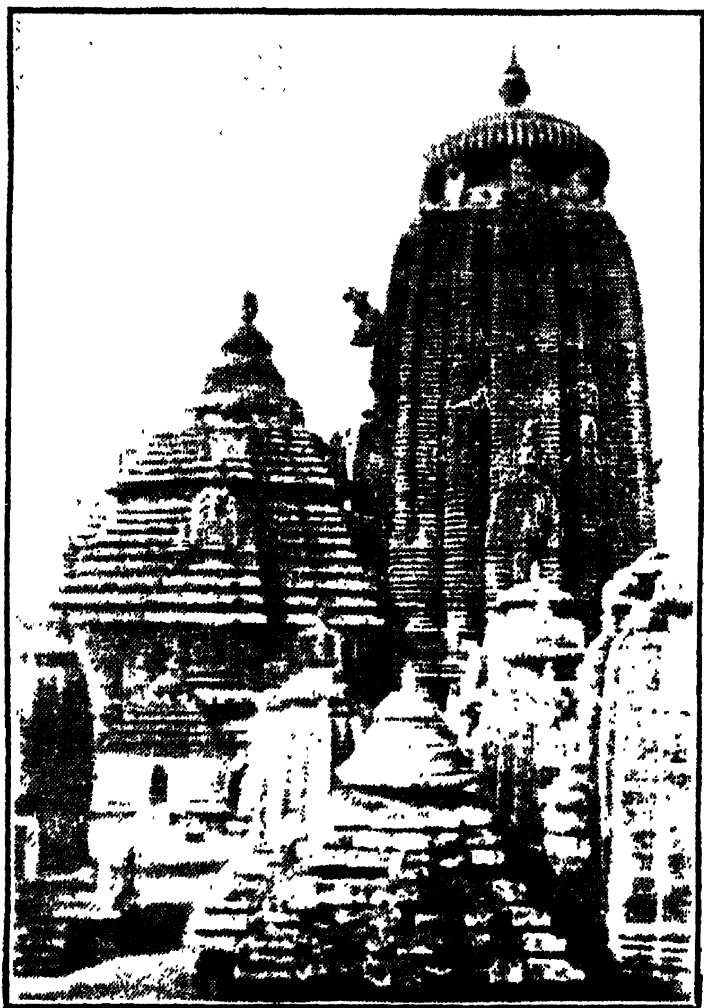
শ্রীভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির ; এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পদার্পণ করিয়াছিলেন ।
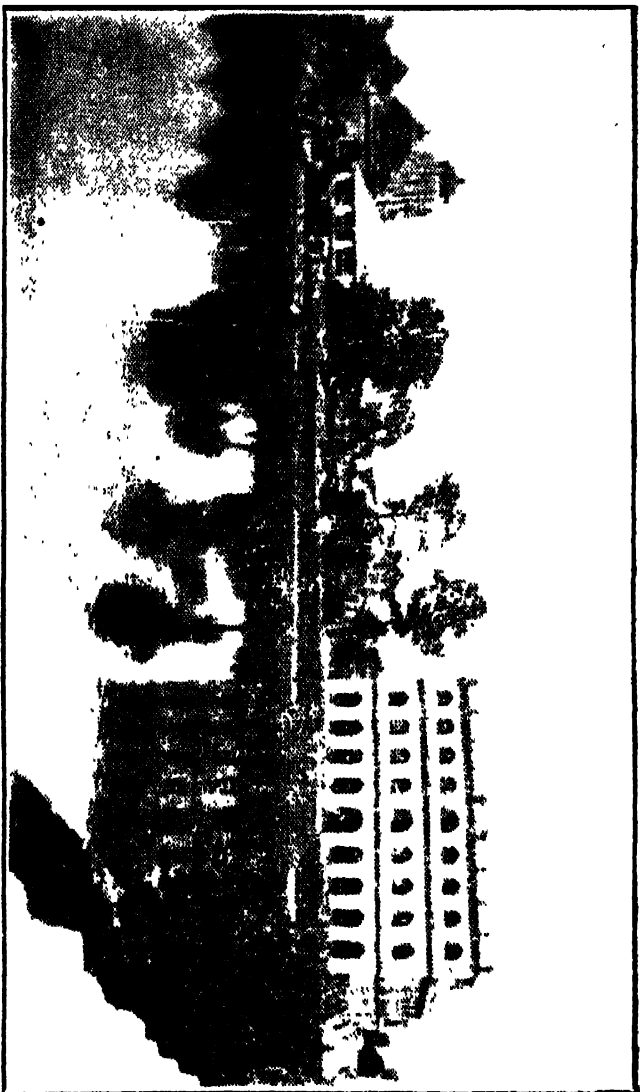
ভুবনেশ্বরে শ্রীবিন্দুসরোবরের তীরে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির ;
এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব আগমন করিয়াছিলেন।

আসিয়া শ্রীক্ষেত্রপাল শিব দর্শন করিলেন। তৎপরে কমলপুরে ভার্গী নদীর তীরে কপোতেশ্বর-শিব দর্শনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার ও তৎসম্মুখে অরুণস্তম্ভ

শ্রীনিত্যানন্দের নিকট নিজের দণ্ডটি রাখিয়া গেলেন। ভগবানের পক্ষে সাধক-জীবের উপযোগী দণ্ডাদি ধারণের কোন আবশ্যকতা

পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির
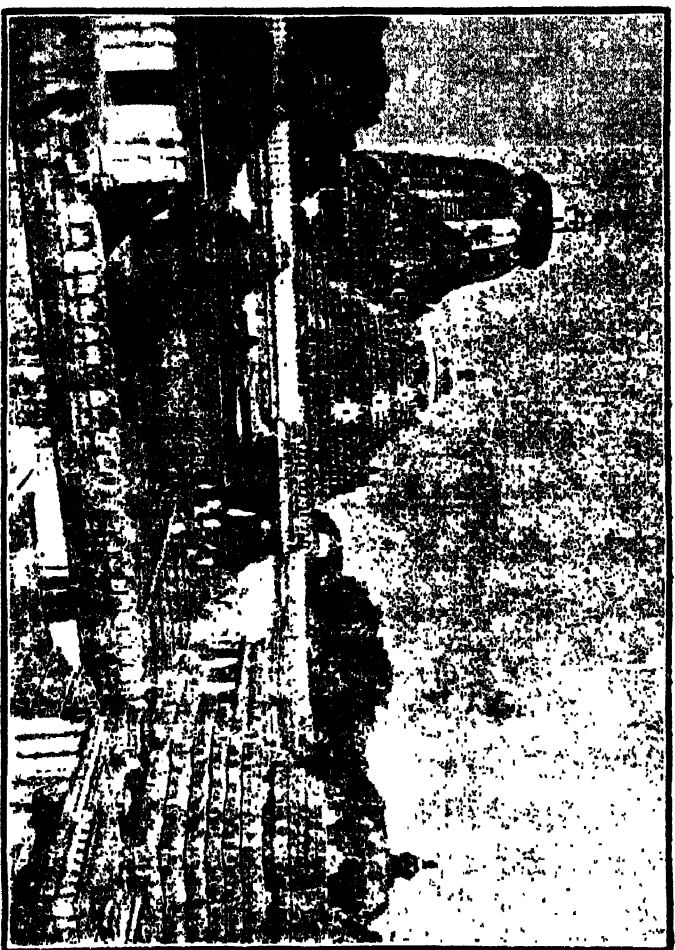
নাই,— ইহা জানাইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গীনদীতে ভাসাইয়া দিলেন।

আঠারনালার নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার দণ্ড না পাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়াই একাকী শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। মহাপ্রভুর এইরূপ বাহ্যে ক্রোধ-প্রদর্শনের গূঢ় শিক্ষা এই যে, ভগবান্ বা পরমহংস বৈষ্ণবের পক্ষে আত্মদণ্ড বিধানের প্রয়োজনীয়তা নাই বটে, কিন্তু অনর্থযুক্ত (১) সাধকের কায়মনোবাক্য দণ্ডিত করা (২) অবশ্য প্রয়োজন ; নতুবা তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীগৌরহরি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন। পড়িছা * ইহা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীগৌরহরিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। পুরীর রাজপণ্ডিত শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম তখন মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি দৈবাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহাকে পড়িছার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। সার্ব্বভৌম যুবক সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বাহ্যদশা-প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে ধরাধরি

(১) যাহাদের জগতের বস্তুতে আসক্তি আছে, ভগবানে সর্ব্বক্ষণের জন্য স্বাভাবিকী প্রীতি উদিত হয় নাই।

(২) দেহ, মন ও বাক্য—এই তিনটিকে দণ্ডিত অর্থাৎ শাসিত করিয়া হরিভজন করিবার জন্যই দণ্ড-গ্রহণ।

* শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে দারোগার ন্যায় কর্ম্মচারি বিশেষ।

করিয়া নিজ-গৃহে লইয়া আসিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই সার্ব্বভৌমের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত মুকুন্দকে দেখিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও পুরী আগমনের যাবতীয় কথা শ্রবণ করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ-ভক্তগণ সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। এদিকে সার্ব্বভৌমের গৃহে তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল। সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্বীয় মাতৃষ্বসার গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌমের সহিত গোপীনাথের মহাপ্রভু-সম্বন্ধে আলাপ হইলে গোপীনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট মহাপ্রভুকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া জানাইলেন। ইহাতে সার্ব্বভৌম ও তাঁহার ছাত্রগণের সহিত গোপীনাথের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরের তত্ত্ব কখনই জানা যায় না, জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-দ্বারাও ঈশ্বরের ভক্তি-জ্ঞান হয় না—শ্রীগোপীনাথ এই সকল কথা বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এক প্রকার নিরস্ত করিলেন।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাধারণ সন্ন্যাসি-মাত্র বিচার ও তাঁহার যৌবন-বয়স দর্শন করিয়া তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে উপদেশ করিলেন। মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত হইয়া সার্ব্বভৌমের নিকট সাতদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌনী দেখিয়া অষ্টম দিনে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—তিনি শ্রীব্যাসকৃত সূত্রগুলি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহার অর্থ অতীব পরিষ্কার; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের রচিত ভাষ্য সেই সকল সূত্রের সহজ নির্ম্মল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শঙ্করভাষ্য প্রকৃত-প্রস্তাবে বেদান্ত-বিরুদ্ধ। অসুর-গণের মোহনের জন্য ভগবানের আদেশে শিবের অবতার শঙ্করাচার্য্য ঐরূপ ভাষ্য কল্পনা করিয়াছেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই বেদান্তের প্রকৃত মত। মায়াবাদিগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক।* শ্রীমন্-মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বহু প্রমাণ-বিচার-দ্বারা এই সকল বিষয় প্রদর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার-তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন।

---

* বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥—চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৮

ইহার পর ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ" (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যকেই প্রথমে ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার তর্কশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য-বলে উক্ত শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন; মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের উক্ত ব্যাখ্যার কোনটীই স্পর্শ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐ শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। ভট্টাচার্য্য ইহাতে চমৎকৃত হইলেন। তখন তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ-পদ্মে শরণাগতি যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তখন সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রথমে চতুর্ভুজ এবং পরে দ্বিভুজ রূপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের চিত্তে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি অতি অল্পকাল মধ্যে মহাপ্রভুর স্তুতিপূর্ণ একশত শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌমের রচিত এই দুইটী শ্লোক ভক্তগণের কণ্ঠহার হইল—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ *

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৫৪

* বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহ, বিদ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্তি ও নিজ-ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেম-শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী একটি সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপা-সমুদ্র; তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ *

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৫৫

সার্ব্বভৌমের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ অলৌকিকী কৃপা দেখিয়া শ্রীগোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই আনন্দিত হইলেন। ইহার পর একদিন মহাপ্রভু প্রত্যূষে শ্রীজগন্নাথদেবের পাকাল-প্রসাদ ‡ লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে দিতে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য তখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া মাত্র শয্যা ত্যাগ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় লৌকিক স্মার্ত্তগণের জাগতিক বিচার হইতে মুক্ত হওয়ায় সেইক্ষণেই—প্রাতঃকৃত্যাদি করিবার পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর প্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

সার্ব্বভৌম একদিন মহাপ্রভুর নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি,—এই পরিপ্রশ্ন করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশ দিলেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

* কালে নিজ-ভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামক মহাপুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্তভ্রমর গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।

‡ পান্তা-প্রসাদকে পুরীতে পাকাল-প্রসাদ বলা হয়।

আর এক দিবস সার্ব্বভৌম শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেহনুকম্পাং"* শ্লোকের শেষাংশে 'মুক্তিপদে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই; 'মুক্তিপদ'-শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়।" ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া নীলাচল-বাসিগণ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং কাশীমিশ্র প্রভৃতি উৎকলবাসিগণ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যাভিমুখে

শ্রীগৌরসুন্দর মাঘ-মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন-মাসে নীলাচলে উপনীত হইলেন ও তথায় দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্র-মাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার এবং বৈশাখ-মাসে দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। একাকীই দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইবেন,—

* তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

অর্থাৎ যিনি তোমার অনুকম্পা-লাভের আশাবন্ধে স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে আত্মনিবেদনাত্মিকা প্রণতি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-লাভের যোগ্যপাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ প্রস্তাব করায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বিশেষ অনুরোধ করিয়া কৃষ্ণদাস-নামক একজন সরল ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। সার্ব্বভৌম চারিখণ্ড কৌপীন-বহির্ব্বাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন এবং গোদাবরী-নদীর তীরে শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহাপ্রভুকে প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু প্রভৃতি কএকজন ভক্ত আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভু অপূর্ব্ব ভাবাবেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুরা গোপীর ভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে চলিলেন,—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে!!

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া সকলেই 'হরিনাম' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শরণাগত ব্যক্তিমাত্রকেই শক্তিসঞ্চার করিয়া বৈষ্ণব করিলেন। সেই বৈষ্ণব আবার, স্বগ্রামে গমন করিয়া গ্রামবাসিগণকে বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দক্ষিণ-দেশের লোক বৈষ্ণব হইলেন।

শ্রীচৈতন্যের কৃপা-মহিমা নবদ্বীপ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিকতর-ভাবে প্রকাশিত হইল। এইরূপে মহাপ্রভু কূর্ম্মস্থানে * আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কূর্ম্মদেবের দর্শন ও স্তব করিলেন। সেই গ্রামে কূর্ম্ম-নামে এক গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহু শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন ও সবংশে প্রভুর চরণামৃত ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন। শ্রীগৌরহরি ব্রাহ্মণকে কৃপা করিলেন এবং আচার্য্য হইয়া অর্থাৎ নিজে আচরণ করিয়া প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—

যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-১২৯

মহাপ্রভু যাঁহার ঘরে ভিক্ষা করিতেন, তাঁহাকেই এরূপ উপদেশ ও শিক্ষা দান করিতেন। 'বাসুদেব'-নামক একজন গলিত-কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বিপ্র কূর্ম্ম-ব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়া মহাপ্রভুর কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাসুদেবকে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে মুক্ত করিয়া **'আচার্য্য'** করিলেন। শ্রীবাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' নাম হইল।

---

* বি-এন্-আর-লাইনে চিকাকোল্ রোড্ হইতে ৯ মাইল দূরে শ্রীকূর্ম্মাচলম্।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমে জিয়ড়নৃসিংহ-ক্ষেত্র* সিংহাচলে গমন করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও বন্দনা করিলেন—

শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥
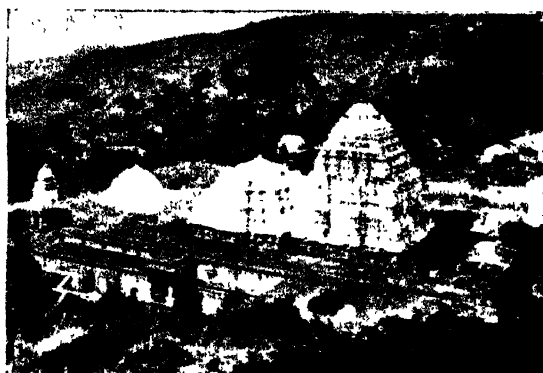
দূর হইতে সিংহাচল পর্ব্বত, জিয়ড়-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির ও
শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দিরের দৃশ্য

এই স্থানে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রাতে পুনরায় প্রেমাবেশে চলিতে চলিতে গোদাবরী-তীরে আগমন করিলেন। গোদাবরী-দর্শনে শ্রীগৌরহরির শ্রীযমুনার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল।

* বি, এন্, আর লাইনের শেষ ষ্টেসন ওয়ালটেয়ারের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেসন সিংহাচলম্ হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে সিংহাচল পর্ব্বতের উপর শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজমান। বিশেষ জানিতে হইলে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'পত্র (বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৬ই অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ২৪৪—২৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীরায়-রামানন্দ-মিলন

দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্দ্রী নগরে 'কোটিলিঙ্গম্' তীর্থের অপর পারে গোষ্পাদ বা 'পুষ্করম্' তীর্থ অবস্থিত। প্রায় ১৫০২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার সম্রাট্ গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীন বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা (Governor) রায় রামানন্দ গোদাবরীর তীরে গোষ্পাদ-তীর্থের ঘাটে শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিতে আসিতেছিলেন।

এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী পার হইয়া রাজমহেন্দ্রী হইতে গোষ্পাদতীর্থে আগমন করিয়াছেন। বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বাদ্য-ভাণ্ডের সহিত শিবিকারোহী এক ব্যক্তিকে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহাকেই মহাপ্রভু 'রামানন্দ রায়' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরামানন্দও এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। মহাপ্রভু রামরায়কে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন, উভয়ের মধ্যে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিল। শ্রীরামানন্দ শ্রীমহা-প্রভুকে তথায় পাঁচ সাতদিন কৃপা-পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু সেই গ্রামে কোন এক বৈদিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান ও ভিক্ষা করিলেন। সন্ধ্যাকালে রামানন্দ রায় অত্যন্ত দীনবেশে আসিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু তখন রামরায়কে

বলিলেন,—"জীবের সাধন ও সাধ্য-বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ বলুন।" শ্রীরামানন্দ উত্তর করিলেন,—"বিষ্ণুভক্তিই জীবের প্রয়োজন, ভগবানের সেবার মূল উদ্দেশ্যে **বর্ণাশ্রমধর্ম্ম** পালন করিলেই বিষ্ণু প্রীত হন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন,—"ইহা অত্যন্ত বাহিরের কথা, আরও উন্নততর কথা বলুন।" রায় বলিলেন,—"কৃষ্ণে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ অর্থাৎ **কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির** অনুষ্ঠান করিতে করিতেই বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"**এহো বাহ্য**, আগে কহ আর।" তখন রামানন্দ রায় কহিলেন,—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া **ভগবানে শরণাগতি** যাহা গীতার চরমোপদেশ—তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" তদুত্তরে তখন রামরায় বলিলেন,—"**জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি** আরও শ্রেষ্ঠ।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো বাহ্য আগে কহ আর।" এবার রামরায় বলিলেন,—'**জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন, কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—এই সকলের মধ্যেই ন্যূনাধিক মিশ্রভাব আছে, কিন্তু জ্ঞানশূন্যা কেবলা ভক্তিতে কোনপ্রকার মিশ্রভাব নাই।" এজন্য জ্ঞানশূন্যভক্তির কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো হয়, আগে কহ আর ;—হাঁ, কেবলা ভক্তি বাহিরের জিনিষ নয়, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাহারও আগের কথা বল।" তখন রামরায় বলিলেন,—"কেবলা ভক্তি হইতেও **প্রেমভক্তি** শ্রেষ্ঠ"।

মহাপ্রভু তখনও বলিলেন,—"**এহো হয়**, আগে কহ আর।" ইহার উত্তরে রামরায় ক্রমে-ক্রমে **দাস্যপ্রেম**, **সখ্যপ্রেম**, **বাৎসল্য-প্রেম** ও **কান্তপ্রেমের** কথা বলিলেন। কান্তপ্রেম অর্থাৎ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রাকৃত শ্রীগোপীগণ যে স্বাভাবিক প্রীতি করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ হয়। শান্তরসে একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠা-গুণ আছে, দাস্যরসে ত' তাহা আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণের প্রতি মমতা বা 'আমার'-বুদ্ধি আছে। আর সখ্য-রসে শান্ত ও দাস্যরসের দুই গুণ ব্যতীত আবার বিশ্রম্ভ-ভাব অর্থাৎ অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আত্মীয়ভাব বিদ্যমান। বাৎসল্য-রসে শান্ত, দাস্য, সখ্যের গুণসমূহ ব্যতীত স্নেহাধিক্যের পরিমাণ অপরিমেয়। মধুর রসে ঐ চারি রসের গুণসমূহের সহিত নিঃসঙ্কোচে সর্ব্বাঙ্গদ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এ জগতে যে রসটী আমাদের নিকট যতটা হেয় বলিয়া অনুভূত হয়, গোলোকে সেই রসই ততটা উপাদেয়; কেন না, এ জগৎ গোলোকের বিকৃত প্রতিবিম্ব—সমস্তই বিপরীত। যেমন দর্পণে যখন আমাদের ছবি দেখি, তখন আমাদের দক্ষিণ হস্তটি—বাম হস্ত ও বাম হস্তটি—দক্ষিণ হস্ত, এরূপ বিপরীত দেখিয়া থাকি। এই অনিত্য জগতের দর্পণে প্রতিফলিত হইলে গোলোকের রস-সমূহের এইরূপ বিকৃতছায়া দর্শন হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কান্তরসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীরামরায় আবার কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার প্রেমের কথা বর্ণন করিলেন। পরে শ্রীরামানন্দ রায় ক্রমে ক্রমে

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেম-তত্ত্ব বর্ণনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা-ক্রমে শ্রীরামরায় বিপ্রলম্ভরসের প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তরূপ * অধিরূঢ়-মহাভাবময় নিজ-কৃত একটি গীত বলিলেন,—

"পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল॥"

শ্রীরামরায় অবশেষে সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা-প্রাপ্তির উপায়—একমাত্র ব্রজসখীর আনুগত্য, ইহা জানাইলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেম—ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রেম-সেবাতেই সেই সেই প্রেমের মূল সেবকগণের অনুগত হইতে হইবে। যেমন, কাহারও শান্তরস স্বভাবসিদ্ধ। তিনি ব্রজের গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা প্রভৃতি শান্তরসের মূল সেবকগণের

---

* যাঁহারা এই জগতের চিন্তাস্রোতের অতীত রাজ্যে গিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বক্ষণ অকপট-কৃষ্ণসেবা-লালসায় বিভাবিত, তাঁহারা শ্রীরাধার প্রেমের মধ্যে যে, কি পরম-বিচিত্রতা আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে সেই সকল সুদুর্ল্লভ তত্ত্ব পরমমুক্ত ব্যক্তি-গণের জন্য বলিয়াছেন। এই সকল কথা সাধারণে বুঝিতে পারিবে না; এজন্য এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদের 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও 'অনুভাষ্য' দেখিতে পারেন। শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া ভজনের উন্নততম সোপানে অধিষ্ঠিত না হইলে এই সকল কথা বোধগম্য হয় না। অনেক মনীষী ও সাহিত্যিক এই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের ব্যাখ্যা বুঝিতে সমর্থ হন নাই। ভগবদ্ভজন ও সাধারণ সাহিত্য-সেবা বা সাধারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান—সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার।

অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। দাস্যরসের রসিকগণ রক্তক, পত্রক, চিত্রকের অনুগত হইয়া, সখ্যরসের রসিকগণ সুদাম, শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণের অনুগত হইয়া, বাৎসল্যরসের রসিকগণ নন্দ-যশোদার অনুগত হইয়া, কান্তরসের রসিকগণ ব্রজ-গোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

জীব আপনাকে 'ভগবান্' কল্পনা করিলে যেরূপ ভীষণ অপরাধ হয়, তদ্রূপ আপনাকে ভগবানের মূল সেবক—যথা শ্রীমতী, নন্দ, যশোদা প্রভৃতি কল্পনা করিলেও ততোঽধিক অপরাধ হইয়া থাকে। ইহাকেই 'অহংগ্রহোপাসনা' বা 'মায়াবাদ' বলে। বাস্তব বৈষ্ণবধর্ম্মে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় কোনপ্রকার কল্পনা বা আরোপের কথা নাই। পরম-মুক্ত সুনির্ম্মল চেতনের বৃত্তিতে যাঁহার যে স্বভাব বা সিদ্ধ রস আছে, তাহাই স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

(শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের কথাই শ্রীরামরায়ের মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কএকটী প্রশ্নচ্ছলে আরও যে-সকল অমূল্য উপদেশ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। এই কয়টী কথা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার,—

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"
"কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?"
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"
"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?"
"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

"মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি ?"
"কৃষ্ণপ্রেম যাঁ'র, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥"
"শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥"
"মুক্তি-ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি ?"
"স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ)

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে

কএকদিন প্রতিরাত্রে নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণকথা সংলাপের পর শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট নিজের শ্যাম ও গৌররূপ (রসরাজ-মহাভাব-রূপ) প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ-রায়কে তাঁহার রাজকার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুরুষোত্তমে গমন করিবার জন্য আজ্ঞা করিয়া স্বয়ং দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থানসমূহে গৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন ও মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ১৯৩০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীযাজপুরে শ্রীবরাহদেবের শ্রীমন্দিরে, ২৬শে শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীকূর্ম্মদেবের

শ্রীমন্দিরে, ২৭শে সিংহাচলম্-পর্ব্বতে শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে, ২৯শে গোদাবরীতটে—যেখানে শ্রীরামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর মিলন ও হরিকথা হইয়াছিল, সেই স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন

শ্রীযাজপুরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

করিয়াছেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম—'কভুর'। এই স্থানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার একটি শাখামঠও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

মঙ্গলগিরিতে ১১২টি সোপান অতিক্রম করিবার পর বটবৃক্ষের তলে দক্ষিণ পার্শ্বে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দির; বামপার্শ্বের সোপানাবলী পানানৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরাভিমুখে উঠিয়াছে। উপরে শ্বেতবর্ণের অট্টালিকা-সমূহ পানানৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাকারাদিরূপে শোভা পাইতেছে।
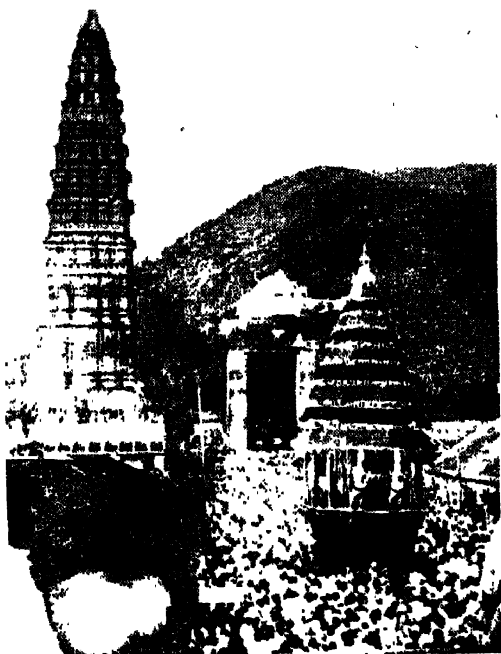
মঙ্গলগিরি পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে উচ্চ প্রদেশে শ্বেতবর্ণের মন্দিরটি পানা-নৃসিংহদেবের মন্দির। তন্নিম্নে যে একটি উচ্চ দ্বার দেখা যাইতেছে, তাহা পর্ব্বতে আরোহণের প্রথম দ্বার। নীচে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিবস রথযাত্রা-উৎসবের দৃশ্য ও লক্ষ্মী-নৃসিংহদেবের রথ দেখা যাইতেছে। বামপার্শ্বে কারুকার্য্য-মণ্ডিত উচ্চ গম্বুজটি পর্ব্বতের উপত্যকায় অবস্থিত শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেবের মন্দিরের পূর্ব্বগোপুরম্ বা পূর্ব্ব দ্বারদেশের উপরের গম্বুজ।

গোস্বামী ঠাকুর মঙ্গলগিরিতে শ্রীপানানৃসিংহের * শ্রীমন্দিরেও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যানগর হইতে ক্রমে গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, তিরুপতি, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকাল-হস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরী, কুম্ভকর্ণকপাল হইয়া পরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় দাক্ষিণাত্য-বাসী কর্ম্মী, জ্ঞানী, রামোপাসক, তত্ত্ববাদী, লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক রামানুজীয় বৈষ্ণবগণেরও কৃষ্ণভজনে রতি হইল। বৌদ্ধস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৌদ্ধাচার্য্য পণ্ডিতের যাবতীয় কুতর্ক খণ্ডন করিলেন। ইহাতে বৌদ্ধাচার্য্য ষড়যন্ত্র করিয়া শ্রীমহাপ্রভুকে মহাপ্রসাদের নামে মৎস্য-মাংসমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিলে দৈবাৎ একটি সুবৃহৎ পক্ষী আসিয়া সেই অস্পৃশ্য-খাদ্যপূর্ণ থালাটি লইয়া গেল। বৌদ্ধা-চার্য্যের উপরে ঐ থালাটি পড়িয়া গেলে তাঁহার মস্তক কাটিয়া গেল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধগণ গুরুর দশা দেখিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। পরে মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিয়া গুরুর সহিত বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি করিলেন। মহাপ্রভু শৈবগণকেও ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাবেরীর তীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তথায় জনৈক আন্ধ্রদেশীয় শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব বেঙ্কটভট্টের গৃহে

* 'গৌড়ীয়'-পত্র (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, ১৬ই অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ২৪৪ ২৫৫ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

শ্রীরঙ্গম বা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির
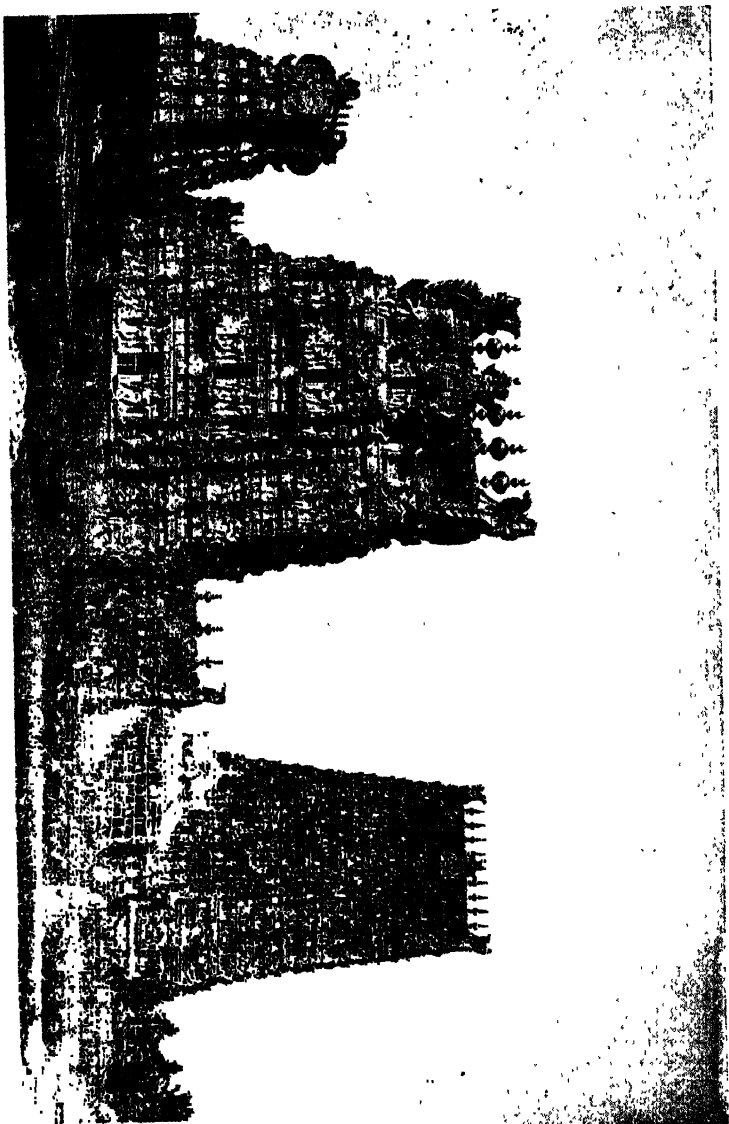
চারিমাসকাল অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক শ্রীবেঙ্কট-ভট্টকে সপরিবারে 'শ্রীকৃষ্ণভক্ত' করিলেন। শ্রীতিরুমলয়ভট্ট, শ্রীবেঙ্কটভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী—এই তিন ভ্রাতা মহা-প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত হইলেন। বেঙ্কটভট্টের ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন। ইনি বেঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপালভট্টের গুরুদেব। মহাপ্রভু যখন বেঙ্কটভট্টের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গোপালভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গম্ হইতে ঋষভ-পর্ব্বতে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় শ্রীপরমানন্দপুরীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তথা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দক্ষিণ-মথুরায় (মাদুরায়) জনৈক রামভক্ত বিপ্র, জগন্মাতা শ্রীসীতাদেবীকে রাবণ হরণ করিয়াছে বলিয়া বড়ই দুঃখে দিন কাটাইতেছিলেন। মহা-প্রভু সেই বিপ্রকে বলিলেন,—"অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীসীতা-দেবীকে রাবণ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, চক্ষুতেই দেখিতে পায় নাই। তবে যে রামায়ণে সীতা-হরণের কথা লিখিত আছে, তাহা মায়া-সীতা-হরণের কথা-মাত্র। রাবণ সীতার ছায়াকে 'সত্য সীতা' মনে করিয়াছিল।" মহাপ্রভু কিছুদিন পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ-স্বরূপ কূর্ম্মপুরাণের একটি শ্লোক আনিয়া দিয়া উক্ত রাম-ভক্ত বিপ্রকে শান্ত করিয়াছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেব ও ভট্টথারি

শ্রীমন্মহাপ্রভু পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী-নদীর তীরে শ্রীনবতিরুপতি, চিয়ড়তলা-তীর্থে শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ, তিলকাঞ্চীতে শ্রীশিব, গজেন্দ্র-মোক্ষণে শ্রীবিষ্ণু, পানাগড়ী তীর্থে শ্রীসীতাপতি, চাম্‌তাপুরে শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ, শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণু, কুমারিকায় শ্রীঅগস্ত্য, আমলীতলায় শ্রীরামচন্দ্র দর্শন করিয়া মালাবার-প্রদেশে আগমন করিলেন। এই স্থানে 'ভট্টথারি' বলিয়া এক শ্রেণীর লোক বাস করিত। ইহারা নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের পুরোহিত এবং মারণ, উচাটন ও বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্ম্মে পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত। ইহারা অনেক স্ত্রীলোককে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকটে রাখে এবং স্ত্রীলোকের প্রলোভনদ্বারা অপর লোককে ভুলাইয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত কৃষ্ণদাস-নামক যে সরল ব্রাহ্মণটি প্রভুর দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি বহন করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপ ভট্টথারি-স্ত্রীলোকের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু ভট্টথারির গৃহে আসিয়া কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে চাহিলে ভট্টথারিগণ মহাপ্রভুকে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া মারিতে গেল; কিন্তু নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল তাহাদেরই গায়ে পতিত হইল। ইহাতে

ভট্টথারিগণ চতুর্দ্দিকে পলাইয়া গেল। মহাপ্রভু তখন কৃষ্ণদাস বিপ্রকে কেশে ধরিয়া লইয়া আসিলেন।

জীব চেতন, অতএব তাহার স্বাধীনতা আছে। যখন এই জীব স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে, তখনই জীব শ্রীভগবানে ভক্তি-বিশিষ্ট হয়; আর যখন স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করে, তখনই নানাপ্রকার অভক্তির পথে বা অসৎপথে ধাবিত হয়। সাক্ষাদ্‌ভাবে স্বয়ং ভগবানের সেবার অভিনয় করিয়াও, তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থান (?) করিয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীবের কিরূপ পতন হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-সেবক কৃষ্ণদাসের এই ঘটনা দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়-পুঁথি

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টথারি-গৃহ হইতে কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে উদ্ধার করিয়া সেই দিন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের অন্তর্গত পুণ্যবতী পয়স্বিনী-নদীর তীরে আসিয়া তথায় স্নান ও শ্রীআদিকেশব-মন্দিরে * উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশবজীর দর্শন করিলেন। শ্রীকেশবদেবের সম্মুখে বহু

* ত্রিবান্দ্রাম হইতে 'নগরকৈল', যাইবার পথে 'তিরুবত্তর' নামক গ্রামে—সঃ

দণ্ডবন্নতি, স্তুতি, নৃত্য-গীত করিয়া মহাপ্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব প্রেম-দর্শনে স্থানীয় সকল লোক পরম চমৎকৃত হইলেন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু কতিপয় শুদ্ধভক্তের সহিত ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় আবিষ্কার করিলেন। এই পুঁথি প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। কারণ, এই পুস্তকে অল্পাক্ষরে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। বলিতে কি, এই গ্রন্থ সমস্ত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের নির্য্যাস-স্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বহু যত্নে লিপিকারের দ্বারা সেই পুঁথি নকল করাইয়া লইলেন। এই গ্রন্থটি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব-জগতের পরম প্রিয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত গ্রন্থের টীকা ও বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ সব্বপ্রথমে ইংরেজী ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, শ্রীকৃষ্ণের ধাম, মায়া, সৃষ্টিতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের তত্ত্বসমূহ, নির্বিবশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব, দেবী, রুদ্র ও হরিধামের স্বরূপ, সূর্য্য, শক্তি, গণেশ, রুদ্র, ও বিষ্ণুতত্ত্বের তারতম্য, প্রেমভক্তি-প্রভৃতি বিষয়ের সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপরে শ্রীঅনন্তপদ্মনাভের মন্দিরে আগমন করিয়া তথায় দুই দিবস অবস্থান ও পরে শ্রীজনার্দ্দনদেব * দর্শন করিতে আগমন করিলেন। পয়স্বিনী-তীরে আগমন-পূর্ব্বক শঙ্কর-নারায়ণ ও শৃঙ্গেরী মঠে তৎকালীন শঙ্করাচার্য্যের (রামচন্দ্র ভারতীর ?) সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। পরে মৎস্যতীর্থ দর্শন করিয়া তুঙ্গভদ্রায় আসিয়া স্নান করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

উড়ুপীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

দাক্ষিণাত্যে সহ্য পর্ব্বতের পশ্চিমে কানাড়া-জিলা ; দক্ষিণ-কানাড়ার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোর। ম্যাঙ্গালোর হইতে ছত্রিশ মাইল উত্তরে উড়ুপী। এই স্থানের প্রাচীন সংস্কৃত-নাম রজত-পীঠপুর। উড়ুপী ক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে পাপনাশিনী-নদীর তটে বিমানগিরি ; উহার এক মাইল পূর্ব্বদিকে শ্রীপরশুরামের স্থাপিত ধনুস্তীর্থ। ধনুস্তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশেই পাজকা-ক্ষেত্র অবস্থিত। এই পাজকা-ক্ষেত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হন। বর্ত্তমানে এই পল্লীটি জনহীন। পরবর্ত্তিকালের

* ত্রিবান্দ্রাম্ যাইবার পথে বার্কালা-ষ্টেসন হইতে ন্যূনাধিক দেড়মাইল দূরে—সঃ

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রীনর্ত্তক-গোপাল

একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত-গৃহ এই স্থানে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

উড়ুপীক্ষেত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সেবিত শ্রীনর্ত্তকগোপাল-শ্রীমূর্ত্তি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অষ্ট মঠ শোভা পাইতেছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কোন এক বণিকের নৌকাস্থিত বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ডের অভ্যন্তরে এই শ্রীনর্ত্তগোপাল-মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন উড়ুপীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন এই শ্রীনর্ত্তকগোপালের সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া প্রেমাবেশে মগ্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অনুগত সম্প্রদায় মায়াবাদের প্রতিবাদী প্রচারক বলিয়া 'তত্ত্ববাদী' নামে অভিহিত। 'তত্ত্ব' বলিতে সবিশেষ পুরুষোত্তম। মায়াবাদিগণ কেবলাদ্বৈতবাদ, আর তত্ত্ববাদিগণ শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন। এই তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী 'প্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে গুরুরূপে বরণ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন উড়ুপীতে পদার্পণ করেন, সেই সময়ের তত্ত্ববাদী আচার্য্যের মত ন্যূনাধিক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত হইতে যেরূপ বর্ত্তমান গৌড়ীয়-

উড়ুপীর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য

বৈষ্ণব-নামধারিগণের আচার ও বিচার কাল-প্রভাবে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, তত্ত্ববাদিগণেরও সেইরূপই হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক তত্ত্ববাদিগণ মহাপ্রভুকে বাহ্যদর্শনে 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' মনে করিয়া প্রথমমুখে তাঁহাকে অসম্ভাষ্য বিচার করিলেন; কিন্তু পরে মহাপ্রভুর অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহু সৎকার করিলেন। তত্ত্ববাদিগণের অন্তরে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান আছে দেখিয়া তাঁহাদের অহঙ্কার কৃপা-পূর্ব্বক মোচন করিবার জন্য মহাপ্রভু অতি দীনভাবে তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে প্রশ্ন করিলেন যে, সাধ্য ও সাধনের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? তত্ত্ববাদী আচার্য্য বলিলেন,—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল-সমর্পণরূপ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমনই শ্রেষ্ঠ সাধ্য।" শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতার প্রমাণ উল্লেখ করিয়া জানাইলেন,—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে একান্ত শরণাগত হইয়া নবধা ভক্তি-যাজন, বিশেষতঃ 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'ই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চম পুরুষার্থ 'কৃষ্ণপ্রেম'ই শ্রেষ্ঠ সাধ্য। সকল পারমার্থিক শাস্ত্রই একবাক্যে কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্ম হইতে কখনও কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ পঞ্চবিধ-মুক্তিকে পরিত্যাগ করেন ও উহাদিগকে নরকের তুল্য দর্শন করেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়ই ভক্তিহীন। তবে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ এই যে, তাঁহারা মায়াবাদি-গণের ন্যায় উপাস্য বস্তুকে নির্ব্বিশেষ কল্পনা করেন না। তাঁহারা

উপাস্য বস্তুর সবিশেষত্ব ও চিদ্বিলাস স্বীকার করেন। ইহাই তাঁহাদের আস্তিকতার লক্ষণ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া তদানীন্তন তত্ত্ববাদিগুরু স্তম্ভিত ও নিজের মতের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত তত্ত্ববাদী আচার্য্যের মতবাদ খণ্ডন করিয়াও শ্রীমহাপ্রভু কিরূপে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অনেকের হৃদয়ে সন্দেহ ও কুতর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ধীরভাবে আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া একদিকে অভেদবাদরূপ পীড়া হইতে জীবকুলকে দূরে রাখিবার জন্য শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের অধিকতর উপযোগিতা প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে নিজকে একজন নবীন পন্থার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার না করিয়া সাত্বত-সম্প্রদায় ও শ্রৌতপথ-গ্রহণকারীর আদর্শরূপে প্রকাশ-পূর্ব্বক গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সনাতনত্ব ও সৎসাম্প্রদায়িকত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

উড়ুপী হইতে মহাপ্রভু ফল্গুতীর্থ হইয়া ত্রিতকূপে বিশালাক্ষী দর্শন, পঞ্চাপ্সরা তীর্থে শুভাগমন, গোকর্ণে শিব-দর্শন, দ্বৈপায়নী ও সূর্পারকতীর্থে আগমন, কোলাপুরে লক্ষ্মী, ভগবতী, গণেশ ও পার্ব্বতী দর্শন-পূর্ব্বক ভীমা নদীর তীরে পাণ্ঢরপুরে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীবিঠ্ঠলদেব দর্শন করিলেন। এই স্থানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট স্বীয় অগ্রজ বিশ্বরূপের পাণ্ঢরপুরে অপ্রকটের কথা শ্রবণ করিলেন। তথায় চারিদিন অবস্থান করিয়া কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে আগমন করিলেন। তথা

হইতে বিল্বমঙ্গলের রচিত **"শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত"** গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উহা লিপি করাইয়া আনিলেন, তৎপরে কৃপাপূর্ব্বক আরও বহু তীর্থকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। তথায় শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, তাঁহার নিকট সমস্ত তীর্থের কথা কীর্ত্তন এবং 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ দুইটি প্রদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভক্তসঙ্গে অবস্থান

দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু পুরীতে শ্রীকাশী-মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণকে পরিচিত করিয়া দিলেন। সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস-বিপ্র নবদ্বীপে প্রেরিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের মুখে মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী গমনের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরীতে আসিলেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কাশীতে শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতী নামক গুরুর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা

প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি যোগপট্ট * গ্রহণ না করিয়া 'স্বরূপ' নামে পরিচিত হইলেন এবং পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দও শ্রীপুরীগোস্বামীর অপ্রকটের পর গুরুর আদেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিয়া প্রভুর পরিচর্য্যায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী নামক সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা ছিলেন। সেই সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে গুরুবুদ্ধি করিতেন। একদিন শ্রীমুকুন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"তিনি আমার গুরু, সুতরাং আমিই তাঁহার নিকট যাইতেছি। গুরুদেবের নিকটই শিষ্যের গমন করিতে হয়।" ভারতীর নিকট আসিয়া মহাপ্রভু দেখিলেন—ব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর কখনও মৃগচর্ম্ম পরিধান করা কর্ত্তব্য নহে জানিয়া অথচ গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে শাসন করা মর্য্যাদার হানিকারক বলিয়া মহাপ্রভু ভারতীকে সম্মুখে দেখিয়াও বলিলেন,—"ভারতী গোসাঞী কোথায়?" মহাপ্রভুর সম্মুখেই ভারতী গোসাঞী রহিয়াছেন—ইহা মুকুন্দ মহাপ্রভুকে জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি ভুল করিয়াছ, ইনি ভারতী গোসাঞী নহেন, ভারতী গোসাঞী

---

* সন্ন্যাসীর ধারণীয় বস্ত্রবিশেষ। সন্ন্যাসের যোগপট্টপ্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর 'স্বরূপ' নামের পরিবর্ত্তে সন্ন্যাস-নাম 'তীর্থ' হয়।

কেন চর্ম্ম পরিধান করিবেন ?” তখন ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৌশলপূর্ণ উপদেশ বুঝিতে পারিলেন এবং মনে মনে বিচার করিলেন,—সত্যই ত' চর্ম্মাম্বর পরিধান দাম্ভিকতার পরিচয়-মাত্র, উহাতে সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

শ্রীভারতী গোস্বামী সেইদিন হইতে আর মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন না,—এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভুও নূতন বহির্ব্বাস আনাইয়া শ্রীব্রহ্মানন্দকে পরিধান করিতে দিলেন।

শ্রীভারতী গোস্বামী বলিলেন,—“আমি আজন্ম নিরাকার ধ্যান করিয়াছি ; কিন্তু তোমার দর্শনে আজ আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইল। “কৃষ্ণপ্রেমাই পরম পুরুষার্থ।”

সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর—সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ি-দর্শন নিষিদ্ধ, ইহা জানাইয়া ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥*
—'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' ৮ম অঃ ২৪ শ্লোক

এদিকে রামানন্দ রায় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্ব্বক পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীচৈতন্যের চরণে একান্তভাবে অবস্থান করিবেন জানিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

রামরায়কে কার্য্য হইতে অবসর দিয়াও পূর্ব্ববৎ বেতন প্রদান করিতে থাকিলেন। শ্রীরামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের

* হায়! ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছুক ও ভগবদ্ভজনে উন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে ভোগ-বুদ্ধিতে বিষয়ী ও স্ত্রী-দর্শন বিষ ভক্ষণ হইতেও অমঙ্গলকর।

বৈষ্ণবোচিত বিবিধ গুণ কীর্ত্তন করিলে রাজার প্রতি মহাপ্রভুর চিত্তভাব কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল।
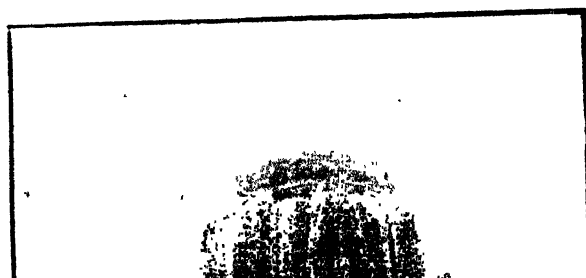
শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর তাঁহার নবযৌবনোৎসবের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কএকদিবস তাঁহার দর্শন হয় না, এই সময়কে 'অনবসর-কাল' বলে। অনবসর-সময়ে শ্রীজগন্নাথের দর্শন না

পাইয়া মহাপ্রভু গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে আলালনাথে গমন করিলেন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গৌড়দেশ হইতে সমাগত অদ্বৈতাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র গৌড়ীয়-ভক্তগণের বাসস্থান ও শ্রীমহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে চারি সম্প্রদায়ের বিভাগ করিয়া সন্ধ্যাকালে মহা-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহার দর্শনলাভের জন্য শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রবল আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজার সান্ত্বনার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু রাজাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত একখণ্ড বহির্ব্বাস প্রদান করিলেন। পরে শ্রীরামানন্দের আগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাজার শ্যামবর্ণ কিশোরবয়স্ক পুত্রকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শে রাজপুত্রের প্রেমাবেশ হইল। সেই পুত্রকে স্পর্শ করিয়া প্রতাপরুদ্রেরও মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ ও প্রেমোদয় হইল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন

শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইল। রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা * প্রকাশ করিলেন এবং এই লীলায় সাধনরাজ্যের অনেক রহস্য শিক্ষা দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল মার্জ্জন করা প্রয়োজন। বহু-দিনের সঞ্চিত নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগের অভিলাষরূপ আবর্জ্জনারাশিকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া সেবা-বুদ্ধিরূপ শীতল জলে হৃদয়কে বধৌত করিয়া নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করিতে পারিলে শ্রীজগন্নাথদেব তথায় আসিয়া আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্দির-মার্জ্জন-সময়ে কোন গৌড়ীয়-ভক্ত মহাপ্রভুর চরণে জল নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করায় লোকশিক্ষক প্রভু গৌড়ীয়গণের মূল মহাজন শ্রীস্বরূপ-দামোদরের দ্বারা ঐ গৌড়ীয়াকে গুণ্ডিচা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারাও শ্রীগৌরসুন্দর

* শ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্দির হইতে সুন্দরাচল নামক স্থানে 'গুণ্ডিচা' মন্দিরে গমন করেন। শ্রীক্ষেত্রকে—'শ্রীকুরুক্ষেত্র' এবং শ্রীসুন্দরাচলকে—'শ্রীবৃন্দাবন' বিচার করা হয়। রথযাত্রাকে উৎকলবাসিগণ 'গুণ্ডিচা-যাত্রা'ও বলেন। এই গুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব আসিয়া নবরাত্র-লীলা বা নয়দিন ব্যাপী উৎসব করেন।

শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের মন্দির-মধ্যে জীবের পক্ষে পদ-প্রক্ষালন বা সেবাগ্রহণ একটি সেবাপরাধ।

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির
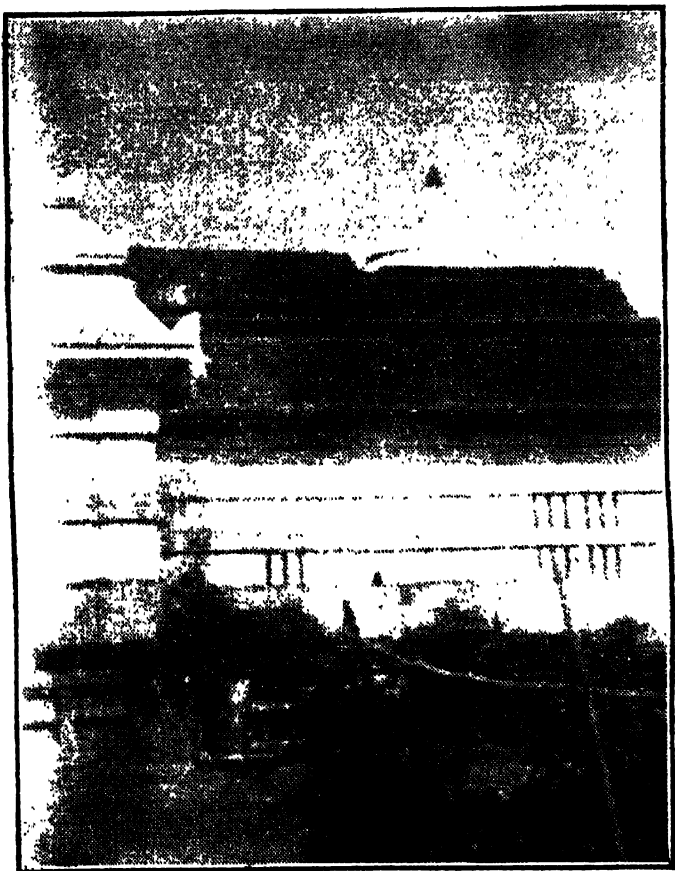
ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীরথযাত্রা—শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের শ্রীরথারোহণ দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র একটি সুবর্ণ-সম্মার্জ্জনী দ্বারা রথগমনের পথ মার্জ্জনা করিয়া তাহাতে চন্দন-জল ছড়াইতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের এইরূপ নিরভিমান সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া অন্তরে অন্তরে রাজার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

মহাপ্রভু সাতটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের রথের সম্মুখে নৃত্য করিলেন এবং কীর্ত্তনের মধ্যে অলৌকিক ও অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। যখন কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বলগণ্ডি'-উপবনে * বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অদ্ভুত প্রেমাবেশ হইল। এই সময় শ্রীপ্রতাপরুদ্র বৈষ্ণব-বেশে তথায় একাকী উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী-গীতার একটি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজার মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎকালোচিত ভাগবতীয় শ্লোক পাঠ শ্রবণ

---

* পুরীতে শ্রদ্ধাবালি ও অর্দ্ধাসনী দেবীর স্থানের মধ্যভাগে যে ভূমিখণ্ড, তাহাকে 'বলগণ্ডি' বলে।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা
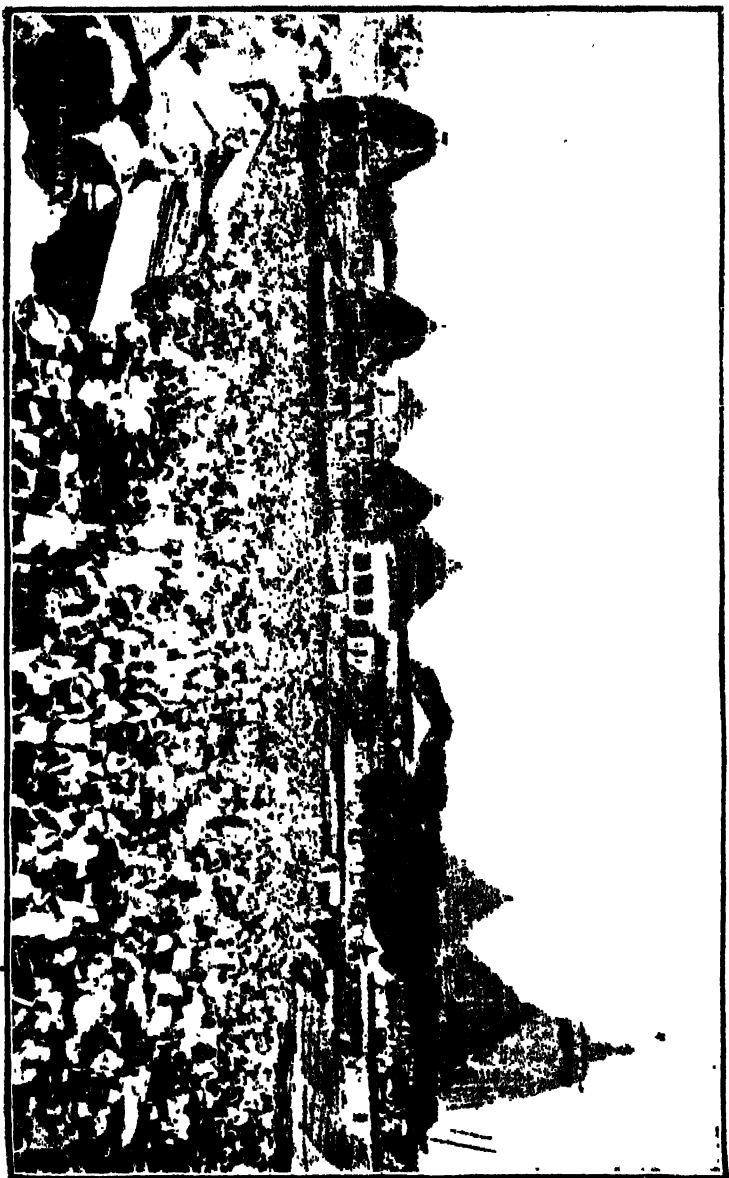
করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা-দর্শনে মহাপ্রভু রাজাকে বিষয়ী না জানিয়া বৈষ্ণব-সেবক-জ্ঞানে কৃপা করিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেব সুন্দরাচলে বসিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-লীলার স্ফূর্ত্তি হইল। নবরাত্র-যাত্রায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ-বল্লভোদ্যানে অবস্থান করিলেন। রথ-দ্বিতীয়ার পরের পঞ্চমী তিথিতে যে হেরা-পঞ্চমী-উৎসব হয়, সেই উৎসব-দর্শনে শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর মধ্যে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীগোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক রহস্যময় কথা হইল। মহাপ্রভু শ্রীবাসের সহিত রহস্যচ্ছলে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা, এমন কি শ্রীদ্বারকানাথের উপাসনা হইতেও শ্রীগোপী-কান্ত—শ্রীরাধাকান্তের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলেন। পুনর্যাত্রার * সময়ে কীর্ত্তনাদি হইল; কিন্তু সুন্দরাচল হইতে ফিরিবার সময় মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথের রথ টানিয়া নীলাচলে লইয়া আসিলেন না। কারণ, গোপীগণ তাঁহাদের নিজের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণকে অন্য স্থান হইতে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া আসেন, কিন্তু স্বগৃহ হইতে অন্যত্র লইয়া যান না।

* পুনর্যাত্রা—উল্টারথ। যখন সুন্দরাচল হইতে শ্রীজগন্নাথ রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসেন।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয় ভক্তগণ

রথযাত্রা সমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে পুষ্প-তুলসীদ্বারা পূজা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরও পুষ্প-পাত্রের অবশেষ পুষ্প-তুলসীদ্বারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে "যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে"-মন্ত্রে * পূজা করিলেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। শ্রীনন্দোৎসবের দিন মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গোপ-বেষ-ধারণ-পূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমীর দিন লঙ্কাবিজয়োৎসবে মহাপ্রভু নিজ-ভক্তগণকে বানর-সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদ্রূপ অন্যান্য যাত্রা-মহোৎসবও সমাপ্ত হইলে মহাপ্রভু শ্রীরামদাস, শ্রীদাস গদাধর প্রভৃতি কএকজন বৈষ্ণবকে সঙ্গে দিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে আচণ্ডালে অনর্গল প্রেমভক্তি বিতরণার্থ গৌড়দেশে পাঠাইলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তি করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদ ও বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণের বিবিধ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রভু সকলকে বিদায় দিলেন এবং শ্রীসত্যরাজ খান্ ও শ্রীরামানন্দ বসুকে প্রতি-বৎসর রথের সময় 'পট্টডোরী' আনিতে আদেশ করিলেন।

* তুমি যে-হও, সে হও, তোমাকেই আমি নমস্কার করি।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

কুলীন-গ্রামবাসিগণের পরিপ্রশ্ন

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থের রচয়িতা কুলীন-গ্রামবাসী শ্রীমালাধর বসু (শ্রীগুণরাজ খান্) ; তাঁহার পুত্র শ্রীলক্ষ্মীনাথ বসু (শ্রীসত্য-রাজ খান্) ; ইঁহার পুত্র শ্রীরামানন্দ বসু। শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ—বৈষ্ণব-গৃহস্থ। রথযাত্রার পর পুরী হইতে দেশে ফিরিবার কালে ইঁহারা মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। (শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথম বৎসরে বলিয়াছিলেন,—

* * কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)

শ্রীসত্যরাজ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা কি করিয়া বৈষ্ণব চিনিব ? তাঁহার সাধারণ লক্ষণ কি ?" মহাপ্রভু বলিলেন, —"যিনি শুদ্ধভাবে অর্থাৎ নিরপরাধে একবারও শ্রীকৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি '**কনিষ্ঠ বৈষ্ণব**'। কনিষ্ঠ হইলেও ইনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবের সেবা করিবেন।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় (দ্বিতীয় বৎসরেও) শ্রীসত্যরাজ খান ও শ্রীরামানন্দ বসু মহাপ্রভুকে আবার সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার (মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

* * বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।

দুই কর, শীঘ্র পা'বে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০

তাঁহারা পুনরায় বৈষ্ণবের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু এবার **'মধ্যম বৈষ্ণবে'র** লক্ষণ বলিলেন,—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।

সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২

তৃতীয় বৎসরে পুরীতে আসিয়া সত্যরাজ খান্ প্রভৃতি মহাপ্রভুকে সেই একই প্রশ্ন করিলেন। এ বৎসর মহাপ্রভু **'উত্তম বৈষ্ণব'** বা মহাভাগবতের লক্ষণ জানাইলেন,—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।

তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪

অর্থাৎ যাঁহার মুখে শুদ্ধভাবে একটি শ্রীকৃষ্ণনাম প্রকাশিত হন, তিনি বৈষ্ণব। যাঁহার মুখে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন, তিনি বৈষ্ণবতর অর্থাৎ মধ্যম বৈষ্ণব। আর, যাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া অপর লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম বহির্গত হন অর্থাৎ অপরেও ভগবানের সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই বৈষ্ণবতম বা উত্তম বৈষ্ণব। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমুকুন্দ, তাঁহার পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনরহরি সরকার—এই তিন জন প্রধান।

মহাপ্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রঘুনন্দন কি তোমার পুত্র,—না পিতা ?" মুকুন্দ উত্তর করিলেন,—"যখন শ্রীরঘুনন্দন হইতেই আমার কৃষ্ণভক্তি, তখন শ্রীরঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র।" ইহাতে শ্রীমুকুন্দ কৃষ্ণভক্ত শ্রীরঘুনন্দনে পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গুরুবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যাঁহারা পরমার্থ আশ্রয় করেন, তাঁহাদের চরিত্র এইরূপ ; দেহ-সম্পর্কে তাঁহারা কোন ব্যক্তি বা বিষয় দর্শন করেন না।

মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবদিগের সেবা-নির্দ্দেশ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি—এই দুই ভ্রাতাকে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ ও জলব্রহ্ম শ্রীগঙ্গার সেবা করিতে আদেশ করিয়া মুরারিগুপ্তের শ্রীরাম-নিষ্ঠা বর্ণন করিলেন।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্ত—দুই ভ্রাতা চট্টগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের কৃপা-পাত্র ছিলেন। বৈষ্ণব-সেবায় শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের ব্যয়-বাহুল্য প্রভৃতি দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীশিবানন্দ সেনকে ইঁহার 'সরখেল' হইয়া ব্যয়-সমাধানের আদেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর অতি কাতরভাবে নিবেদন করিলেন,—"প্রভো! জগতের জীবের ত্রিতাপ-দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সকল জীবের সকল পাপ আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া আমাকে নরক ভোগ করিতে দি'ন ; আর আপনি সকল জীবের ভবরোগ দূর করুন।

শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীমদনগোপাল-শ্রীবিগ্রহ

শ্রীবাসুদেবের এই প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল। মহাপ্রভু বলিলেন,—"কৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু; তোমার যখন এই শুভ ইচ্ছা হইয়াছে, তখন কৃষ্ণ অবশ্যই তাহা পূরণ করিবেন। ভক্তের ইচ্ছামাত্রই ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে।"

শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের এই প্রার্থনায় অনেক ভাবিবার কথা আছে। পাশ্চাত্যদেশে খৃস্ট-ভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, মহামতি যিশুখৃষ্টই জগতের একমাত্র গুরু; তিনি জীবের সকল পাপের বোঝা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌর-পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ পরদুঃখদুঃখী মহাপুরুষগণ জগতের জীবকে তদপেক্ষা অনন্তকোটিগুণে অধিকতর উন্নত, উদার, সার্ব্বজনীন প্রেমভাব শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের আদর্শে একাধারে জড়ীয় স্বার্থত্যাগরূপ নিঃস্বার্থ, বিষ্ণুসেবারূপ চিন্ময় পরার্থ ও স্বার্থের অপূর্ব্ব সম্মেলন দেখিতে পাওয়া যায়। সকল জীবের শুধু পাপ নহে, সকল প্রকার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতর ভবরোগের মূল-কারণ যে ভগবদ্বিমুখতা, তাহাও নিজ-মস্তকে গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদের ভবরোগ মোচনের জন্য নিষ্কপটে প্রার্থনা করিয়া যে সুনির্ম্মলা সর্ব্বোৎকৃষ্টা দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরগণেরও কল্পনার অতীত। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ দূর হয়; কিন্তু ভগবদ্বিমুখতার বীজ দূর হয় না। পাপ—প্রাকৃত, কিন্তু অপরাধ—অপ্রাকৃত বস্তুর

সেবার প্রতিবন্ধক। স্ব-স্বরূপ-উপলব্ধিতে যাহা বিঘ্নস্বরূপ, তাহাই অনর্থ। ভগবদ্বিমুখতাই ভবরোগ। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর জীবের সেই ভবরোগ বা অবিদ্যা দূর করিয়া সকল জীবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে নিষ্ণাত করিবার জন্য নিজে নরকবাঞ্ছা করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার আদর্শ উচ্চতম।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

অমোঘ-উদ্ধার

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে ক্রমে-ক্রমে পাঁচ দিন ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। ভট্টাচার্য্যের এক কন্যার নাম ছিল—ষষ্ঠী, ডাকনাম—'ষাঠী'। একদিন ষাঠীর মাতা অর্থাৎ ভট্টাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন। মহাপ্রভুর ভোজন-সময়ে ষাঠীর স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর বিচিত্র নৈবেদ্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভুকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য লাঠি হাতে করিয়া জামাতাকে মারিতে উদ্যত হইলেন; অমোঘ পলায়ন করিলে ভট্টাচার্য্য তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ষাঠীর মাতা মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া নিজ-মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং 'ষাঠী বিধবা হউক্' বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিশাপ দিতে লাগিলেন,—নিজের কন্যার জাগতিক

সুখ-ভোগের দিকে চাহিয়াও মহাপ্রভুর নিন্দক জামাতাকে ক্ষমা করিলেন না। অবশেষে তাঁহারা উভয়ে মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার বাসস্থানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভট্টাচার্য্য বাড়ীর ভিতর আসিয়া সহধর্ম্মিণীর নিকট অত্যন্ত খেদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, – "মহাপ্রভুর নিন্দাকারীকে প্রাণে বধ অথবা নিজে আত্মহত্যা করিলে ব্রাহ্মণ-বধের পাপ হইবে। অতএব সেই নিন্দকের আর মুখ-দর্শন ও নামগ্রহণ না করাই শ্রেয়ঃ। যাঠীর পতি 'পতিত' হইয়াছে, সুতরাং যাঠীকে তাহার পতি পরিত্যাগ করিতে বল। পতিত স্বামীকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর এই আদর্শ শিক্ষা আমাদের সকলেরই অনুসরণীয়। জাগতিক আত্মীয়-পরিচয়ে পরিচিত অতিপ্রিয় স্নেহভাজনগণও যদি ভক্ত ও ভগবানের বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে তাদৃশ আত্মীয়গণেরও দুঃসঙ্গ নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে ভগবানের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

পরদিন প্রাতে অমোঘ বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। কৃপাময় শ্রীগৌরহরি ইহা শুনিবামাত্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আসিলেন এবং সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া অমোঘকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামে রুচি প্রদান করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয় ভক্তগণের পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানা-ভাবে ভুলাইয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনে নিরস্ত করিলেন। শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তাধীন।

তৃতীয় বৎসরে যথাকালে শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেন সকলের পথের ব্যয় সমাধান করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যা-নন্দ-প্রভু প্রতি-বৎসরই নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহারই আদিষ্ট ও অভীষ্ট শ্রীনামপ্রেম প্রচারের বার্ত্তা নিবেদন করিতেন। তাই মহাপ্রভু এবার শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,—"তুমি প্রতি বৎসর নীলাচলে আসিও না, গৌড়দেশে থাকিয়া আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিও। কারণ, আমার এই দুঃসাধ্য গুরুতর কার্য্য করিবার যোগ্যপাত্র অপর কেহ নাই।"

উত্তরে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বলিলেন,—"আমি দেহমাত্র, সেই দেহে তুমিই প্রাণ। দেহ ও প্রাণ পরস্পর অভিন্ন। দেহের অর্থাৎ আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তুমি তোমারই অচিন্ত্য-শক্তিতে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাক।"*

---

* চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৬৬-৬৭

অধুনা যে-সকল ব্যক্তি কল্পনা-প্রভাবে বিচার করেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গৌরদেশে ধর্ম্ম-প্রচার করায় এবং শ্রীচৈতন্যদেবও নীলাচলে বসিয়া গৌড়দেশের প্রচারের কোন সংবাদ না রাখায় শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারিত মত শ্রীচৈতন্যের মত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের সেই ধারণার অমূলকতা ও ভ্রান্তি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের উক্ত বাক্য হইতে প্রমাণিত হইবে।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনে সঙ্কল্প

এতদিন শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্য-দেবকে শ্রীবৃন্দাবনগমন করিতে দেন নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরও গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রভুর আদেশে পুনরায় গৌড়দেশে ফিরিয়া গেলেন। এবার শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসার্ব্বভৌম ও শ্রীরামানন্দের নিকট গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও রায়ের অনুরোধে বর্ষাকালে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা না করিয়া পুরীতেই কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন এবং ভক্তগণের জন্য শ্রীজগন্নাথের প্রসাদাদি সঙ্গে লইয়া বিজয়া-

দশমীর দিন শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত আসিলেন। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে কাতর শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গ-লাভে ক্ষেত্রসন্ন্যাস* ত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন; মহাপ্রভু পণ্ডিত গোস্বামীকে শপথ প্রদান করিয়া কটক হইতে সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। শ্রীমন্-মহাপ্রভু ক্রমে উড়িষ্যার সীমানা-স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সীমানার পর হইতে পিছল্‌দা-পর্য্যন্ত স্থানসমূহ তখন মুসলমান-রাজ্যের অধিকারে ছিল। ভয়ে সেই পথে কেহ চলিত না। মহাপ্রভুর কৃপায় স্থানীয় মুসলমান-শাসকের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করিয়া সেই মুসলমান-শাসনকর্ত্তা হিন্দু-পোষাক পরিধান-পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া অশ্রু-পুলকান্বিত হইলেন ও যোড়হস্তে মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। ‡

পরে এই মুসলমান-শাসনকর্ত্তা মহাপ্রভুর স্বচ্ছন্দে গমনের জন্য নৌকা প্রদান ও অন্যান্য সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

* যাঁহারা পূর্ব্ব-বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ বিষ্ণুতীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্র, নবদ্বীপধাম বা মথুরামণ্ডলে একমাত্র শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগের আশ্রমকে 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' বলে। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ঐরূপ ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া পুরীতে টোটা-গোপীনাথের সেবা করিতেন।

‡ চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৮১-১৮২

পাছে জলদস্যুগণ মহাপ্রভুর কোন ক্ষতি করে, সেজন্য সঙ্গে দশ নোকা সৈন্যের সহিত সেই পরম ভাগ্যবান্ ভক্ত মুসলমান-শাসক

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-সেবিত টোটা-গোপীনাথ (টোটা-গোপীনাথ, পুরী)

স্বয়ং মন্ত্রেশ্বর-নদ পার হইয়া পিছল্‌দা-পর্য্যন্ত আসিলেন। মহাপ্রভু সেই ভক্ত মহাশয়কে পিছল্‌দায় বিদায় দিলেন এবং সেই নৌকায় চড়িয়া পানিহাটী পৌঁছিলেন। পানিহাটীতে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের

গৃহ হইতে ক্রমে কুমারহট্টে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন, তন্নিকটে শ্রীশিবানন্দের গৃহ, তৎপরে বিদ্যানগরে শ্রীবাচস্পতির স্থান হইয়া গোপনে কুলিয়া-গ্রামে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীবাস-পণ্ডিতের চরণে অপরাধী ভাগবত-পাঠক দেবানন্দ পণ্ডিত ও গোপাল-চাপালের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরই 'কুলিয়া' বা 'কোলদ্বীপ'। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধিগণের অপরাধ ক্ষমা করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' নামেও বিখ্যাত।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

কানাই-নাটশালা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ের লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীগয়াধাম হইতে শ্রীনবদ্বীপাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে প্রথমে 'কানাই-নাটশালা'য়ই তাঁহার আত্মপ্রকাশ-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ স্থানেই বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা ও আত্মপ্রকাশের আদি-সূচনা হয়। ঐ স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবগুরু-পাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তির সহজ-দিব্য-কিশোরমূর্ত্তি-কৃষ্ণদর্শন-লীলা প্রকটিত করেন। গয়া হইতে নবদ্বীপ-

প্রত্যাবর্ত্তন-মুখে মহাপ্রভুর কানাইর নাটশালায় এই প্রথম আগমন-লীলা। ইহা ১৪২৬ শকাব্দার কথা।

সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন গমনের ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়মণ্ডলে আসিলেন এবং বিদ্যানগরে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র অর্থাৎ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির গৃহে পাঁচদিন অবস্থান করিলেন। তথায় লোক-সমারোহ দেখিয়া মহাপ্রভু রাত্রিযোগে বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহর কুলিয়ায় আসিলেন এবং কুলিয়া হইতে শ্রী.বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। অসংখ্য লোকসংঘট্ট মহাপ্রভুর দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে মহাপ্রভু গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলি-গ্রামে আসিলেন। তখন তথায় শ্রীশ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন —এই উভয় ভ্রাতা 'দবিরখাস' ও 'সাকরমল্লিক'-নামে পরিচিত হইয়া হুসেন শাহ্ বাদসাহের রাজ্য-পরিচালনের প্রধান সহায়ক-রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হুসেন শাহ্ দবিরখাসের নিকট মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রামকেলিতে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুরারি, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তগণের সহিত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে নিজের নিত্য-অন্তরঙ্গ-সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। হুসেন শাহ্ বাদসাহ মহাপ্রভুর প্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রভুর যথেচ্ছ-

গমনে যাহাতে কোনপ্রকার বাধা প্রদান করা না হয়, তদ্বিষয়ে নিজ কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শীঘ্র রামকেলি হইতে অন্যত্র গমনের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কারণ, যদিও মহাপ্রভুকে বাদসাহ শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, তথাপি তিনি বিধর্ম্মী, তাঁহাকে বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আরও বলিলেন,—"প্রভো, আপনি আর বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইবেন না, তীর্থযাত্রায় এত লোক-সংঘট্ট ভাল নহে,—

যাহাঁ সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১।২২৪

বিধর্ম্মী রাজার রাজ্যশাসনে রাষ্ট্রীয় জগতের তদানীন্তন অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে প্রভুর সেবাতৎপর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিলেন।

এদিকে যে-সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন, এইরূপ কথা হইল, সেই সময় প্রভুর ভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ বৃন্দাবন-পথের দুর্গমতা জানিয়া মহাপ্রভুর জন্য ধ্যানে কুলিয়া (অধুনা মিউনিসিপ্যাল সহর-নবদ্বীপ) হইতে বৃন্দাবন-পর্য্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু কণ্টকাকীর্ণ ও কঙ্করপূর্ণ পথে হাঁটিয়া গেলে প্রভুর সুকোমল শ্রীপাদপদ্মে আঘাত লাগিবে বিবেচনায় শ্রীনৃসিংহানন্দ ভাব-সেবায় পথের মধ্যে নির্বৃন্ত কোমল পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন। পাছে রৌদ্র-তাপে প্রভুর কষ্ট হয়, এইজন্য শ্রীনৃসিংহানন্দ পথের দুই ধারে পুষ্প-বকুলের শ্রেণী স্থাপন

করিলেন। সুশীতল ছায়া ও বকুলের সৌগন্ধ—উভয়ই প্রভুর স্নিগ্ধতা বিধান করিবে। যদি ভ্রমণ-শ্রমজন্য মহাপ্রভুর পিপাসার উদ্রেক হয়, তজ্জন্য শ্রীনৃসিংহানন্দ মধ্যে মধ্যে পথের দুই পার্শ্বে 'রত্নবন্ধ ঘাট' এবং প্রফুল্ল-কমলদল-শোভিত ও সুধাময় সলিলপূর্ণ দিব্য পুষ্করিণী রচনা করিলেন। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে মধুরকণ্ঠ বিহগকুলের সুললিত কাকলি, মৃদুমন্দ গন্ধবহ প্রভৃতির মনোহারিণী সুষমা প্রভুর সেবার জন্য সুসজ্জিত করিলেন। এইরূপে কুলিয়ানগর হইতে পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া যখন গৌড়ের নিকটবর্ত্তী 'কানাই-নাটশালা'-পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তখন নৃসিংহানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাহাতে নৃসিংহানন্দ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া ভক্তগণের নিকট বলিলেন,—"এবার মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা-পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র, বৃন্দাবন-পর্য্যন্ত যাইবেন না। তোমরা ইহা পশ্চাতে জানিতে পারিবে।" ঠিক তাহাই হইল, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের সেবাবৎসলতা ও শ্রীনৃসিংহানন্দের ভবিষ্যদ্‌-বাণী সার্থক করিবার জন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন-পথে কানাই-নাটশালায় আগমন করিয়া কানাইর বিবিধ নাট্য ও লীলা-বিলাস দর্শন করিবার পর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নীলাচল-পথে শান্তিপুর আগমন করিলেন এবং শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে সাতদিন অবস্থান করিয়া পুনরায় শ্রীনীলাচলে আগমন করিলেন। মহাপ্রভু ১৪৩৪ শকাব্দায় দ্বিতীয়বার কানাই-নাটশালায় আগমন করেন।

কলিকাতা-হাওড়া-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহারওয়া লাইনে 'তালঝরি'-ষ্টেসনে নামিয়া মাঠের কাঁচা-রাস্তায় প্রায় দুই মাইল

পূর্ব্বোত্তরদিকে অথবা পাকা রাস্তায় ষ্টেসনের পূর্ব্বদিক্‌স্থিত মঙ্গল-হাটগ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে 'কানাইর নাটশালা'* গ্রাম।

কানাই নাটশালায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ও কানাইর শ্রীমন্দির

এই গ্রাম একটি ক্ষুদ্র শৈলের উপরে অবস্থিত। পূর্ব্বাভিমুখে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী জাহ্নবী প্রবাহিতা রহিয়াছেন।

* স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'কানাইয়াকা থান' বলে।

চতুর্দ্দিকে শ্যামল কান্তার শোভা পাইতেছে, বন-পুষ্পসমূহ মধুলোভী অলিকুলের মধুর গুঞ্জন সৃষ্টি করিয়াছে, বিবিধ খগ-মৃগ বনভূমিকে মুখরিত করিয়া নির্জ্জনতার মধ্যে এক স্বাভাবিক ঐকতান সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানটি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দিগণের পক্ষে যেমন ভজনের অনুকূল ও উদ্দীপক, আবার প্রাকৃত বিরাট্‌রূপে মোহ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভাব-প্রবণতারও তেমনি সহায়ক। শৈলোপরি একটি মন্দির ও সেবকখণ্ড রহিয়াছে। উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। এই শ্রীশ্রীরাধা-কানাইর নাট্যশালা হইতেই এই স্থানের নাম 'কানাই-নাটশালা' হইয়াছে। গঙ্গার অপর পারে যেরূপ শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীরামের কেলি-স্থান—রামকেলি, তদ্রূপ গঙ্গার এপারেও শ্রীকৃষ্ণের কেলি-স্থান—কানাই-নাটশালা।

ইংরেজী ১৯২৯ সালের ১২ই অক্টোবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কানাই-নাটশালায় শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপীঠ স্থাপন করেন।

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীল রঘুনাথদাস

হুগ্‌লী জেলার অন্তর্গত ই, আই, আর, লাইনে ত্রিশবিঘা রেলষ্টেসনের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে সপ্তগ্রাম-নামক নগরের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস বাস করিতেন। ইঁহাদের রাজ-প্রদত্ত উপাধি ছিল—'মজুমদার।' ইঁহারা কায়স্থ-কুলোদ্ভূত বিশেষ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের বাৎসরিক খাজানা-আদায় তৎকালের বার লক্ষ মুদ্রা ছিল। আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপা পাত্র ছিলেন। যখন শ্রীরঘুনাথ শ্রীবলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন, তখনই শ্রীরঘুনাথ নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গ লাভ করেন। যে-মুহূর্ত্তে শ্রীরঘুনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের নাম শুনিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য রঘুনাথ কএকবারই পুরীতে পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন তাহাতে নানাভাবে বাধা দিলেন। একমাত্র পুত্র ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারী রঘুনাথকে সংসার-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার জন্য গোবর্দ্ধনদাস

একটি পরম-রূপ-লাবণ্যবতী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন, কিন্তু রঘুনাথ কিছুতেই শান্ত হইলেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনের উদ্‌যোগ করিয়া নীলাচল হইতে কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত আসিলেন এবং শ্রীবৃন্দাবন

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি

গমনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্যদেব এই দ্বিতীয়-বার শান্তিপুরে আসিলেন। সংবাদ শুনিতে পাইয়া রঘুনাথ শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। পুত্র পাছে সন্ন্যাসী হয়—এই ভয়ে গোবর্দ্ধনদাস শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে অনেক লোকজন দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে এইবার সাতদিন অবস্থান করেন। রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য রঘুনাথকে বলিলেন,—"রঘুনাথ! তুমি বাতুলতা করিও না, স্থির হইয়া ঘরে যাও। লোকে ক্রমে-ক্রমেই এই সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারে। লোক-দেখান মর্কট-বৈরাগ্য করিও না, হরিসেবার জন্য অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর। বাহিরে লৌকিক ব্যবহার দেখাইয়া অন্তরে দৃঢ়-নিষ্ঠা কর। তাহাতে অচিরে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে এই অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা শ্মশান-বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসে ও নবীন উন্মাদনায় লোকের নিকট সম্মান পাইবার আশায় সাময়িক বৈরাগী সাজেন, তাঁহারা সেই বৈরাগ্যকে বেশীদিন রক্ষা করিতে পারেন না, শীঘ্রই "পুনর্মূষিকো ভব"-ন্যায়ে বৈরাগ্যচ্যুত হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর লোক 'মর্কট-বৈরাগ্য' * নিষেধের সুযোগ লইয়া চিরকালই বনিয়াদি 'ঘর পাগ্‌লা' থাকাকেই 'যুক্ত-বৈরাগ্য' মনে করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই দুই প্রকার বিচারেরই সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, কৃত্রিম বৈরাগ্য বা

---

* মর্কট-বৈরাগ্য—অস্থির বৈরাগ্য। মর্কট অর্থে—বানর, মর্কট-বৈরাগ্য অর্থে—বানরের ন্যায় বাহিরে ভাল মানুষটী ও ফলমূলভোজী সাত্ত্বিক-প্রকৃতি বা বৈরাগ্যের ভাণ দেখাইয়া হৃদয়ে বিষয়চিন্তা ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-ভোগাদি করিবার দুরভিসন্ধি। যাহারা বাহিরে কৌপীন-বহির্ব্বাস প্রভৃতি বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করিয়া হৃদয়ে বিষয়চিন্তা ও গোপনে স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহারা মর্কট-বৈরাগী।

তপস্যাদি হইতে কখনও ভক্তি লাভ হয় না। হৃদয়ে পরমেশ্বরে ভক্তি উদিত হইলে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য আনুষঙ্গিকভাবেই প্রকাশিত হইতে পারে। সেই বৈরাগ্যে কৃত্রিমতা নাই। ভক্তি-রাজ্যে কৃত্রিমতার কোন স্থান নাই।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিয়া দিলেন,—যখন তিনি বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবেন, তখন যেন রঘুনাথ কোন ছলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে—ঝারিখণ্ড-পথে

শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছু-দিন পুরীতে থাকিয়া একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া ঝারিখণ্ডের * বনপথে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নির্জ্জন অরণ্য-মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। পালে-পালে ব্যাঘ্র, হস্তী,

* মধ্যভারতের ও মধ্যপ্রদেশের (সেণ্ট্রাল প্রভিন্স্) পূর্ব্বসীমান্ত জেলাগুলি লইয়া সুবৃহৎ বনপ্রদেশ—বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, সম্বলপুর, লাহারা, কিয়োঞ্জর, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পর্ব্বত ও জঙ্গলময় স্থানকে ঝারিখণ্ড বলিত।

গণ্ডার, শূকর প্রভৃতি বন্য ও হিংস্র পশুর মধ্য দিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে চলিয়াছেন দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মহা-ভয় হইল। কিন্তু ঐ সকল হিংস্রজন্তু মহাপ্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিয়া স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন পথের মধ্যে একটি ব্যাঘ্র শয়ন করিয়াছিল। চলিতে চলিতে মহাপ্রভুর চরণ অকস্মাৎ ঐ ব্যাঘ্রের শরীরে লাগিয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতেছেন, সেই ব্যাঘ্রও তখন মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ লাভ করিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। আর একদিন মহাপ্রভু এক নদীতে স্নান করিতেছিলেন, একপাল মত্ত হস্তী সেই নদীতে জল পান করিতে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু ঐ সকল হস্তীকে 'কৃষ্ণ বল' বলিয়া উহাদের গায়ে জল নিক্ষেপ করিলেন; যাহার গায়ে সেই জলকণা লাগিল, সে-ই তখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলভদ্র চমৎকৃত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতেন, আর তাঁহার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া উৎকর্ণ মৃগীগণ তাঁহার নিকট ধাইয়া আসিত। মহাপ্রভু তাহাদিগের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পড়িতেন। ব্যাঘ্র ও মৃগ পরস্পর হিংসা ভুলিয়া একসঙ্গে মহাপ্রভুর সহিত চলিত। এই সকল দৃশ্যে বৃন্দাবন-স্মৃতির উদ্দীপনায় মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-সমূহ উচ্চারণ করিতেন। তিনি যখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ'—বলিতেন, তখন ব্যাঘ্র ও মৃগ একসঙ্গে নাচিতে থাকিত, কখনও বা পরস্পর আলিঙ্গন, কখনও বা পরস্পর মুখচুম্বন করিত। ময়ূরাদি পক্ষিগণ

মহাপ্রভুকে দেখিয়া কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে নৃত্য করিত। যখন মহাপ্রভু 'হরি বল' বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেন, তখন বৃক্ষ-লতাও সেই ধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইত। ঝারিখণ্ডের যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমবন্যায় আপ্লুত হইল। মহাপ্রভু যে-গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেন, যে-স্থানে থাকিতেন, সেই সকল স্থানের লোকেরই প্রেমভক্তি প্রকাশিত হইত। একজন আর এক জনের মুখে,—এইরূপে পরম্পরায় কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে সকল দেশের লোকই বৈষ্ণব হইয়া গেল। শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-প্রভাবেই লোকসমূহ বৈষ্ণব হইতে লাগিল। মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ড-পথে চলিতেছিলেন, তখন তাঁহার—

> বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন'।
> শৈল দেখি' মনে হয়— এই 'গোবর্দ্ধন'॥
> যাহা নদী দেখে, তাহা মানয়ে 'কালিন্দী'।
> মহাপ্রেমাবেশে নাচে, প্রভু পড়ে কান্দি'॥
>
> —চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৫৫,৫৬

(মহাপ্রভু মহাভাগবতের লীলা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-ভোগ্য উপকরণ-সমূহ-দর্শনে ব্রজভাবে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন।) বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ঝারিখণ্ডের বনপথে কখনও বন্য শাক, মূল, ফল চয়ন করিয়া বন্যব্যঞ্জন পাক করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন। কখনও বা দুই চারদিনের অন্ন পাক করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিতেন। পার্ব্বত্য-নির্ঝরিণীর উষ্ণজলে মহাপ্রভু ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন এবং দুই সন্ধ্যা বন্য কাষ্ঠের অগ্নিতাপে শীত নিবারণ করিতেন।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

প্রথমবার কাশী ও প্রয়াগে

ঝারিখণ্ডের বনপথে চলিতে চলিতে শ্রীচৈতন্যদেব বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত কাশীতে আসিয়া পেঁৗছিলেন ; তথায় মণি-কর্ণিকায় স্নান, শ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীবিন্দুমাধব দর্শন করিয়া কাশীবাসী বৈষ্ণব শ্রীতপনমিশ্রের গৃহে পদার্পণ করিলেন। শ্রীতপনমিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ (যিনি পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে পরিচিত) সেই সময় মহাপ্রভুর পাদসেবার ও উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু এইবার মাত্র চারিদিন কাশীতে অবস্থান করেন। তপনমিশ্র ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর নিকট মায়াবাদ-হলাহল-প্লাবিত কাশীর দুর্দ্দশা এবং কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মহাপ্রভুর প্রতি দোষা-রোপের বিষয় নিবেদন করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু মায়াবাদিগণের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া সেই সময়ে মায়াবাদি-গণকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অপরাধী মায়াবাদিগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম বহির্গত হয় না। তাই তাহারা 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ অর্থাৎ দেহ—দুইই এক বস্তু।"

মহাপ্রভু উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়া প্রয়াগে আগমন করিলেন। প্রয়াগেও মাত্র তিন দিন থাকিয়া কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ করিলেন এবং লোকোদ্ধার করিতে করিতে শ্রীমথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের ন্যায় পশ্চিম দেশেও মহাপ্রভু সকল লোককে বৈষ্ণব করিলেন।

উনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমথুরার নিকট আসিয়া শ্রীধাম মথুরা দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও প্রেমাবিষ্ট হইলেন। মথুরায় আসিয়া বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে 'আদিকেশব' দর্শন করিলেন। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য-গান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নির্জ্জনে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী মথুরায় আসিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহারই হস্ত-পাচিত অন্ন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিপ্র 'সানোড়িয়া' * ব্রাহ্মণকুলে

* 'সানোয়াড়'-শব্দে—স্বর্ণ বণিক্। তাহাদের যাজক ব্রাহ্মণেরাই সানোড়িয়া-(বর্ণ) ব্রাহ্মণ-নামে অভিহিত।

আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাজনদোষে ইঁহারা পতিত হওয়ায় তাঁহাদের গৃহে সন্ন্যাসিগণ কখনও ভোজন করেন না; কিন্তু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ যাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার হস্তপাচিত অন্ন স্বীকার করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সাধারণ সামাজিক জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন। মহাপ্রভু পুরীপাদের আচারের অনুসরণে সেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহাজন ও

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ (মথুরা)

গুরুবর্গের আদর্শ অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য—এই বৈষ্ণবাচার মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা শিক্ষা দিলেন। সাধুগণের ব্যবহারই—সদাচার।

যাঁহারা মনে করেন,—মহাপ্রভু আধুনিক জাতিভেদ-বর্জ্জনের প্রবর্ত্তক ছিলেন, অথবা যাঁহারা মনে করেন,—তিনি প্রকৃত পারমার্থিকগণের সম্বন্ধেও জাতি-বিচার করিতেন, এই উভয় শ্রেণীর

ভ্রম মহাপ্রভুর এই আদর্শের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু একদিকে অপারমার্থিকগণের ব্যবহারিক জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া না-দেওয়া-সম্বন্ধে যেমন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন, আবার

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানে শ্রীআদি-কেশব বিগ্রহ

তেমনি অপারমার্থিক তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সন্তানের হস্তপাচিত কোন দ্রব্যও তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই। তিনি পারমার্থিক বৈষ্ণব-

ব্রাহ্মণেরই হস্তপাচিত দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের অন্যান্য ঘটনাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা ইহার আরও অনেক সাক্ষ্য পাইব।

মহাপ্রভু মথুরার চব্বিশ-ঘাটে স্নান করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য উক্ত সানোড়িয়া বিপ্রের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রজ-মণ্ডলের দ্বাদশ-বন ভ্রমণ করিয়া সমস্ত স্থান দর্শন করি৷

শ্রীরাধাকুণ্ডের এই স্থানে মহাপ্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয় ; এ-স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের একটি পাদপীঠ আছে।

আরিট্-গ্রামে—যেখানে অরিষ্টাসুর বধ হইয়াছিল, তথায় আসিয়া মহাপ্রভু তথাকার লোকগণকে 'শ্রীরাধাকুণ্ড' কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না। সঙ্গের সানোড়িয়া ব্রাহ্মণও তাহা জানিতেন না। ইহাতে সেই তীর্থ গুপ্ত হইয়াছে

জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিকটস্থ যে দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প অল্প জল ছিল, তাহাতেই স্নান করিলেন এবং সেই ধান্যক্ষেত্রই যে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড, তাহা জানাইলেন।

অনেক সময় আমরা সাধারণ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের বলে ভগবানের গুপ্তধাম ও তীর্থসমূহ নিরূপণের চেষ্টা বা তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার তর্কের অবতারণা করিয়া থাকি; কিন্তু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন,—গুপ্ত অপ্রাকৃত তীর্থসমূহ একমাত্র শ্রীভগবান্ ও তদীয় একান্ত অন্তরঙ্গ জনগণই বস্তুতঃ আবিষ্কার করিতে পারেন। ইহা আমাদের সাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির বোধগম্য না হইলেও পরম বাস্তব সত্য।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেব দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ—এইরূপ বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনে উঠিয়া

গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল-বিগ্রহ দর্শন করিবেন না বলিয়া মনে মনে স্থির করিলে শ্রীগোপালদেব ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বত হইতে গাঠোলি-গ্রামে নামিয়া আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় গিয়া শ্রীগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নন্দীশ্বর, পাবন-সরোবর, শেষশায়ী, মেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন ও গোকুল প্রভৃতি দর্শন

করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকালের প্রসিদ্ধ 'চীরঘাটে' তেঁতুল-বৃক্ষের তলে বসিয়া মহাপ্রভু মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সংখ্যানাম করিতেন এবং সকলকে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের উপদেশ দিতেন। অক্রূরতীর্থে কৃষ্ণদাস-নামক জনৈক রাজপুতকে মহাপ্রভু
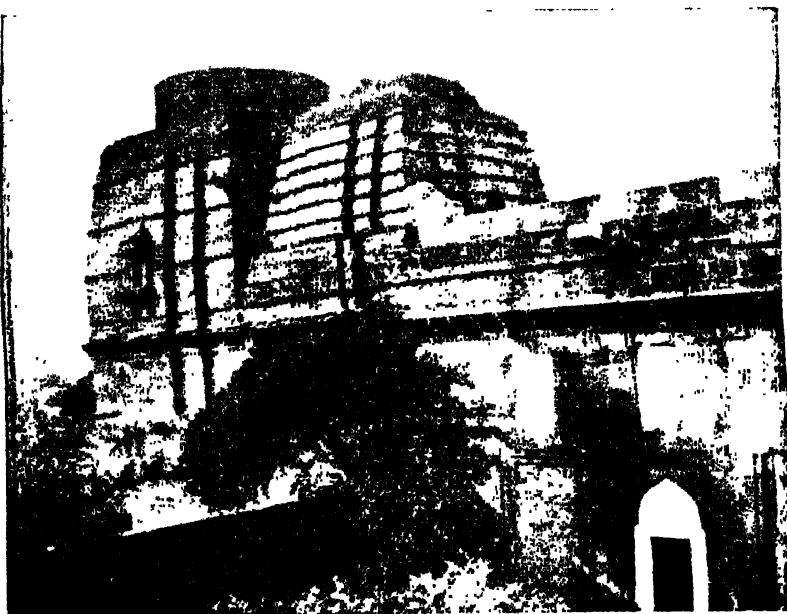
শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির

কৃপা করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সময় হইতে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া মহাপ্রভুর কমণ্ডলুবাহকরূপে তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িলেন।

রাত্রিতে এক ধীবর কালিয়হ্রদে নৌকায় চড়িয়া মৎস্য ধরিত। তাহার নৌকার মধ্যে প্রদীপ জ্বলিত। সাধারণ গ্রাম্য লোকগণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া মনে করিল, কালিয়হ্রদে কালিয়নাগের মাথার উপর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। মূঢ় লোকগুলি তখন নৌকাকে 'কালিয়নাগ,' প্রদীপকে সেই নাগের মাথার 'মণি' ও কৃষ্ণবর্ণ ধীবরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহারা এক

মানসা গঙ্গা

জনরব উঠাইয়া দিল যে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। সরস্বতীদেবী তাহাদের মুখে সত্যকথাই বলাইয়াছিলেন। কেন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরহরি তখন শ্রীবৃন্দাবনেই বিরাজমান। তবে লোকে প্রকৃত কৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই, তাহারা এক ধীবরে কৃষ্ণভ্রম করিয়াছিল। অজ্ঞ মূঢ় জনসাধারণ গণগড্ডলিকার

স্রোতেই বিচারবুদ্ধি ভাসাইয়া দিয়া গণমতকেই সত্য মনে করে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সরলবুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সেই জনরব শুনিয়া গণমতের (জনরবের) 'কৃষ্ণ' (?)-কে দেখিতে ইচ্ছা হইল! কিন্তু মহাপ্রভু সরলবুদ্ধি ভট্টাচার্য্যের ভ্রম
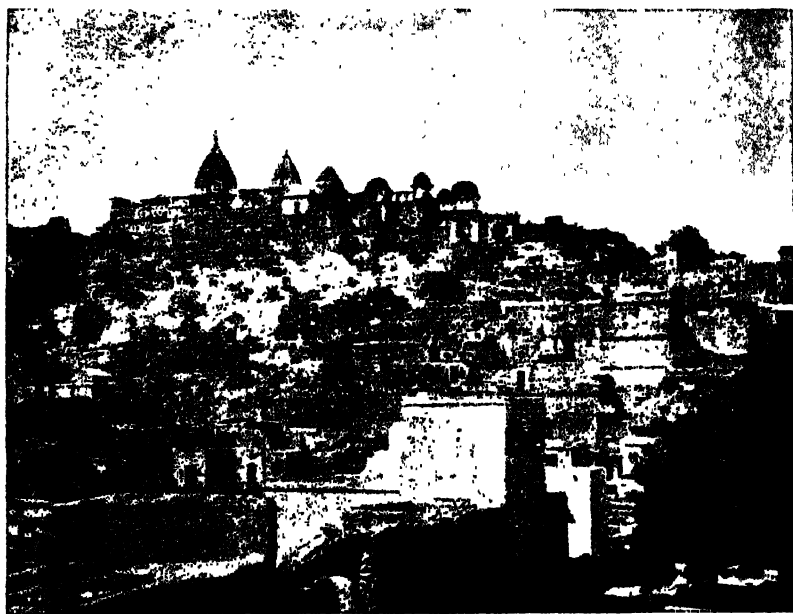
শ্রীনন্দগ্রাম

নিরাস করিয়া বলিলেন,—"তুমি পণ্ডিত, তুমিও কি মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইলে?"

পরদিন প্রাতে কতিপয় লোক আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রকৃত রহস্য বলিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে

বন্দনা করিলে মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য বলিলেন,—"ঈশ্বর-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব কখনও এক নহে। ঈশ্বর-তত্ত্ব যেন বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপ, আর জীবতত্ত্ব ঐ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ক্ষুদ্র কণার ন্যায়। মূঢ়তা-বশতঃ ঈশ্বর ও জীবকে এক বলিলে অপরাধ হয় এবং ঐ অপরাধের ফলে যমদণ্ড ভোগ করিতে হয়।" *

বর্ষাণে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির

একশ্রেণীর লোক বলিয়া থাকেন,—"শ্রীচৈতন্যের অভক্তগণ যে, শ্রীচৈতন্যদেবকে পরমেশ্বর বলেন না, তাহা তাঁহাদের নিজেদের কল্পনা নহে, শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি-বলেই তাঁহারা ঐরূপ বলিতে সাহসী হন।" কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ একটুকু গভীর ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে,

* চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১৩-১১৫

সাঙ্কেত

কামাবন

মায়াবাদি-সম্প্রদায় ও তদনুগত সাধারণ লোক যে জীবকে 'ব্রহ্ম' বলেন, তাহা নিরাস করাই লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ উক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

"পাঠান বৈষ্ণব"

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যধিক প্রেমোন্মাদ দেখিয়া শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগে যাইবেন,—এই সঙ্কল্প করিয়া রাজপুত কৃষ্ণদাস, মথুরার সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী আর একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গাভীগণের বিচরণ-দর্শন ও গোপমুখে অকস্মাৎ বংশীধ্বনি-শ্রবণে মহাপ্রভুর ব্রজলীলাস্মৃতি উদিত হইয়া প্রেম-মূর্চ্ছা হইল। এমন সময় তথায় দশজন অশ্বারোহী পাঠান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুকে ঐরূপ মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীর সঙ্গিগণ সন্ন্যাসীর অর্থাদি কাড়িয়া লইবার জন্য সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে। তাঁহাদের দলপতি

বিজলী খাঁ সেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে বিজলী খাঁর দলের জনৈক মৌলানার সহিত প্রভুর কিছু কথোপকথন ও শাস্ত্র-বিচার হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোরাণ-শাস্ত্র হইতেই কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন,—

তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর'।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহো—শ্যাম-কলেবর ॥
—চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১৯০

উক্ত মৌলানা মহাপ্রভুর শরণাগত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার সংস্কার সম্পাদন করিয়া তাঁহার নাম **'রামদাস'** রাখিলেন। বিজলী খাঁ ও তাঁহার অনুগত অশ্বারোহিগণ সকলেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও "পাঠান বৈষ্ণব" নামে বিখ্যাত হইলেন এবং বিজলী খাঁর "মহাভাগবত" বলিয়া খ্যাতি হইল।*

---

* চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২১১-২১২

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

পুনরায় প্রয়াগে—শ্রীরূপ-শিক্ষা

সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে ত্রিবেণীতে আসিলেন এবং তথায় দবিরখাস (শ্রীরূপ) ও অনুপম মল্লিককে (শ্রীবল্লভকে) দেখিতে পাইলেন।

রামকেলি-গ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শনের পর হইতেই দবিরখাস ও সাকরমল্লিক দুইজনেই বিষয়-ত্যাগের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে দবিরখাস কৌশলে হোসেন শাহের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু ধন-রত্ন সহ ফতেয়াবাদে নিজ-গৃহে আসিলেন এবং সেই ধনের অৰ্দ্ধভাগ—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে, ও এক-চতুর্থাংশ—আত্মীয়স্বজনকে বণ্টন করিয়া দিয়া বাকী একচতুর্থাংশ নিজেদের ভাবী বিপদুদ্ধারের জন্য রাখিয়া দিলেন। গৌড়দেশে শ্রীসনাতনের নিকট দশহাজার মুদ্রা রাখিলেন। শ্রীরূপ শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে গিয়াছেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সঠিক তারিখ জানিবার জন্য অবিলম্বে একজন দূত পাঠাইলেন।

এদিকে সনাতন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া নিজের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেছিলেন। বাদশাহ্ হোসেন শাহ্ হঠাৎ একদিন

সনাতনের গৃহে আসিয়া সনাতনকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীরূপের প্রেরিত চর আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ দিল। শ্রীরূপ শ্রীসনাতনকে তখন একটি পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি ও অনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য যাইতেছেন, শ্রীসনাতন-প্রভু যেন শীঘ্রই যে-কোন-উপায়ে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য চলিতে চলিতে প্রয়াগে আসিলেন। তথায় মহাপ্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং একদিন মহাপ্রভু যখন এক দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য গিয়াছেন, তখন দুই ভাই নির্জ্জনে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত দৈন্যভরে কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। তখন শ্রীরূপ এই শ্লোকটির দ্বারা মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছিলেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ জানাইলেন,—শ্রীসনাতন-প্রভু কারাগারে বন্দী আছেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"সনাতন বন্ধনমুক্ত হইয়াছে, শীঘ্রই আমার নিকট আসিবে।"

সেইদিন মধ্যাহ্নে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়ে মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন। ত্রিবেণীর উপরে মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিকটেই শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম বাসা করিলেন। এই সময় শ্রীবল্লভ ভট্ট

(পরবর্ত্তিকালে বল্লভাচার্য্য-নামে বিখ্যাত) আড়াইল-গ্রামে * বাস করিতেন। মহাপ্রভুর প্রয়াগে আগমনের সংবাদ শুনিয়া বল্লভ ভট্ট তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া অনেক হরিকথা শ্রবণ করিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া যমুনার অপর পারে আড়াইল-গ্রামস্থ স্বগৃহে লইয়া গিয়া ভিক্ষা করাইলেন এবং সবংশে তাঁহার পাদোদক গ্রহণ ও পূজা করিলেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন শ্রীরূপকে বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তথায় মিথিলাবাসী শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত মহাপ্রভুর অনেক রসালাপ হইল।

বল্লভ ভট্ট তাঁহার পুত্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ দেখিয়া তাঁহাকে প্রয়াগে লইয়া গেলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে দশ দিন থাকিয়া দশাশ্বমেধের নির্জ্জন-স্থানে শ্রীরূপকে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক সূত্ররূপে সমগ্র ভক্তিরসতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং সেই সূত্র-অবলম্বনে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থ রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

শ্রীরূপ-শিক্ষার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই,—চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বদ্ধজীব চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছে। জীবের

* আড়াইল-গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক বা 'গাদি' এখনও বর্ত্তমান আছে। যে-স্থানে এই গাদি অবস্থিত, সেই পল্লীর নাম 'দেওরখ'। 'দেওরখ' নৈনী ষ্টেসন হইতে আড়াই মাইল। যাঁহারা প্রয়াগ হইতে এই স্থান দর্শন করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে যমুনা পার হইতে হয়। বিশেষ বিবরণ 'গৌড়ীয়' নবম বর্ষ পঞ্চম-সংখ্যায় 'আড়াইল-গ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে শ্রীবেণীমাধব বা শ্রীবিন্দুমাধব-শ্রীবিগ্রহ
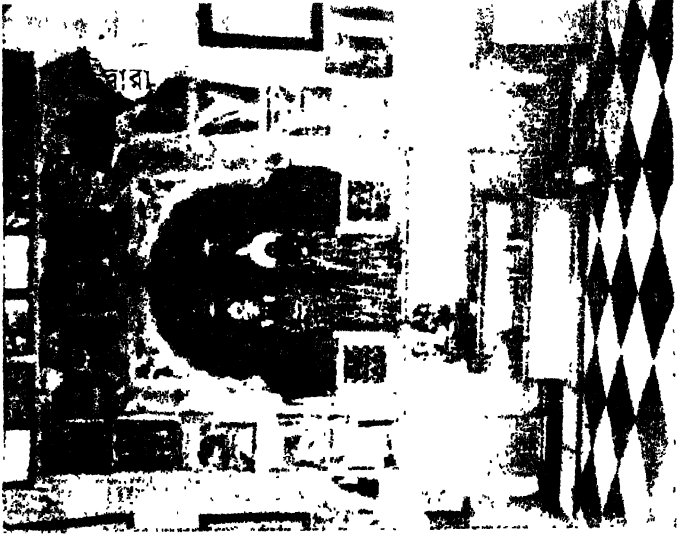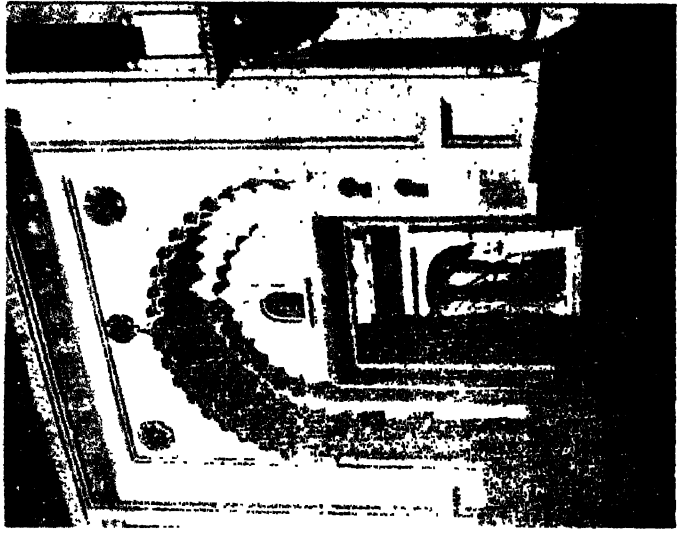
প্রয়াগে শ্রীবেণীমাধবের শ্রীমন্দিরের বহির্দ্বার

মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম—দুইটি প্রধান শ্রেণী। জঙ্গম তিন প্রকার—জলচর, স্থলচর ও খেচর। ইহাদের মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবজাতির সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অতি অল্প। মানবগণের মধ্যে অসভ্য, অসদাচারী ও নাস্তিক ব্যক্তি অনেক। যাঁহাদিগকে সদাচারী ও বেদনিষ্ঠ বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যেও অর্দ্ধেক মুখে-মাত্র বেদ স্বীকার করেন। ধার্ম্মিকগণের মধ্যে অধিক সংখ্যকই কর্ম্মী, কোটিজন কর্ম্মীর মধ্যে একজন জ্ঞানী হয়। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত পুরুষ পাওয়া যায়। এইরূপ কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণভক্ত সুদুর্ল্লভ। শ্রীকৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, সুতরাং শান্ত; কর্ম্মীই হউন, আর জ্ঞানীই হউন, বা যোগীই হউন, ইঁহারা সকলেই কোন-না-কোন প্রকারে আত্মসুখের জন্য কিছু-না-কিছু বাসনা করেন; এজন্য তাঁহারা অশান্ত।

জীবের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। জীব পূর্ণ চেতনের কণস্বরূপ; কিন্তু বর্ত্তমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম (দেহ এবং মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার) দুইটি আবরণে জীবাত্মার স্বরূপ আবৃত। এইরূপ কোন জীব চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে চৌরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিতে করিতে যদি অকস্মাৎ কোন সাধুসঙ্গ বা সাধুসেবা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, তবেই সেই জীব সদ্‌গুরুর সন্ধান এবং সদ্‌গুরু ও কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহাদের নিকট হইতে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়। সেই বীজ পাইয়া সাধক-জীব মালীর ন্যায় আপন হৃদয়-ক্ষেত্রে উহা রোপণ করেন এবং সাধু-গুরুমুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা অনুক্ষণ

শ্রবণ ও পরে সেই কথার অনুকীর্ত্তনরূপ জলসেচন করিতে করিতে ভক্তিলতা-বীজকে অঙ্কুরিত করিতে পারেন। সেই ভক্তিলতা ক্রমশঃ

শ্রীপ্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুর মধ্যে আর আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের পরে 'বিরজা'-নামে এক নদী আছে; সেখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর দ্বন্দ্ব নাই—সকলের

শান্ত ভাব। বিরজার পরপারে ব্রহ্মলোক। নিরাকার-ধ্যানকারিগণ এবং ভগবানের হস্তে নিহত ভগবদ্-বিদ্বেষিগণ এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। ইহারও উর্দ্ধে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারাম বা শ্রীবিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের উপাসকগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করেন। ইহারও উপরে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন। তথায় শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পতরু নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীভক্তিলতা সেই কল্পতরুকে আশ্রয় করিলে তাহাতে প্রেমফল ধরে। কল্পতরুতে প্রেমফল ফলিলেও ভজনকারী মালী শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন-কার্য্য বন্ধ করেন না। অনন্তকাল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জলসেচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান করিতে থাকেন।

এইরূপ সাধন করিতে করিতে যদি অতীব দুর্ভাগ্যবশতঃ কাহারও শ্রীভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণে অপরাধরূপ মত্ত হস্তী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মত্ত হস্তী ভক্তিলতার মূল-পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে,—তাহাতে লতা শুষ্ক হইয়া যায়। এজন্য সাধক-মালীর সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিয়া যত্নসহকারে ভক্তি-লতার চতুর্দ্দিকে আবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন বৈষ্ণবাপরাধ-হস্তী কোনরূপে লতার নিকটে আসিতে না পারে।

লতার সঙ্গে-সঙ্গে যদি উপশাখা-সকল (যাহা দেখিতে লতার ন্যায় অর্থাৎ ভক্তির ন্যায়, অথচ বস্তুতঃ অবান্তর পদার্থ) উঠিতে থাকে, তাহা হইলে জলসেচনের অর্থাৎ সাধন-ভজনের বাহ্য অভিনয়-দ্বারা উপশাখাগুলিই বাড়িয়া যায়। সেই উপশাখার বহু প্রকার-ভেদ আছে। তন্মধ্যে ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, শাস্ত্র-

শ্রীরূপশিক্ষা' একটি আদর্শ চিত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে (চতুর্দ্দশ ভুবনং, বিরজা,
ব্রহ্মলোক, তদুপরি পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ ও গোলোক) ।

নিষিদ্ধ-আচার, কপটতা, জীবহিংসা, স্ত্রী-অর্থ-প্রভৃতি লাভ করিবার পিপাসা, লোকের নিকট হইতে পূজা ও সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রধান। সাধক প্রথমে এই-সকল উপশাখাগুলিকে ছেদন করিবেন, তাহা হইলেই মূলশাখা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তৃণতুল্য। ভোগ বা মোক্ষ-লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কামনা-পরিপূরক দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সেবাই করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী সেবা-অভিলাষ ব্যতীত অন্য সমস্ত অভিলাষ, কর্ম্মচেষ্টা ও জ্ঞানচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই 'শুদ্ধভক্তি'। এই শুদ্ধভক্তি হইতেই 'প্রেমা' উৎপন্ন হয়। ভোগ বা মোক্ষবাঞ্ছা যদি বিন্দুমাত্রও অন্তরে থাকে, তবে কোটিজন্ম-সাধনেও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না।

ভক্তির তিনটি অবস্থা— সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। প্রেমভক্তি যখন গাঢ়তর হইতে থাকে, তখন তাহা স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব-পর্য্যন্ত উন্নত হয়।

ইহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভিন্ন রসের তারতম্য ও সেবার গাঢ়তার তারতম্যের কথা বর্ণন করিলেন। শ্রীরূপকে প্রয়াগ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকাশীতে গমন করিলেন এবং তথায় শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে বাসস্থান স্থির করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীকাশীতে—শ্রীসনাতন-শিক্ষা

শ্রীসনাতন যখন বাদশাহ্ হোসেন শাহের বিরাগ-ভাজন হইয়া কারাগারে আবদ্ধ, তখন তিনি শ্রীরূপের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। পত্র পাইবার পর শ্রীসনাতন কারা-রক্ষককে নানা চাটুবাক্যে ভুলাইয়া ও তাহাকে সাতহাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া কারামুক্ত হইলেন এবং নানাপ্রকার বাধা অতিক্রম-পূর্ব্বক কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু গৃহদ্বারে সনাতনের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া ও মলিন অভদ্র-বেশ ত্যাগ করাইয়া বৈষ্ণব-বেশ পরিধান করাইলেন। সনাতন চন্দ্রশেখরের প্রদত্ত নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহার ব্যবহৃত একটি পুরাতন ধুতি লইয়া তাহা-দ্বারা দুইটি বহির্ব্বাস ও কৌপীন করিলেন। মহাপ্রভুর ভক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটী সনাতনকে তাঁহার কাশীতে থাকা-কালে নিজ-গৃহে প্রত্যহ ভিক্ষা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সনাতন এক স্থানে ভিক্ষা করিবার পক্ষপাতী না হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে মাধুকরী * করিবার ইচ্ছা

---

* মধুকর বা ভ্রমর যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া আহার করে, তদ্রূপ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ এক স্থানে কোন বিষয়ী বা দাতার রাজসিক নিমন্ত্রণ স্বীকার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বার হইতে কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া থাকেন।

কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী

প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। গৌড়দেশ হইতে পলাইয়া অসিবার সময় পথে হাজীপুরে সনাতনের সহিত তাঁহার ভগ্নিপতি শ্রীকান্তের সাক্ষাৎকার হয়। অত্যন্ত শীতের প্রকোপ দেখিয়া শ্রীকান্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া সনাতনকে একটি ভোটকম্বল প্রদান করেন। সনাতনের গাত্রে ঐ ভোটকম্বলটী ছিল। মহাপ্রভু ঐ কম্বলের প্রতি বার বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মধ্যাহ্নে স্নানকালে গঙ্গার ঘাটে বঙ্গদেশীয় এক ব্যক্তিকে নিজের বহুমূল্য সেই ভোট-কম্বলখানি প্রদান করিয়া উহার পরিবর্ত্তে সেই ব্যক্তির একখণ্ড কাঁথা গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালে সনাতন তাঁহার নিকট পরিপ্রশ্ন করিয়া জীবের স্বরূপ, কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন-সম্বন্ধে যে সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই **'সনাতন-শিক্ষা'**-নামে বিখ্যাত।

শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক-সিদ্ধান্ত শ্রীসনাতনশিক্ষার মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব জীব ও জড়জগতের সহিত ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। জীব তাহার নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণমুক্ত-নির্ম্মল-স্বরূপে সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব—সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণকণ-স্থানীয়। কিরণ-কণাকে যেরূপ স্বয়ং সূর্য্য বলা যায় না, আবার তাহা যেমন সূর্য্য হইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে, তদ্রূপ জীবও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম নহে, আবার কৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে।

যে-সকল জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেই মায়া এই সংসারে সুখ ও দুঃখ দিতেছেন।

জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। জল ও স্থল—এই উভয়ের মধ্যে যে একটি অতি সূক্ষ্ম রেখা **(Demarcation line)** আছে, তাহাকে 'তট' বলে। তট—ভূমিও বটে, জলও বটে অর্থাৎ উভয়স্থ। জীব চেতন পদার্থ, চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই—স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি চেতনমাত্রেই আছে, তবে সেই চেতন পূর্ণচেতনের অণু-অংশ বলিয়া তাহার স্বতন্ত্রতাও খুব সসীম। কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণচেতন বলিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রতা অসীম ও মানবের চিন্তার অতীত; তিনি স্বেচ্ছাময়—স্বরাট্। জীবের শুদ্ধ চেতন-স্বরূপ বর্ত্তমানে দুইটি আবরণদ্বারা আবৃত। একটি স্থূলদেহ—যাহা আমরা চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করি; আর একটি—মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার-দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম-শরীর; ইহা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনুভব করি। জীব যখন তাহার সেই স্বাধীনতার সামান্য অধিকার-টুকুর সদ্ব্যবহার করে, তখন সে ভগবানের সেবাতে উন্মুখ ও অবস্থিত থাকিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবার পরম চমৎকারিতা ও নিত্য আনন্দ আস্বাদন করিতে পারে। কিন্তু যখন সে সেই স্বতন্ত্রতা-টুকুর অপব্যবহার করে, তখনই সে তটের অপর-পারে অর্থাৎ সংসার-সমুদ্রে পতিত হয়। এইরূপ যাহারা অনাদিকাল হইতে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া একমাত্র প্রভু কৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাদের জন্যই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুরূপে আপনাকে

প্রকাশ করেন। সাধু-শাস্ত্রের কৃপায়ই কৃষ্ণকে জানিবার ইচ্ছা হয়। যেমন লোক দৈবজ্ঞের নিকট পিতৃ-ধনের সন্ধান পাইয়া প্রকৃত স্থান হইতে গুপ্তধন তুলিয়া আনে, সেইরূপ সাধু-শাস্ত্র-গুরু হইতে কৃষ্ণভক্তির প্রকৃত সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের উপদেশের অনু-সরণে সাধন করিলে গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় জীবের প্রেমধন লাভ হয়।

কৃষ্ণই—পরম-তত্ত্ব; ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গ-জ্যোতিঃ। সূর্য্যকে যেরূপ আমরা পৃথিবী হইতে কেবল জ্যোতির্ম্ময় দেখি, কিন্তু যাঁহারা সূর্য্যলোকে বাস বা সূর্য্যের নিকটে গমন করিতে পারেন, তাঁহারা সূর্য্যকে অবয়বযুক্ত দেখেন; তদ্রূপ কৃষ্ণের অসম্যক্-দর্শনে অর্থাৎ বাহিরের অঙ্গজ্যোতি-মাত্র দর্শনে তাঁহাকে কেবল জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া ধারণা হয়। যোগিগণ কৃষ্ণকে যে পরমাত্ম-রূপে দর্শন করেন, তাহাও কৃষ্ণ-সম্বন্ধে আংশিক দর্শন—কৃষ্ণের বৈভব-দর্শন-মাত্র।

কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত; কিন্তু সেই শক্তির ত্রিবিধ পরিজ্ঞান মুখ্যভাবে প্রসিদ্ধ। প্রথম—তাঁহার বহিরঙ্গা বা অচিৎ-শক্তি, দ্বিতীয়—তাঁহার অন্তরঙ্গা বা চিৎ-শক্তি এবং তৃতীয়—তাঁহার চিৎ ও অচিৎ এই দুই শক্তির সন্ধিস্থলরূপ তটে অবস্থিত জীব-শক্তি। অচিৎ মায়াশক্তি হইতে এই দৃশ্যমান জড়জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে ভগবানের নিজের ধাম ও তাঁহার সেবকগণ প্রকাশিত হইয়াছেন, আর তটস্থা-শক্তি হইতে জীবসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, সেই জ্ঞানের নাম—**সম্বন্ধজ্ঞান**। জীবের যাহা

নিত্য-স্বভাব, তাহা প্রকট করার নামই সাধন, তাহাই **অভিধেয়**। সেই সাধনদ্বারা জীব যে ফল লাভ করিতে পারে, তাহাই জীবের **প্রয়োজন**। কৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্য প্রভু-সেবক-সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-সেবাই জীবের অভিধেয় এবং পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধনই সেবারূপ সাধনের ফল। ইহাই প্রয়োজন বা **কৃষ্ণপ্রেম**। সাধনের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, সাধু বা ভগবানের স্থানে বাস ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা—এই পাঁচটী অঙ্গই মুখ্য।

সাধনভক্তি দুই প্রকার,—**রাগানুগা ভক্তি** ও **বৈধী ভক্তি**। ব্রজগোপীগণ, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, রক্তক-পত্রক-চিত্রক প্রভৃতি ব্রজের নিত্যসিদ্ধ সেবকগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহাকে **রাগাত্মিকা সাধ্যভক্তি** বলে। সেই রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ হয়, তাঁহারা সেই সকল ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া কৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। আর যাঁহারা শাস্ত্রের শাসন বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা শাসিত হইয়া ভগবানের সেবা করিবার জন্য সাধন করেন, তাঁহাদিগের সেই সাধন-চেষ্টাই বৈধী ভক্তি।

অন্তরে আদৌ শ্রদ্ধার উদয় হইলে জীব সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ের নানাপ্রকার কামনা বাসনা, দুর্ব্বলতা, অপরাধ, নিজের স্বরূপের ভ্রান্তি প্রভৃতি অনর্থসমূহ দূর হয়। এই অবস্থার নাম—অনর্থ-

নিবৃত্তি। ইহার পরে নিষ্ঠার উদয় হয় অর্থাৎ ভগবানের সেবায় সর্ব্বক্ষণ লাগিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয়। পরে সেই সেবায় স্বাভাবিক রুচি ও তৎপরে আসক্তি জন্মে। এই পর্য্যন্ত **সাধনভক্তি**। ইহার পর কৃষ্ণে প্রীতির অঙ্কুর বা **ভাবের** উদয় হয়। এই ভাব ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া **প্রেমরূপে** প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রেম-লাভের ইহাই ক্রম।

শ্রীসনাতনের প্রার্থনানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে "আত্মা-রাম"-শ্লোকের একষষ্টি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতনকে বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্র 'হরিভক্তিবিলাস' রচনার জন্য আদেশ করিয়া উহার বিষয়-সকল সূত্রাকারে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীপ্রকাশানন্দ-উদ্ধার

একদিন শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপনমিশ্র অত্যন্ত দুঃখের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) সর্ব্বক্ষণ নিন্দা করিয়া অপরাধে মগ্ন হইতেছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন,—"আমার গৃহে অদ্য আমি কাশীর সকল

সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি; আপনি যদি কৃপা করিয়া আমার গৃহে একবার পদার্পণ করেন, তবে আমার অনুষ্ঠান পূর্ণ ও সফল হয়। আপনি কাশীর সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশেন না, ইহা আমি জানি। তথাপি আজ আমার প্রতি একবার কৃপা করুন।”

ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বিপ্র-গৃহে সন্ন্যাসিগণের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, সকলকে নমস্কার করিয়া বাহিরে গিয়া পদ প্রক্ষালন করিলেন এবং সেই স্থানেই বসিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মহাতেজোময় রূপ দর্শন করিয়া স্ব-স্ব আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দও মহাপ্রভুকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তম স্থানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বিশেষ সম্মানের সহিত সভার মধ্যে বসাইলেন।

প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কাশীর সন্ন্যাসিগণের সহিত না মিশিবার জন্য অনুযোগ করিলেন। মহাপ্রভু ছলনা করিয়া দৈন্যভরে বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে ‘মূর্খ’ ও ‘বেদান্তে অনধিকারী’ দেখিয়া শাসন করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিতে আদেশ করিয়াছেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ’বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা’বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩-৭৬

ইহা দ্বারা মহাপ্রভু কৌশলে জানাইলেন যে, যাঁহারা আপনা-দিগকে বেদান্তে অধিকারী অভিমান করিয়া শ্রীহরিনামকে অনিত্য বা সামান্য বস্তু বিচার করেন, বস্তুতঃ তাঁহারাই বেদান্তে অনধিকারী। সকল বেদ-মন্ত্রের সার ও সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম—শ্রীনাম। এই জন্যই বেদমন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণবের (ওঁ) ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বেদান্তসূত্রেরও আদিতে এবং অন্তে এই শব্দব্রহ্ম বা প্রণব রহিয়াছেন। বেদান্তের ফলপাদের প্রথম সূত্র—"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ও চরম সূত্র—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" শব্দব্রহ্ম শ্রীনামের অনুক্ষণ আবৃত্তি ও তদ্দ্বারাই সংসারে অপুনরাবৃত্তি (অগমনাগমন) উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা জীবের সংসার-মোচন এবং নামের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। (এই কৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিলেন,—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি-আনন্দ যা'র নহে এক বিন্দু॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৪-৮৫)

মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—বেদান্ত ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য-অর্থে সবিশেষ-স্বরূপ ভগবানকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব—

শক্তি ; কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্। জীবের স্বরূপ স্ফুলিঙ্গ-কণের মত ক্ষুদ্র। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা বা ধামকে প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত জড় বলিয়া কল্পনা করার ন্যায় নাস্তিকতা আর কিছুই নাই। বেদান্তে শক্তিপরিণামবাদই স্বীকৃত হইয়াছে। চিন্তামণির রত্ন-প্রসবের ন্যায় ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি এই জড়জগৎ প্রসব করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে। আচার্য্য শঙ্কর বেদ হইতে যে চারিটি মহাবাক্য চয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বেদের সার্ব্বদেশিক বিচার পাওয়া যায় না। বেদতরুর বীজ প্রণবই মহাবাক্য ও ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবানকে কেবল নির্ব্বিশেষ বলিয়া তাঁহার নিত্যশক্তি অস্বীকার করিলে ভগবানের অর্দ্ধস্বরূপমাত্র স্বীকারের ফলে তাঁহার পূর্ণতারই অস্বীকার করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্যের ঐরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় মায়াবাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। কাশীতে একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীবিন্দুমাধবের মন্দিরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্য প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া নিজের পূর্ব্বকার্য্যের জন্য আপনাকে ধিক্কার দিয়া বেদান্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া জানাইলেন।

ইহার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীসুবুদ্ধিরায়

হোসেন শাহের পূর্ব্বে সুবুদ্ধিরায়-নামক এক ব্যক্তি গৌড়ের ভূম্যধিকারী ছিলেন। হোসেন শাহ্ তখন সুবুদ্ধিরায়ের অধীন কর্ম্মচারী। এক সময় তিনি হোসেন শাহকে চাবুক মারিয়া শাসন করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ্ যখন গৌড়ের বাদশাহ হইলেন, তখন তিনি তাঁহার বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধিরায়কে জাতিভ্রস্ট করেন। সুবুদ্ধিরায় কাশীর পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সুবুদ্ধিরায়কে তপ্ত ঘৃত পান করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেন। মহাপ্রভু যখন কাশীতে আসিলেন, তখন সুবুদ্ধিরায় মহাপ্রভুর নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু পণ্ডিতগণের ঐ সকল ব্যবস্থায় কোন বাস্তব কল্যাণ-সম্ভাবনা নাই জানাইয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশ করিলেন,—

> এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যা'বে।
> আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
> আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
> মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥

শ্রীসুবুদ্ধিরায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া সুতীব্র শ্রীহরি-ভজনময় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন ভ্রমণ করিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

পুনরায় নীলাচলে

মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া পুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শিবানন্দ সেনের সহিত একটি ভগবদ্ভক্ত কুক্কুরও পুরী-অভিমুখে আসিতেছিল। একদিন শিবানন্দ সেনের ভৃত্য কুক্কুরটিকে রাত্রিতে আহার দিতে ভুলিয়া যাওয়ায় কুক্কুরটি কোথায় চলিয়া গেল—কেহই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে ভক্তগণ পুরীতে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন,—সেই কুক্কুরটি মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া আছে। মহাপ্রভু কুক্কুরটিকে নারিকেলশস্য-প্রসাদ ফেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন ও 'রাম, কৃষ্ণ, হরি বল' বলিতেছেন। কুক্কুরটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত মহাপ্রসাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ "কৃষ্ণ-কৃষ্ণ" বলিতেছিল। ইহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। শিবানন্দ সেনও দণ্ডবৎ করিয়া কুক্কুরের নিকট নিজের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহার পর সেই কুক্কুরকে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। কুক্কুর সিদ্ধদেহ পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিল।

শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া ঠাকুর হরিদাসের সহিত অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু

একদিন শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" * শ্লোকটী দেখিতে পাইয়া এবং আর একদিন শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধ-মাধব'-নাটক-গ্রন্থের শ্লোক শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

ভগবান্ আচার্য্য-নামক এক সরল ব্রাহ্মণ পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে মায়াবাদিগণের নিকট বেদান্ত পড়িয়া পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বাহিরে শিষ্টাচার দেখাইলেও অন্তরে আদর করিলেন না।

* প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুর-মুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

হে সহচরি! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখ তাহাই বটে; তথাপি বনমধ্যে ক্রীড়াশীল এই কৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

ষট্‌সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

ছোট হরিদাস

একদিন শ্রীভগবান্‌ আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শ্রীশিখি মাহিতির ভগ্নী শ্রীমাধবীদেবীর নিকট গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য কিছু সরু চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলেন। মাধবীদেবী বৃদ্ধা, তপস্বিনী ও পরমা বৈষ্ণবী। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন জন শ্রীরাধিকার গণ ছিলেন; এক—স্বরূপ গোস্বামী, দুই—রায় রামানন্দ, তিন—শিখি মাহিতী এবং অর্দ্ধেক—তাঁহার ভগ্নী মাধবীদেবী।

মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু ভগবান্‌ আচার্য্যের গৃহে আসিয়া ভোজন-কালে উত্তম সরু চাউল কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ছোট হরিদাস ঐ চাউল মাধবীদেবীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে আদেশ করিলেন,—"ছোট হরিদাসকে এখানে আর আসিতে দিও না। তুমি আজ হইতে আমার এই আদেশ পালন করিবে।"

'দ্বার-মানা' হইয়াছে শুনিয়া হরিদাস মনের দুঃখে উপবাসী থাকিলেন। শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ ভক্তগণ ছোট হরিদাসের অপরাধের বিষয় জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

* * বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ *

—চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৯

অন্যদিন পরমানন্দপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পুরী ত্যাগ করিয়া আলালনাথে‡ গমনের ভয় প্রদর্শন করিলেন। পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া হরিদাস মহাপ্রভুর সেবাপ্রাপ্তি-সঙ্কল্প করিয়া প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীর জলে দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পরবর্ত্তী চাতুর্ম্মাস্য-কালে পুরীতে আসিবার পর মহাপ্রভুর নিকট হরিদাসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ জীব স্ব-স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে,—এইমাত্র উত্তর দিলেন।

---

* মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত অথবা দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবে না; কেন-না, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

‡ আলবরনাথ-শব্দের অপভ্রংশ—আলালনাথ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ে প্রাচীন সিদ্ধপার্ষদ মহাপুরুষগণ 'আলবর'-শব্দে অভিহিত হন। আলবরগণের নাথ চতুর্ভুজ-বিষ্ণুমূর্ত্তি জনার্দ্দন এখানে বিরাজিত আছেন। ১৪৩২ শকাব্দায় মহাপ্রভু প্রথমবার এখানে পদার্পণ করেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে এখানে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার একটি শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীবাসপণ্ডিত তখন ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের বৃত্তান্ত বলিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত"

-চৈঃ চঃ অঃ ২।১৬৫
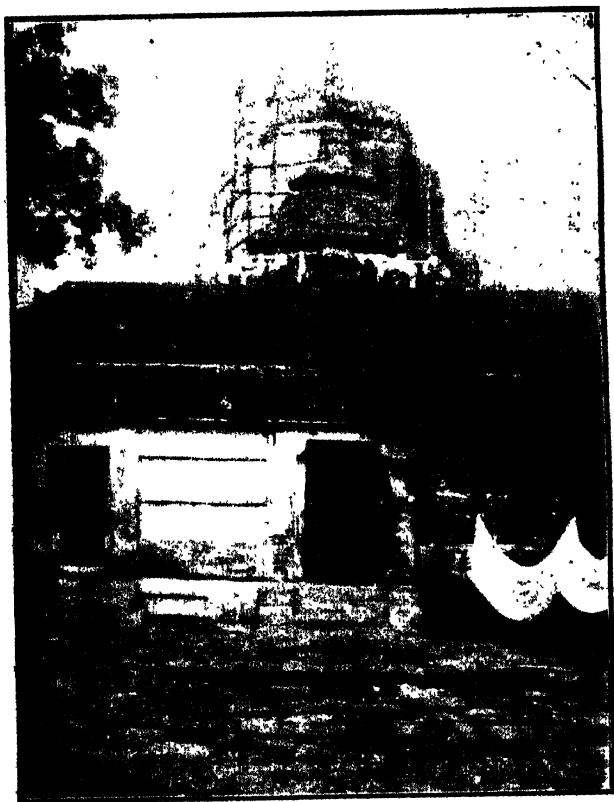
আলালনাথের শ্রীমন্দির, এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছেন।

নিজজন শ্রীহরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডবিধানরূপা অমায়ায় দয়া ও শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি শ্রীহরিদাসের সেবাবুদ্ধি ও গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটীও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক শুদ্ধ ভজনেচ্ছু ভক্তেরই সকলপ্রকার ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত, নতুবা শ্রীগৌরহরি সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও শিক্ষা দিলেন যে, কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে অপরাধাদি হইতে মুক্ত হইয়া সদ্‌গতি লাভ করেন। লোকশিক্ষার জন্য মহাপ্রভু নিজভক্ত শ্রীহরিদাসকে প্রথমে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবা স্বীকার করিয়া নিজ ভক্ত বলিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজ পার্ষদভক্ত ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলাদ্বারা মহাপ্রভু গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আচার শিক্ষা দিয়াছেন। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচরণকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন। অসচ্চরিত্র ও গোপনে ব্যভিচারপরায়ণ বৈষ্ণববেষধারী ব্যক্তিগণকে দেখিয়া যাঁহারা তাহাদিগকে মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব মনে করেন, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস-দণ্ডলীলাদ্বারা সংশোধিত হওয়া উচিত। অসচ্চরিত্র ব্যক্তি বৈষ্ণবতা দূরে থাকুক, সাধারণ মনুষ্যত্বও লাভ করে নাই,—ইহা সামাজিকগণও অবশ্য স্বীকার করেন।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

নীলাচলে বিবিধ শিক্ষা-প্রচার

পুরীতে কোন সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণ-যুবতির একটি অতি সুন্দর পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া এবং মহাপ্রভু ঐ বালককে স্নেহ করেন দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত * মহাপ্রভুকে কহিলেন,—"এই বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিবে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন দামোদরকে নবদ্বীপে শ্রীশচীমাতার তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, সাধক-জীবের জন্য যে শাসন প্রয়োজন, সিদ্ধপুরুষ বা ভগবানকে সেইরূপ শাসনের অধীন করিলে কেবল তাহা ভ্রম নহে, পরন্তু তাঁহার চরণে অপরাধ করা হয়।

অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৭-৩৮৯

* শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত—দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি। এই দুই জনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমথুরামণ্ডল হইতে ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরীতে আসিলেন। কৃষ্ণ-বিরহের আতিশয্যে তিনি রথচক্রের নীচে পড়িয়া শরীর পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"দেহত্যাগে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ভজনেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—অহৈতুকী ভক্তি।"

মহাপ্রভু সাধক জীবের জন্য এই শিক্ষা দিলেও প্রেমী ভক্ত শ্রীসনাতনের দেহত্যাগের তাৎপর্য্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬২

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে জীবের জন্য আরও অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৮

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতনের দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার ও শ্রীবৃন্দাবনের গুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার প্রভৃতি অনেক লোকহিতকর কার্য্য

করিবেন—জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে সেই বৎসর শ্রীক্ষেত্রে রাখিয়া পরের বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

শ্রীহট্ট-নিবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র গৌরসুন্দরের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, গৌরসুন্দর তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। শ্রীরামানন্দের গৃহে গমন করিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র জানিতে পারিলেন যে, শ্রীরামানন্দ প্রভু দেবদাসীগণকে নির্জ্জন উদ্যানে তাঁহার নিজের রচিত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে'র গীত ও নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীরামানন্দ রায় ছিলেন—শ্রীব্রজলীলায় শ্রীমতীর নিজ-জন। শ্রীগৌরলীলায় তিনি পরমমুক্ত বিজিতেন্দ্রিয়-শিরোমণির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সাধারণ সাধক জীব ছিলেন না। কিন্তু প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীরামানন্দের এইরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের পরম মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রের ভ্রান্তি দূর করিলেন। অতঃপর মিশ্র পুনরায় রামানন্দের নিকট গিয়া অনেক তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভু যে-কোন কবি বা সাহিত্যিকের কবিতা বা সাহিত্য শ্রবণ করিতে পারিতেন না। যে-সকল কবিত্বে ও সাহিত্যে তত্ত্ব-বিরোধ ও রসের বিপর্য্যয় আছে, তাহা মহাপ্রভুর নিকট বড়ই অপ্রীতিকর ও অসহ্য হইত। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারাই এই কথার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারাও যে-কোন কবির তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাস-দুষ্ট কাব্য, গান ও সাহিত্য কখনও

শুনিতে পারেন না, তাহা তাঁহাদের নিকট অসহনীয় হয়। অথচ ইহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না।

প্রথমে শ্রীস্বরূপ-দামোদর পরীক্ষা করিয়া দিলে পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শ্রবণ করিতেন। বঙ্গদেশীয় এক কবি মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রথমে শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভু তাহা শ্রবণ করিলেন। সভাস্থ সকলেই এই নাটকের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু শ্রীস্বরূপ প্রভু তাহাতে মায়াবাদ-দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা তিনিই বর্ণনা করিতে পারেন—যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্মকে জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়াছেন। তাহা বর্ণনা করিবার যোগ্যতা গ্রাম্য কবি ও সাধারণ সাহিত্যিকগণের হয় না।"

আধুনিক কালে অনেকের ধারণা—লৌকিক সাহিত্য ও কাব্য-রচনায় পারদর্শিতা লাভ করিলেই কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা বর্ণনা করিবার যোগ্যতা হয়। কিন্তু মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-দামোদর আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের চরণে অকপটভাবে শরণ গ্রহণ না করিয়া, একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় না করিয়া এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যভক্তগণের সঙ্গ না করিয়া শ্রীচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সাহিত্য ও গ্রন্থাদি রচনা করিবার চেষ্টা কেবল ধৃষ্টতা নহে,—তাহাতে শিব গড়িতে বানরই গঠিত হইয়া পড়ে। *

* চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯১-১৫৮

শ্রীস্বরূপ-দামোদরের এই উপদেশে সেই কবি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভগবদ্ভক্তগণের চরণে আত্মসমর্পণ ও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতা ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর-রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় শ্রীরামানন্দের শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীস্বরূপের কীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইল।

এদিকে মহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী শ্রীরঘুনাথ দাস গৃহে ফিরিয়া গিয়া বাহিরে বিষয়ী লোকের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। সপ্তগ্রামের কোন মুসলমান জমিদার নবাবের উজীরের সাহায্যে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন-দাসকে নির্য্যাতন করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহারা পলায়ন করিলেন। রঘুনাথের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সেই উৎপাত মিটিয়া গেল। রঘুনাথ নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পাণিহাটীতে গিয়া নিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞায় তথায় এক দধি-চিড়া-মহোৎসব করিলেন। সেই মহোৎসবের পরদিন নিত্যানন্দ-প্রভু রঘুনাথকে কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। রঘুনাথ সেই রাত্রিতে যদুনন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিলেন এবং তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়া একাকী গুপ্তপথে বার দিনে পুরীতে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই

নাম দিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরঘুনাথ পাঁচ দিন মহাপ্রভুর অবশেষ-প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে অযাচক-বৃত্তি * অবলম্বন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথের এই বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৬-২২৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ প্রত্যেক হরিভজনকারী ব্যক্তিরই বিশেষভাবে পালনীয়। শ্রীরঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কিছু উপদেশ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু রাগানুগ † ভক্তের পালনীয় আচার সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥

---

* নিজে যাচ্ঞা করিয়া ভিক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে কেহ নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু দিবেন, সেই আশায় বসিয়া থাকিয়া ভিক্ষা করাকে অযাচক-বৃত্তি বলে।

† রাগানুগ—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ সেবক ব্রজগোপী, নন্দ-যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম বা রক্তক-পত্রক-চিত্রকের কৃষ্ণসেবায় লুব্ধ হইয়া তাঁহাদের অনুগতভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে প্রবৃত্ত হন।

অমানী, মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭

গোবর্দ্ধনদাস পুত্র রঘুনাথের সংবাদ পাইয়া পুরীতে শ্রীরঘুনাথের নিকট লোক ও অর্থ পাঠাইলেন; কিন্তু শ্রীরঘুনাথ তাঁহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না। প্রতিমাসে মহাপ্রভুকে দুইবার নিমন্ত্রণ করিবেন, এজন্য রঘুনাথ উক্ত প্রেরিত অর্থের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু বিষয়ীর দ্রব্যগ্রহণে মহাপ্রভুর প্রীতি হয় না এবং নিমন্ত্রণকারীর কেবল সম্মান-লাভই ফল হয়, এই বিচার করিয়া অবশেষে গোবর্দ্ধনের অর্থের দ্বারা মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-সেবাও পরিত্যাগ করিলেন।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

কিছুদিন পরে রঘুনাথ সিংহদ্বারে অযাচক-বৃত্তিও পরিত্যাগ করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—

সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার।

বেশ্যাকে যেরূপ পরপুরুষের আশায় দ্বারে অপেক্ষা করিতে হয়, ভিক্ষা-প্রাপ্তির লোভে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকাও তদ্রূপই ব্যাপার-বিশেষ।

শ্রীরঘুনাথ মাধুকরী ভিক্ষা করিতেছেন শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা শ্রীরঘুনাথকে দান

করিলেন। ইহার পর রঘুনাথ পথে পরিত্যক্ত ও পর্য্যুষিত (বাসি) শ্রীমহাপ্রসাদ জলে ধৌত করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীস্বরূপ ইহাতে অধিক সন্তুষ্ট হইয়া একদিন শ্রীরঘুনাথের নিকট হইতে সেই মহাপ্রসাদ বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া আস্বাদন করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

পুরীতে শ্রীবল্লভ ভট্ট

শ্রীবল্লভ ভট্ট একবার রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীতে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের চরণে প্রণত হইলেন। বল্লভ ভট্ট গৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন; কৃষ্ণশক্তি (স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধা বা তাঁহার গণ) ব্যতীত অপর কেহ তাহা প্রচার করিতে পারেন না। আপনি কৃষ্ণশক্তিধর; তাই আজ আপনার কৃপায় জগতে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রকাশিত হইতেছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যভরে নিজের অযোগ্যতা-প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বল্লভ ভট্টের নিকট আত্মগোপন করিলেন।

আর একদিন বল্লভ ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটি টীকা রচনা করিয়াছেন ও

তাহাতে কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্টের হৃদয়ের যশোলিপ্সা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ স্বীকার করি না। শ্রীকৃষ্ণ—শ্যামসুন্দর শ্রীযশোদানন্দন,—এই মাত্র জানি।" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও বল্লভ ভট্টের নানাপ্রকার তত্ত্ববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলেন। একদিন বল্লভ ভট্ট শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জীব—প্রকৃতি, আর কৃষ্ণ—পতি। অতএব পতিব্রতাস্বরূপ জীব কিরূপে অপরের নিকট পতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে পারে?" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বল্লভ ভট্টকে সাক্ষাৎ 'ধর্ম্মবিগ্রহ' মহাপ্রভুর নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন,—"স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই পতিব্রতার ধর্ম্ম; পতি যখন নিরন্তর তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বলিয়াছেন, তখন পতিব্রতা তাঁহার স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না।"

আর একদিন বৈষ্ণব-সভায় শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীধরস্বামীর টীকা খণ্ডন করিয়া একটি নূতন ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু রহস্যচ্ছলে শ্রীবল্লভ ভট্টের ঐরূপ কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

* * "স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১১

শ্রীগৌরসুন্দর বল্লভ ভট্টকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন,—"জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামীর প্রসাদেই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য জানিতে পারি। তিনি ভক্তির একমাত্র রক্ষক। গুরুর উপরে গুরুগিরি করিতে যাওয়া ভীষণ অপরাধ। শ্রীল শ্রীধরস্বামীর অনুগত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা কর, অভিমান ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণভজন কর, অপরাধ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন কর, তবেই শ্রীকৃষ্ণচরণ লাভ করিতে পারিবে।" কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর অনুমতি লাভ করিয়া বল্লভ ভট্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী হইতে কিশোরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

বল্লভ ভট্টের ন্যায় পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তিরও শ্রীল শ্রীধরস্বামীকে 'মায়াবাদী' বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামী কেবলাদ্বৈতবাদী (মায়াবাদী) নহেন—তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী—জগদ্‌গুরু—মহাভাগবত।

ঊনাশীতিতম পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র পুরী

রামচন্দ্রপুরী-নামক এক সন্ন্যাসী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার শুদ্ধভক্তির কোন বিচার ছিল না। অন্তর্দ্ধানকালে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কৃষ্ণ-বিরহে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রন্দন করিতেছিলেন।

ইহা দেখিয়া রামচন্দ্রপুরী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে বলিলেন,—"আপনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া কেন এরূপ ক্রন্দন করিতেছেন ?" শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে ত্যাগ করিলেন।

রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু নানা উপচারে ভূরি-ভোজন করেন, মিষ্টদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি সন্ন্যাসের বিধি পালন করেন না,—এইরূপ নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। একদিবস প্রাতঃকালে রামচন্দ্রপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসস্থানে আসিয়া দেখিলেন কতকগুলি পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে তথায় বিচরণ করিতেছে। ইহা দেখিয়াই মণিময় মন্দির-মধ্যে পিপী-লিকার ছিদ্র-দর্শনের ন্যায় স্বাভাবিক ছিদ্রানুসন্ধিৎসু রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—"রাত্রিকালে এই স্থানে নিশ্চয়ই ইক্ষুজাত গুড় ছিল, তজ্জন্যই পিপীলিকাসকল বিচরণ করিতেছে। অহো! বিরক্ত সন্ন্যাসিগণেরও কি এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা!" এই কথা বলিয়াই রামচন্দ্রপুরী স্থান ত্যাগ করিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সেইদিন হইতে তাঁহার দৈনিক আহারের পরিমাণ খুব কমাইয়া ফেলিলেন।

রামচন্দ্রপুরী বিশেষ কুটীলস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। লোককে নিজেই অনুরোধ করিয়া অধিক ভোজন করাইতেন, আবার নিজেই সেই লোককে 'অত্যাহারী' বলিয়া নিন্দা করিতেন। গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর উপেক্ষার ফলে রামচন্দ্রপুরীর ভগবচ্চরণে অপরাধ করিবার স্পৃহা জাগিয়াছিল।

গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ঠেকয় ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৮।৯৬

রামচন্দ্রপুরী ও অমোঘের ন্যায় চিত্তবৃত্তি আমাদের অনেকেরই আছে। আমরা অনেক সময় ভগবান্ ও মহাভাগবত বৈষ্ণবকেও কাম-ক্রোধ-লোভের অধীন সাধক জীবের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহাদের আহার-বিহারাদির নিন্দা করিয়া থাকি। শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলাদ্বারা আমাদের এই দুর্ব্বুদ্ধিকে শাসন করিয়াছেন।

অশীতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র * ও শ্রীরায় রামানন্দের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক তখন উড়িষ্যার রাজার অধীনে কার্য্য করিতেন। গোপীনাথ রাজকোষের কিছু অর্থ নষ্ট করায় যুবরাজ গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। মহাপ্রভুকে গজপতি

* ভবানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র—(১) রামানন্দ রায়, (২) গোপীনাথ পট্টনায়ক, (৩) কলানিধি, (৪) সুধানিধি ও (৫) বাণীনাথ। ইঁহারা উৎকলের করণ-বংশে আবির্ভূত হন।

প্রতাপরুদ্র বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, রায় রামানন্দও মহাপ্রভুর বিশেষ আদরের পাত্র,—ইহা জানিয়া কতিপয় ব্যক্তি গোপীনাথের প্রাণরক্ষার্থ রাজাকে অনুরোধ করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু ঐরূপ বিষয়-কথায় তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই জানাইয়া গোপীনাথকে তিরস্কার করিলেন। পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া গোপীনাথের অপরাধের জন্য সবংশে বাণীনাথ প্রভৃতি মহাপ্রভুর ভক্তেরও রাজদ্বারে বন্ধনের কথা জানাইলে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তোমরা কি বলিতে চাহ যে, আমি রাজার নিকট গিয়া বাণীনাথের বংশের জন্য আঁচল পাতিয়া অর্থ ভিক্ষা করিব?"

কিছুক্ষণ পরে গোপীনাথকে প্রাণদণ্ডের জন্য খড়্গের উপরে পাতিত করা হইতেছে—এইরূপ সংবাদ আসিল। মহাপ্রভুকে এই কথা জানাইলেও তিনি বলিলেন,—"আমি ভিক্ষুক ব্যক্তি, আমি কি করিব? তোমরা এই কথা শ্রীজগন্নাথকে জানাও।"

এদিকে হরিচন্দন মহাপাত্র মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট গিয়া গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা করিলে প্রতাপরুদ্র বলিলেন যে, তিনি এই সকল কথা কিছুই শুনেন নাই। যাহাতে গোপী-নাথের প্রাণরক্ষা হয়, তজ্জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে হরিচন্দন যুবরাজকে বলিয়া গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অনন্তর মহাপ্রভু বাণীনাথের রাজদণ্ডের সংবাদ-দাতাকে বাণীনাথের তৎকালের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে

পারিলেন যে, যখন বাণীনাথকে রাজদ্বারে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন বাণীনাথ দুই হস্তের করে সংখ্যা রাখিয়া নির্ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইলেন।

কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন যে, তিনি আলালনাথ চলিয়া যাইবেন, পুরীতে থাকিয়া বিষয়ীর ভাল-মন্দ কথা শুনিতে চাহেন না।

ইহা শুনিয়া কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া সকাতর নিবেদন করিলেন যে, শ্রীরামানন্দের অনুজ গোপীনাথ কখনই মহাপ্রভুর নিকট নিজের প্রাণরক্ষার জন্য প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করিবার কথা বলেন নাই। মহাপ্রভুর দ্বারা নিজের কোনপ্রকার সেবা করাইয়া লওয়া গোপীনাথের উদ্দেশ্য নহে; তবে তাঁহার হিতৈষিগণ গোপীনাথকে মহাপ্রভুর শরণাগত ভক্ত জানিয়া ও তাঁহার নিধনের উদ্যোগ দর্শন করিয়া গোপীনাথের প্রাণরক্ষার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইয়াছেন। গোপীনাথ মহাপ্রভুর কৃপায় শুদ্ধভক্তের স্বরূপ শ্রবণ করিয়াছেন —

সেই শুদ্ধ ভক্ত, যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী॥

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে সর্ব্বক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তা'রে তোমার চরণ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৯।৭৫-৭৬

কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন যে, কেহই তাঁহাকে কখনও কোন বিষয়ীর কথা শুনাইবেন না। তিনি কৃপাপূর্ব্বক পুরীতেই অবস্থান করুন।

এদিকে কাশীমিশ্রের সহিত প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎকার হইলে মিশ্র প্রতাপরুদ্রের নিকট মহাপ্রভুর পুরী পরিত্যাগ করিয়া আলালনাথ যাইবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া প্রতাপরুদ্র বড়ই ব্যথিত হইয়া মিশ্রকে অনুরোধ করিলেন যে, মহাপ্রভু যাহাতে কোনরূপে পুরী ত্যাগ না করেন, তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন করিতে হইবে। মহাপ্রভু ব্যতীত রাজ্য-ঐশ্বর্য্য —কিছুরই মূল্য নাই।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রকে মহাপ্রভুর নিকট ভবানন্দ-গোষ্ঠীর প্রতি তাঁহার (রাজার) স্বাভাবিক-প্রীতির কথাও জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। এদিকে যুবরাজ গোপীনাথকে ডাকাইয়া তাঁহাকে সমস্ত দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন ও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের দৈন্য ও ঔদার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সেই সময় ভবানন্দ রায়ও পঞ্চ পুত্রের সহিত মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিলেন,—'জাগতিক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়াই শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপার মুখ্য ফল নহে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিই তাঁহার অকপট কৃপার ফল। রায় রামানন্দ ও বাণীনাথ মহাপ্রভুর সেইরূপ শুদ্ধকৃপা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। মহাপ্রভুর ঐরূপ কৃপা আমি কবে লাভ করিতে পারিব ?'

কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্য ফল'।
'ফলাভাস' এই—যা'তে 'বিষয়' চঞ্চল॥
রামরায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, য'াতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধকৃপা কর, গোসাঞি, **ঘুচাহ** 'বিষয়'।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয়॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৩৭-১৩৯

একাশীতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীরাঘবের ঝালি

গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুনরায় পুরীতে যাত্রা করিলেন। পানিহাটার রাঘব পণ্ডিত তাঁহার ভগ্নী দময়ন্তীর নির্ম্মিত নানাপ্রকার প্রভু-প্রিয় খাদ্যদ্রব্য ঝুলি ও ঝুড়িতে ভরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য পুরীতে লইয়া আসিলেন। ইহাই রাঘবের **'ঝালি'** নামে প্রসিদ্ধ।

বৈষ্ণব-গৃহিণী ও মহিলাগণ দূর হইতে এইরূপ-ভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেক বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়া যাইতেন এবং সম্বৎসর গৃহে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর সেবা-স্মৃতিতে

বিভাবিত থাকিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় ভোজ্য-সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিতেন। অতএব গৃহে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের গৃহ গোলোকের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত থাকিত। তাঁহাদের সংসার কৃষ্ণের সংসারেই পর্য্যবসিত হইত। দেহ-সম্পর্কীয় পতি, পুত্র বা পরিবার-পরিজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, আহারের সংস্থান, তাঁহাদের বিলাসোপকরণ-সংগ্রহ, বহির্ম্মুখ-সামাজিকতা ও লৌকিকতা পালন করিয়া যাহারা মায়ার সংসার করেন, তাহাদের সংসার হইতে বৈষ্ণব গৃহস্থ ও বৈষ্ণবের সহধর্ম্মিণীগণের সংসার যে সম্পূর্ণ পৃথক, তাহা আমরা গৌড়ীয় ভক্তগণের আদর্শে দেখিতে পাই। বৈষ্ণব গৃহস্থগণ মহাপ্রভুর সেবার জন্য গৃহে বাস করিতেন এবং চাতকের ন্যায় উৎকণ্ঠিত থাকিতেন,—কবে নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের উপদেশামৃত-বৃষ্টি-ধারা পান করিবেন।

দময়ন্তী মহাপ্রভুর সেবায় কিরূপ আবিষ্ট হইয়া বিচিত্রতাপূর্ণ ঝালি সাজাইতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। আম্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি, নেম্বু-আদা-আম্রকলি, আম্‌সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্ত্বা, পুরাণ সুখ্‌তা, ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল-দ্বারা চিনির পাক করা নাড়ু, শুণ্ঠিখণ্ড, কোলিশুণ্ঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড, শতপ্রকার আচার, নারিকেল-খণ্ড, গঙ্গাজলী নাড়ু, চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার, চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার, বিবিধ প্রকার অমৃত-কর্পূর, শালিধান্যের আতপ চিড়া, ঘৃতভর্জ্জিত হুড়ুম, শালিধান্যের তণ্ডুল-ভাজা-চূর্ণদ্বারা চিনির পাক করা নাড়ু প্রভৃতি সহস্র সহস্র

ভোজ্যদ্রব্য রাঘবের নির্দেশানুসারে দময়ন্তীদেবী পরম স্নেহ-ভক্তির সহিত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গঙ্গামৃত্তিকার পর্পটী ও অপর মৃৎপাত্রে চন্দনাদি পরিপূর্ণ করিয়া রাঘব পরম যত্নের সহিত ঝালি সাজাইলেন এবং ঝালির মুখ বন্ধ করিয়া তাহার উপর মোহর প্রদান করিলেন। এই ঝালির 'মুন্‌সিব' অর্থাৎ পরিদর্শক ও পরিচালক হইলেন—পানিহাটী-গ্রামবাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিতের অনুগত শ্রীগৌরসেবাগত-প্রাণ শ্রীমকরধ্বজ কর। তিনি সযত্নে ঝালি-রক্ষক হইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সহিত মহা-আর্ত্তি-সহকারে নীলাচলের পথে চলিলেন।

দ্ব্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রসরোবরে চন্দনযাত্রা

পূর্ব্বকালে 'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-নামক এক মহাসদ্‌গুণ-বিভূষিত বৈষ্ণব ভূপতি ছিলেন। মালবদেশের অন্তর্গত অবন্তিপুরী তাঁহার রাজ-ধানী ছিল। ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ও সেবক ছিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীজগন্নাথদেব বৈশাখ-মাসের শুক্ল-পক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া-তিথিতে সুগন্ধ চন্দনের দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ লেপন করিবার আদেশ করেন। জগতের লোক নিজের ভোগের দেহে

নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য ও প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা এই নশ্বর দেহেতে আসক্তিই বর্দ্ধিত হয়; এজন্য ভগবদ্-ভক্তগণ ঐ সকল দ্রব্য ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিয়া অনায়াসে দেহাসক্তি ছেদন ও ভগবানে প্রীতি লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর, পুরী : এই সরোবরে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত জলকেলি করিতেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের এই আজ্ঞা অনুসরণ করিয়া এখনও অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অষ্টমী-তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের তীরে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদন-মোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী লোকনাথ মহাদেবাদির সহিত সরোবরে

শ্রীনরেন্দ্রসরোবর বা চন্দনপুকুর ঃ চন্দন-যাত্রাকালে এই সরোবরে শ্রীমদনমোহনের নৌকাবিলাস হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে ভক্তগণসহ জলকেলি করিয়াছিলেন।

নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দন-যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর 'চন্দনপুকুর' নামেও কথিত হয়।

গৌড়ীয় ভক্তগণ চন্দন-যাত্রার দিনই নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ব্বেই শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলাভিমুখে আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কটক পর্য্যন্ত শ্রীমহা-প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং আঠারনালা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয়-গোষ্ঠী ও শ্রীগৌরসুন্দর-প্রমুখ নীলাচল-গোষ্ঠীর পরস্পর মিলনে মহানন্দ-সাগর উচ্ছলিত হইল। নৃত্য-গীত-সংকীর্ত্তনের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন নরেন্দ্র-সরোবরের শ্রীমদনমোহনের নৌকাবিলাস হইতে-ছিল, সেই সময় মহাপ্রভুও সরোবরের মধ্যে ভক্তগণের সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যের ধ্বনি ও সংকীর্ত্তনের মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। গৌড়দেশীয় ও উৎকলবাসী ভক্তগণ একযোগে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জলকেলির পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গেলেন। গৌড়ীয়ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কথামৃত পান করিতে লাগিলেন।

—০—

ত্র্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

‘বেড়া-সংকীর্ত্তন’—‘পরিমণ্ডল-নৃত্য’

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ‘সংকীর্ত্তনের পিতা’ বা ‘প্রবর্ত্তক’ বলা হয়। বহু লোক মিলিত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন, তাহাকেই ‘সংকীর্ত্তন’ বলে। বহু লোকের মধ্যে শ্রীভগবানের মহিম-প্রচার ও শ্রীভগবদ্-ভজনের এইরূপ সহজ-পথ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সংকীর্ত্তনের মধ্যে ‘বেড়া-সংকীর্ত্তন’ ও ‘পরিমণ্ডল-নৃত্য’ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা যেন ব্যূহ রচনা করিয়া বিশিষ্ট সংকীর্ত্তন-সেনাপতির নিয়ামকত্বে সংকীর্ত্তন-সেনাগণের অভিযান-বিশেষ। মন্দির বা কোন স্থান বেষ্টন করিয়া নৃত্য-সংকীর্ত্তনকেই ‘বেড়া-সংকীর্ত্তন’ বলে। জগন্নাথের মন্দিরের ‘জগমোহনে’র যে-স্থলে ভক্তগণ নৃত্য করেন, তাহাকে ‘পরিমণ্ডল’ বলে।

শ্রীগৌরহরি নীলাচলে সাতটি সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া একদিন ‘বেড়া-সংকীর্ত্তন’ ও ‘পরিমণ্ডল-নৃত্য’ আরম্ভ করিলেন। এক এক সম্প্রদায়ে এক একজন নৃত্যকারী নির্দ্ধারিত হইল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস, শ্রীসত্যরাজ খাঁন্ ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর—এই সাতজন সাতটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন। মহাপ্রভু

এই সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মনে করিলেন যে, একমাত্র তাঁহাদের গোষ্ঠীর মধ্যেই মহাপ্রভু উপস্থিত আছেন। সমস্ত উৎকলবাসী এইরূপ অদ্ভুত সংকীর্ত্তন দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র পরিজনসহ এই সংকীর্ত্তন দর্শন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্রভুর প্রেমানন্দ-সাগর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমহাপ্রভুকে ক্রমশঃ বাহ্যদশায় আনিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মন্দস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে বাহ্যদশা লাভ করিয়া ভক্তগণের সহিত সমুদ্র-স্নান করিতে গেলেন ও তৎপরে ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

চতুরশীতিতম পরিচ্ছেদ

'সেবা সে নিয়ম'

মহাপ্রভু প্রসাদ-সেবনের পর গম্ভীরার * দ্বারে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। সেবক গোবিন্দের একটি প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল যে, যখন মহাপ্রভু প্রসাদ-সম্মান করিয়া বিশ্রাম করিতেন, গোবিন্দ

* চাতাল বা বারান্দার পর দালান, উহার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' কহে।

সেই সময় প্রভুর পাদ-সম্বাহন-সেবা করিতেন এবং মহাপ্রভু নিদ্রিত হইলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ * গ্রহণার্থ গমন করিতেন। সেইদিন মহাপ্রভু অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় গম্ভীরার সমস্ত দ্বার ব্যাপিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং গোবিন্দ ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রভুর পাদ-সেবন করিতে না পারায় প্রভুকে কিঞ্চিৎ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক গমনের স্থান প্রদানের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি সরিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা কর।" তখন গোবিন্দ অগত্যা নিজের বহির্ব্বাসদ্বারা মহা-প্রভুর শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া মহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন ও প্রভুর পাদ-সম্বাহন-সেবা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু প্রায় এক ঘণ্টা কাল নিদ্রা গেলেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে দেখিয়া অত্যন্ত ভৎ'সনা করিলেন ও এতক্ষণ অনাহারে তথায় বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন,—"আপনি দ্বারে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই?" মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি যে-ভাবে ভিতরে আসিয়াছিলে, সেই ভাবে প্রসাদ-সেবনের জন্য বাহিরে গেলে না কেন?" গোবিন্দ নিরুত্তর হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—

* * "আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥

* মহাপ্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ।

সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥

—চৈঃ চঃ অঃ ১০।৯৫-৯৬

"সেবাই আমার মূল লক্ষ্য, সেবা করিতে গিয়া যদি আমার নরকে গমন হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু আমার নিজের ভোগের জন্য আমি অপরাধের আভাস-মাত্রকেও ভয় করি।

পুরীতে কাশীমিশ্রের গৃহ নামে পরিচিত 'গম্ভীরা' গৃহের দ্বার

মহাপ্রভুর সেবার প্রয়োজনেই মহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এখন নিজের প্রয়োজনে কিছুতেই তাহা আর করিতে পারি না।"

পাঠক ! গোবিন্দের এই সেবার আদর্শে শুদ্ধভক্তির রহস্য-বিজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত কখনও নিজের সুখ, শান্তি বা তৃপ্তির জন্য সেবার ছলনা করেন না। যাহাতে কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা, ভুক্তি-মুক্তি-কামনা লুক্কায়িত থাকে, তাহার বাহ্য আকার সেবার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও, তাহা সেবা নহে—উহা সেবার নামে ভোগ, ভক্তির নামে ভুক্তি।

পঞ্চাশীতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণ

শ্রীশিবানন্দ সেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাপ্রভুর দর্শন করিতে আসিলেন। মহাপ্রভু শিবানন্দের পুত্রের নাম জিজ্ঞাসা করিলে শিবানন্দ জানাইলেন যে, বালকের নাম—শ্রীচৈতন্যদাস। মহাপ্রভু নিজের দাস্য-সূচক নাম-শ্রবণে আত্ম-গোপন করিবার ছলে শিবানন্দকে বলিলেন,—"তুমি এ কি নাম রাখিয়াছ ? ইহা কিছুই বুঝা যায় না।"

শ্রীশিবানন্দ বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ চিত্তে যাহা স্ফূর্ত্তি করাইয়াছেন, সেই নামই রাখিয়াছি।" ইহার পর শ্রীশিবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং জগন্নাথের বহু-মূল্য

প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। শিবানন্দের প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ মহাপ্রভু প্রসাদ সম্মান করিলেন সত্য, কিন্তু ঐ প্রকার অতিগুরু দ্রব্য-ভোজনে মহাপ্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া আর একদিন শ্রীচৈতন্যদাস মহাপ্রভুকে অগ্নিমান্দ্য-নাশক দধি, লেবু, আদা প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা সেবা করিলেন। এই সকল দ্রব্য দেখিয়া মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন,—"এই বালক আমার অভিমত জানে। আমি ইহার নিমন্ত্রণে সন্তুষ্ট হইয়াছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রভু দধি-অন্ন ভোজন ও শ্রীচৈতন্যদাসকে নিজের উচ্ছিষ্ট প্রদান করিলেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্যদাস অপ্রাকৃত কবি বলিয়া বিখ্যাত হন। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-গ্রন্থের একটি সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন।

ষড়শীতিতম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীগৌরসুন্দরের বাসস্থানের নিকটে নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে* বাস করিয়া নিরন্তর সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করিতেন। একদিন শ্রীগোবিন্দ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট শ্রীমহাপ্রসাদ লইয়া গিয়া দেখিলেন,—ঠাকুর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ও অতি ধীরে ধীরে সংখ্যা-নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রসাদের একটি কণামাত্র সম্মান করিলেন। আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া শ্রীহরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীহরিদাস বলিলেন,—

শরীর স্বস্থ হয় মোর, অস্বস্থ বুদ্ধি-মন ॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস, তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে ?" হরিদাস উত্তর করিলেন,—"আমার সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন পূর্ণ হইতেছে না, ইহাই আমার ব্যাধি।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমার সিদ্ধদেহ, সুতরাং ঐরূপ সাধনাভিনয়ে আগ্রহের কি প্রয়োজন ?"

হরিদাস মহাপ্রভুর নিকট অনেক দৈন্য করিলেন ও তাঁহার একটি বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের

* ঐ স্থান 'সিদ্ধবকুল'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল

একান্ত অভিলাষ—তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগল হৃদয়ে ধারণ ও তাঁহার চন্দ্রবদন দুই নয়নে দর্শন করিয়া মুখে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্হিত হন। কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পর আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিবেন না।

মহাপ্রভু সেইদিন চলিয়া গেলেন ও পরদিন প্রাতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিবার পর ভক্তগণকে লইয়া পুনরায় শ্রীহরিদাসের নিকট আগমন করিলেন। হরিদাসের কুটীরের সম্মুখে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল—সকলে হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তখন সকল বৈষ্ণবের নিকট হরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্ণবগণ শ্রীহরিদাসের চরণে প্রণত হইলেন। হরিদাস সম্মুখে মহাপ্রভুকে বসাইয়া প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুর চরণযুগল লইয়া নিজের হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, সমস্ত ভক্তের পদরেণু মস্তকে মাখিলেন ও পুনঃ পুনঃ মুখে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু' —এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মের নির্য্যাণের ন্যায় ঠাকুর হরিদাসের 'মহাপ্রয়াণ' হইল। সকলে 'হরি, কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া মহাসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমানন্দে অতীব বিহ্বল হইলেন।

মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া ভক্ত-গণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন।

হরিদাসের চিদানন্দ দেহকে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"আজ হইতে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" মহাপ্রভুর ভক্তগণ হরিদাসের পদধৌত জল পান করিলেন, হরিদাসের অঙ্গে প্রসাদী চন্দন লেপন করিলেন এবং বস্ত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ঐ দেহ বালুকার গর্ত্তে শয়ন করাইলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং 'হরি বল, হরি বল' বলিতে বলিতে নিজ-হস্তে হরিদাস ঠাকুরকে সমাধিস্থ করিলেন এবং তাঁহার উপরে বালি দিয়া তদুপরি সমাধিপীঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। অনুক্ষণ ভক্তগণের কীর্ত্তন ও নৃত্য হইতে লাগিল। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের সমাধিপীঠ প্রদক্ষিণ করিলেন ও হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিলেন। "হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের জন্য আমাকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দাও"—এই বলিয়া মহাপ্রভু পসারিগণের নিকট হইতে স্বয়ং আঁচল পাতিয়া মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন।

প্রচুর প্রসাদ সংগৃহীত হইল; ঠাকুর হরিদাসের বিরহ-মহোৎসবে মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ-হস্তে সকলকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন; পরে পুরী-ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রসাদ সম্মান করিলেন। ভক্তগণ আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের বিরহে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ১১।৯৪

সপ্তাশীতিতম পরিচ্ছেদ

পুরীদাস ও পরমেশ্বর মোদক

প্রতি বৎসরের ন্যায় গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের তিন পুত্রও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীশিবানন্দ কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'শ্রীপরমানন্দপুরীদাস' রাখিয়াছিলেন। যখন শ্রীশিবানন্দ বালক পরমানন্দকে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বালকের মুখে নিজে পদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিলেন। বালক সেই অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিল। এই পরমানন্দ-দাসই 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'র প্রসিদ্ধ রচয়িতা কবিকর্ণপূর গোস্বামী। ইহার রচিত 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ', 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' প্রভৃতি গ্রন্থও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামণি-স্বরূপ।

নবদ্বীপে বাল্যলীলা-কালে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুরের পরমেশ্বর মোদক নামক এক মোদকের (ময়রার) গৃহে দুগ্ধ-খণ্ডাদি মিস্টান্নের জন্য প্রায়ই গমন করিতেন। সেই পরমেশ্বর মোদক এই বৎসর তাঁহার পত্নীর সহিত পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। উক্ত মোদক মহাপ্রভুর বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে মুকুন্দের মাতাও (নিজ-

পত্নী) আসিয়াছে।” সন্ন্যাসীর আদর্শ-প্রদর্শনকারী লোকশিক্ষক মহাপ্রভু মুকুন্দের মাতার নাম শুনিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু সরল গ্রাম্যস্বভাব মোদককে কিছু বলিলেন না।

অষ্টাশীতিতম পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ শ্রীশিবানন্দসেনের গৃহ হইতে এক কলসী সুগন্ধি চন্দনাদি-তৈল বহু যত্নের সহিত আনয়ন করিয়া মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য গোবিন্দের হস্তে প্রদান করিলেন। লোকশিক্ষক মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য গোবিন্দকে বলিলেন,—“একে ত' সন্ন্যাসীর কোনও তৈলেই অধিকার নাই, তাহাতে আবার সুগন্ধি তৈল ! এই তৈল শ্রীজগন্নাথের সেবায় দাও, উহাতে তাঁহার প্রদীপ জ্বলিবে—জগদানন্দের পরিশ্রম সফল হইবে।”

দশদিন পরে আবার গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জগদানন্দের অনুরোধ জানাইলে মহাপ্রভু ক্রোধ-প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—“যখন জগদানন্দ তৈল দিয়াছে, তখন একজন মর্দ্দনিয়াও দরকার। এই সুখের জন্যই ত' সন্ন্যাস করিয়াছি ! আমার সর্ব্বনাশ, আর তোমাদের পরিহাস ! পথে চলিবার কালে যখন লোকে

তৈলের গন্ধ পাইবে, তখন আমাকে 'দারি-সন্ন্যাসী' বলিয়া স্থির করিবে।"

পণ্ডিত জগদানন্দ গোবিন্দের মুখে মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া প্রণয়াভিমানরোষে মহাপ্রভুর সম্মুখেই তৈলভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তপ্রেমবশ মহাপ্রভু ভক্তের মানভঙ্গ করিবার জন্য তৃতীয় দিবসে জগদানন্দের গৃহে গেলেন ও স্বয়ং উপযাচক হইয়া পণ্ডিতের দ্বারা রন্ধন করাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং পণ্ডিতকে প্রসাদ সেবন করাইলেন।

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণের দ্বারা একমাত্র পরমেশ্বরেরই স্বারসিকী * সেবা করিতে হইবে। সাধক নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করিয়া আদর্শ জীবন যাপনপূর্ব্বক হরিসেবা করিবেন। তিনি কখনও ভগবানের ভোগের বা মহাভাগবতের চেষ্টার অনুকরণ করিবেন না।

কৃষ্ণ-বিরহানলে মহাপ্রভুর দেহ সর্ব্বদা তপ্ত থাকিত বলিয়া তিনি কলার খোলে শয়ন করিতেন। মহাপ্রভুর এইরূপ বৈরাগ্যের আচরণ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা হইত। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর জন্য গেরুয়া বর্ণের আচ্ছাদন দিয়া তোষক-বালিশ তৈয়ার করাইলেন। মহাপ্রভু কিন্তু তাহা অঙ্গীকার

---

* স্বারসিকী—স্ব=নিজ, রসের অনুযায়ী সেবা। অর্থাৎ নিজের যে যে জিনিষ ভোগ করিতে রুচি হয়, সেই সকল জিনিষ নিজে ভোগ না করিয়া তাহা ভগবানের ভোগে নিযুক্ত করা।

করিলেন না। অবশেষে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু শুষ্ক কলার পাত নখে চিরিয়া চিরিয়া তাহা বহির্ব্বাসের মধ্যে ভরিয়া তোষক-বালিশ করিয়া দিলেন। অনেক চেষ্টার পর মহাপ্রভু তাহা ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই লীলার দ্বারাও মহাপ্রভু সাধক-সন্ন্যাসিগণকে বৈরাগ্যের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

ঊননবতিতম পরিচ্ছেদ

দেবদাসীর 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-গান

একদিন মহাপ্রভু দূর হইতে শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র একটি পদ-গান শুনিতে পাইলেন। স্ত্রী, কি পুরুষ—কে গান করিতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে আত্মহারা ও অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া কণ্টকবনের মধ্য দিয়া গায়িকা দেব-দাসীর দিকে ধাবিত হইতেছিলেন। সেবক গোবিন্দ মহাপ্রভুকে অবরোধ করিয়া উহা স্ত্রীলোকের সঙ্গীত বলিয়া জানাইলেন। 'স্ত্রী'-নাম শুনিবা-মাত্র মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—

* * গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার।

—চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৫-৮৬

মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-শ্রবণের ছলে রমণীর মধুর কণ্ঠ ও রূপ উপভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন-পিপাসা—যাহা ভবিষ্যতে সহজিয়া-সম্প্রদায়ে সংক্রামক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণগান-শ্রবণের ছলনা করিয়া সন্ন্যাসী বা সাধক জীবের পক্ষে স্ত্রীলোকের গান শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে। সাধক জীব এই বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ সাবধান থাকিবেন।

নবতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট

শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী শ্রীকাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার সময় রামদাস বিশ্বাস নামক রামানন্দি-সম্প্রদায়ের জনৈক পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। রামদাসের অন্তরে মুক্তির পিপাসা ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ছিল, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু রামদাসের বাহ্য-দৈন্য ও বৈষ্ণব-সেবার অভিনয় দেখিয়াও তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া পরম বৈষ্ণব তপনমিশ্রের ও মিশ্রসহধর্ম্মিণীর সেবার জন্য পুনরায় কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীরঘুনাথদাস

গোস্বামী প্রভুর বৃদ্ধ মাতাপিতা পুত্রের পরমার্থে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে তাঁহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ চরণপ্রান্তে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরঘুনাথ ভট্টের বৃদ্ধ মাতাপিতা ভগবানের একান্ত সেবক-সেবিকা ছিলেন। তাই মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বৃদ্ধ মাতাপিতার অন্তর্দ্ধানের পর নীলাচলে আগমন করিবার আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেবার্থ গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মাতাপিতার কৃষ্ণপ্রাপ্তির পর নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে নিজের নিকট আট মাস-কাল রাখিবার পর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে আদেশ করিলেন।

মহাপ্রভুর এই লীলার একটি মহতী শিক্ষা আছে। যে ব্যক্তি সংসারে প্রবিষ্ট হন নাই, অথচ যাঁহার হৃদয়ে হরিভজনের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাকে সংসারী হইবার প্ররোচনা দিলে তাঁহার প্রতি হিংসাই করা হয়। আবার মহাপ্রভু বৈষ্ণব মাতাপিতার সেবার সুযোগের ছলনায় নূতন করিয়া সংসার পত্তন বা ভোগময় সংসারে প্রবেশের যে প্রচ্ছন্ন ভোগবৃত্তি মানবের হৃদয়ে আছে, তাহাও (শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া) নিবারণ করিয়াছেন।

একনবতিতম পরিচ্ছেদ

উৎকলবাসিনী ভক্তমহিলা

মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণ-ভক্তের আদর্শ জগতের জীবকে শিক্ষা দান করিবার জন্য কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

> কৃষ্ণ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-রূপ করে আরাধনে।
> অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই যিনি বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনাকারিণী বলিয়াই তাঁহার নাম 'শ্রীরাধা'। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তিনি কখনও কৃষ্ণের দ্বারা নিজের ভোগ সাধন করাইয়া লইবার জন্য সচেষ্ট নহেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে কি করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিবেন, তজ্জন্যই উন্মত্ত। এই উন্মাদই 'দিব্য উন্মাদ' বলিয়া ভক্তি-শাস্ত্রে কথিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজকে সেই শ্রীরাধারাণীর একজন দাসী অভিমান করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার একটি শিক্ষা আছে। পাছে নিজকে 'রাধা'-অভিমান করিলে লোকে 'আমি রাধা' এই কল্পনা করিয়া অহংগ্রহোপাসনার * প্রশ্রয় প্রদান

---

* ২৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

করে, এইজন্য মহাপ্রভু আপনাকে শ্রীরাধারাণীর দাসী বলিয়া অভিমান করিতেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, মুরলীবদন শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরাধারাণীর সহিত গোপীমণ্ডলীবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। এদিকে মহাপ্রভুর উঠিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন। মহাপ্রভু জাগরিত হইয়া অতিশয় কৃষ্ণবিরহ-বিধুর হইয়া পড়িলেন। অভ্যাসবশে নিত্যকৃত্য সম্পাদন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের নাট্য-মন্দিরে একটি গরুড়স্তম্ভ আছে। উহা গর্ভমন্দির হইতে বহু দূরে অবস্থিত। মহাপ্রভু সেই গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতেন। ইহার দ্বারা মহাপ্রভু শিক্ষা দিতেন যে, শ্রীগরুড় শ্রীনারায়ণের নিত্য-পার্ষদ ভক্ত; তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়াই অর্থাৎ শ্রীভগবানের শুদ্ধ ভক্তের অনুগত হইয়াই শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য আর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করেন।

মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভ হইতে ভাবাবেশে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখভাগ হইতেও লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীজগন্নাথের দর্শন করিতেছিল। এমন সময় একজন উৎকলবাসিনী নারী অত্যন্ত ভীড়ের মধ্যে শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণপূর্ব্বক গরুড়ের স্তম্ভের উপর আরোহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। ইহা

দেখিয়া গোবিন্দ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে নীচে নামাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সেবায় বাধা দেওয়া উচিত নহে। ইনি ইচ্ছামত শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করুন।" স্ত্রীলোকটি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন অবিলম্বে অবতরণ করিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু সেই মহিলার আর্ত্তি-দর্শনে বলিতে লাগিলেন,—"অহো! শ্রীজগন্নাথের সেবায় আমার ত' এইরূপ আর্ত্তি লাভ হয় নাই! ইহার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই জগন্নাথের পাদপদ্মে আবিষ্ট, তাই অপরের স্কন্ধে যে পদস্থাপন করিয়াছেন, সেই বাহ্যজ্ঞানও তাঁহার নাই। এই মহিলা পরমা ভাগ্যবতী, আমি ইহার কৃপা প্রার্থনা করি। ইহার কৃপায় যদি আমার কোনদিন ঐরূপ আর্ত্তির উদয় হয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই লীলার দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে, ঐকান্তিক কৃষ্ণ-সেবোপকরণকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে স্ত্রী-পুরুষাদি বাহ্য পরিচয়ে দর্শন করা উচিত নহে। যতক্ষণ আমাদের প্রকৃতিজাত স্ত্রী ও পুরুষ—এইরূপ অভিমান থাকে, ততক্ষণ শ্রীজগন্নাথের দর্শন হয় না, তাঁহার সেবার জন্য প্রকৃত আর্ত্তিও হয় না। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবায় আবিষ্ট, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবার উপকরণসমূহ দর্শন করেন।

দ্বিনবতিতম পরিচ্ছেদ

দিব্যোন্মাদ

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণবিরহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাত্রিতে তিনি শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ করিতে করিতে কতভাবেই না কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতেন। এক রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শয়ন-কক্ষের তিনটি দ্বারই বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রিতে প্রভুর কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া গোবিন্দ ও স্বরূপের সন্দেহ হইল। কোন-প্রকারে দ্বার খুলিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন— সমস্ত ঘরের দ্বার বন্ধ থাকা-সত্ত্বেও মহাপ্রভু ঘরে নাই। স্বরূপাদি ভক্তগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহ-দ্বারের উত্তরে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ভক্তগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে মহাপ্রভুর জ্ঞান হইল। ভক্তবৃন্দ প্রভুকে ঘরে লইয়া গেলেন।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ চটকপর্ব্বত* -দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-জ্ঞান হইল। মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিতে

* শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীটোটা গোপীনাথের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যে বালির পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ স্তূপ আছে, তাহা 'চটকপর্ব্বত' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবা প্রকাশিত হইয়াছেন।

করিতে বায়ুবেগে পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার দেহে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় শ্রীরাধার দাসী-অভিমানে নিজের ভাবাবস্থাসমূহ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে মহাপ্রভু রাত্রিদিন কৃষ্ণবিরহে প্রেমাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার কখনও অন্তর্দ্দশা, কখনও অর্দ্ধবাহ্য-দশা,

চটক-পর্ব্বত—ইহার উপরে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রতিষ্ঠিত চটক কুটীর বিরাজিত

কখনও বা বাহ্যস্ফূর্ত্তি। কেবল স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে তিনি স্নান, দর্শন, ভোজন প্রভৃতি করিতেন। তিনি মহাভাবে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দের কণ্ঠ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের জন্য বিলাপ করিতেন। আপনাকে গোপীর দাসী অভিমান করিয়া ও পুষ্পোদ্যানসমূহকে শ্রীবৃন্দাবনরূপে দর্শন করিয়া তথায় প্রবেশ

করিতেন এবং তরু-লতা-গুল্ম-মৃগ-সমূহের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন।

মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার সময় শ্রীজগন্নাথকে শ্রীশ্যামসুন্দর মুরলীবদনরূপে দর্শন করিতেন, কখনও বা মহাভাবাবেশে মন্দিরের দ্বার-রক্ষকের হাত ধরিয়া বলিতেন,—"আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণকে দেখাও।"

একদিন পাণ্ডাগণ মহাপ্রভুকে জগন্নাথের বাল্যভোগ-মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিলেন। মহাপ্রভু তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক হইল ও নয়নে অশ্রুধারা বহিতে থাকিল। ঐ প্রসাদে কৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে—এই স্মৃতি জাগিতেই মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কৃষ্ণের অধরের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতপানের জন্য শ্রীরাধা ও শ্রীগোপীগণের যে সুতীব্র উৎকণ্ঠা, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রকাশিত হইল।

ত্রিনবতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীকালিদাস ও শ্রীঝড়ুঠাকুর

শ্রীকালিদাস নামে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর এক জ্ঞাতি-খুড়া ছিলেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধন ও সাধ্য ছিল। মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য গৌড়দেশ হইতে যত বৈষ্ণব পুরীতে আসিতেন, শ্রীকালিদাস তাঁহাদের সকলেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। বৈষ্ণব দেখিলেই তিনি তাঁহার নিকট উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য ভেট লইয়া যাইতেন ও তাঁহাদের ভোজনের অবশেষ চাহিয়া লইতেন। বৈষ্ণবে কোনরূপ জাতিবুদ্ধি করিতে নাই— ইহার উজ্জ্বল আদর্শ কালিদাস স্বীয় জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীঝড়ুঠাকুর ভূঁইমালী-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস একদিন কিছু আম 'ভেট' লইয়া ঝড়ু ঠাকুরের নিকট গেলেন এবং ঝড়ুঠাকুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর চরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন।

ঝড়ুঠাকুর কালিদাসকে অভ্যর্থনা করিয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার আতিথ্যের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কালিদাস বুঝিতে পারিলেন, ঝড়ুঠাকুর দৈন্য করিয়া তাঁহাকে

বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কালিদাস ঝড়ুঠাকুরের পদধূলি প্রার্থনা করিলেন ও তাঁহার চরণ নিজ মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কালিদাস ঝড়ুঠাকুরের গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময় ঝড়ুঠাকুর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কালিদাসের অনুগমন করিলেন। ঝড়ুঠাকুর গৃহে ফিরিয়া গেলে কালিদাস পথের উপর ঝড়ু ঠাকুরের যে চরণ-চিহ্ন পড়িয়াছিল, তাহা হইতে ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন এবং ঝড়ুঠাকুর যাহাতে দেখিতে না পান—এরূপ এক স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে ঝড়ুঠাকুর ভগবানকে মনে মনেই আমগুলি নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ঝড়ুঠাকুরের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া আমের খোসা ও চোষা আঠিগুলি বাহিরে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিলেন।

কালিদাস এতক্ষণ লুকাইয়া ছিলেন; তিনি উচ্ছিষ্টগর্ত্ত হইতে সেই আমের খোসা ও চোষা আঠিগুলি সংগ্রহ করিয়া চূষিতে চূষিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন।

মহাপ্রভু যখন মন্দিরে জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, তখন সিংহ-দ্বারের নিকটে সিঁড়ির নীচে একটি গর্ত্তমধ্যে পদ ধৌত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। তিনি গোবিন্দকে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন তাঁহার সেই পদধৌত-জল কোনরূপে গ্রহণ করিতে না পারে। দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত কেহই সেই জল গ্রহণ করিতে পারিত না। এক দিন মহাপ্রভু পদ ধৌত

করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকালিদাস তিন অঞ্জলি পাদোদক পান করিলেন। তিনি গোবিন্দের নিকট হইতে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট চাহিয়া লইয়া ভোজন করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম '**মহাপ্রসাদ**'; আর সেই মহাপ্রসাদ যখন প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত আস্বাদন করিয়া অবশেষ রাখেন, তখন তাহাকে '**মহামহাপ্রসাদ**' বলে। শুদ্ধভক্ত-পদধূলি, শুদ্ধভক্ত-পদজল ও শুদ্ধভক্তের ভুক্তাবশেষ—এই তিনটাই সাধনের বল। এই তিন বস্তুর সেবা হইতে কৃষ্ণে প্রেম লাভ হয়,—এই সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিষ্ঠ শ্রীকালিদাস এই তিন অপ্রাকৃত বস্তুর সেবাকেই সাধ্য ও সাধন করিয়াছিলেন।

চতুর্নবতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীপুরীদাসের কবিত্ব-স্ফূর্তি

এক বৎসর শ্রীল শিবানন্দ সেন তাঁহার পত্নী ও শিশু-পুত্র শ্রীপুরীদাসকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হন। শ্রীশিবানন্দ যখন পুরীদাসকে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত করাইলেন, তখন মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ বালককে 'কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিবার জন্য প্ররোচনা

প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিল না! সম্পূর্ণ মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকিল। শ্রীশিবানন্দও বালককে কৃষ্ণনাম বলাইবার জন্য বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু পিতারও সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন মহাপ্রভু অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন,—"আমি স্থাবরকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম বলাইলাম, কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র এই বালককেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না!" ইহা শুনিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভু বলিলেন,—"আমি অনুমান করিতেছি, আপনি শ্রীপুরীদাসকে যে কৃষ্ণনাম-মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা সে অন্য লোকের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। এজন্যই তাহা উচ্চারণ না করিয়া সে মনে মনে মন্ত্র জপ করিতেছে।" আর একদিন শ্রীপুরীদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু পাঠ করিতে বলিলে বালক এই শ্লোকটি রচনা করিয়া তাহা পাঠ করিল,—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

(শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত আর্য্যাশতকে ১ম শ্লোক)

যিনি শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্র-মণিদাম শ্রীবৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ-স্বরূপ সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

সাত বৎসরের শিশু—যাহার অধ্যয়ন নাই, সে কি করিয়া ঐরূপ শ্লোক রচনা করিতে পারে, ইহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং একমাত্র মহাপ্রভুর কৃপায়ই

ইহা সম্ভব হইয়াছে, সকলে বিচার করিলেন। এই পুরীদাসই পরে শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী নামে খ্যাত হন। ইঁহার রচিত 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা' ও 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক'— শ্রীগৌর-লীলার দুইটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থ অবলম্বনে 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

পঞ্চনবতিতম পরিচ্ছেদ

অপ্রাকৃত ভাবাবেশে কূর্ম্মাকৃতি

শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবারাত্র কৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত হইয়া নানা প্রকার উন্মাদের চেষ্টা ও প্রলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য ব্যাকুলতার পরাকাষ্ঠা হৃদয়ে উদিত হইলে এইরূপ অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়।

এইসময় শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন। তাঁহারা প্রভুর ভাবোপযোগী বিভিন্ন সঙ্গীত প্রভুর প্রিয় গ্রন্থ হইতে পাঠ ও কীর্ত্তন করিতেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুও কোন কোন শ্লোক পাঠ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন। একদিন এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইল। শ্রীস্বরূপদামোদর ও

শ্রীরামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শয়ন করাইয়া স্ব-স্ব বাসস্থানে গমন করিলেন। গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করিয়া রহিলেন। অর্দ্ধ-রাত্রিকালে মহাপ্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনটি দ্বারে কপাট বন্ধ ছিল ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দ্বার রুদ্ধ থাকা-সত্ত্বেও মহাপ্রভু ভাবাবেশে তিনটী প্রাচীরই উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। দক্ষিণ সিংহদ্বারের যে স্থানে 'তৈলঙ্গী' * গাভীগণ অবস্থান করে, তথায় গমন করিয়া মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এদিকে গোবিন্দ গম্ভীরায় মহাপ্রভুর কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভুকে ডাকাইলেন। শ্রীস্বরূপদামোদর প্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা-স্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, গাভীগণের মধ্যে মহাপ্রভু কূর্ম্মাকৃতি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন! প্রভুর মুখে ফেন, শ্রীঅঙ্গে পুলক, নয়নে অশ্রুধারা, বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ। চতুর্দ্দিকে গাভীগণ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ ঘ্রাণ করিতেছে, দূরে সরাইয়া দিলেও উহারা প্রভুর অঙ্গ-স্পর্শ পরিত্যাগ করিতেছে না।

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন এবং কর্ণে অনেকক্ষণ উচ্চনাম-সংকীর্ত্তন করিবার পর মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশা লাভ করিলেন। তখন প্রভুর হস্তপদাদি বাহিরে আসিল। মহাপ্রভু স্বরূপের নিকট আবার বিরহের বিলাপ করিতে লাগিলেন।

* দ্রাবিড়ের পূর্ব্বোত্তরস্থিত দেশকে 'তৈলঙ্গ' দেশ বলে। এই স্থানের গাভীকে 'তৈলঙ্গী গাভী' বলে।

ষণ্ণবতিতম পরিচ্ছেদ

সমুদ্রবক্ষে

শরৎকালের কোন জ্যোৎস্নামযী রজনীতে মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণবিরহে বিভাবিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে বিভিন্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু 'আই-টোটা' নামক স্থান হইতে অকস্মাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। নীলাম্বুধির উচ্ছলিত তরঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পতিত হওয়ায় তাহা ঝলমল করিতেছিল। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভুর যমুনার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল। মহাপ্রভু যমুনা-বিচারে অতিবেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে সমুদ্রের জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। সমুদ্রে পতিত হইয়াই প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের তরঙ্গ কখনও মহাপ্রভুকে ডুবাইয়া, কখনও ভাসাইয়া, কখনও তরঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে নাচাইয়া, কখনও বা তীরে বহিয়া লইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তরঙ্গের দ্বারা চালিত হইয়া মহাপ্রভু কণারকের* দিকে গমন করিলেন। মহাপ্রভু গোপীর দাসী অভিমান করিয়া যমুনাতে কৃষ্ণের জলকেলি উৎসব-দর্শনের ভাবে মগ্ন ছিলেন।

* পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্র-তটে কৃষ্ণপ্রস্তরময় সূর্য্যমন্দির অবস্থিত বলিয়া এস্থানকে কোণার্ক বা অর্কতীর্থ বলে। অর্ক-শব্দের অর্থ—সূর্য্য।

এদিকে শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন ও নানা

কোণার্কের সূর্য্যমন্দির
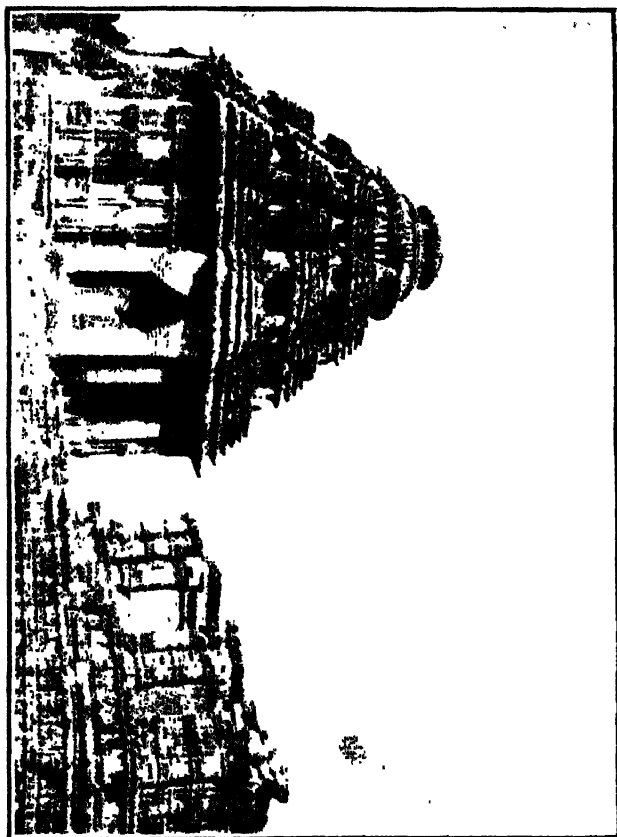
স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন রাত্রি প্রায় অবসান হইল, তখন সকলেই নিশ্চয় করিলেন যে,

মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রভুর বিচ্ছেদে কাহারও দেহে আর প্রাণ রহিল না। বন্ধু-হৃদয়ের স্বভাবই এই যে, তাহা অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া থাকে। তথাপি কেহই মহাপ্রভুকে পুনরায় দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, আবার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু দেখিতে পাইলেন, এক ধীবর তাহার স্কন্ধে মৎস্য ধরিবার জাল স্থাপন করিয়া অদ্ভুত ভাবাবেশে 'হরি-হরি' বলিতে বলিতে আসিতেছে। ধীবরের ঐরূপ ভাবাবেশ দেখিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী তাহাকে ঐরূপ ভাবাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধীবর বলিল যে, তাহার জালে একটি মৃত মনুষ্য উঠিয়াছে। সে একটি বৃহৎকায় মৎস্য মনে করিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে সযত্নে উঠাইয়াছিল। জাল হইতে উহাকে বাহির করিবার কালে যখন তাহার গাত্র স্পর্শ হইয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ে এক ভূত প্রবেশ করিয়াছে এবং ভয়ে তাহার শরীরে পুলক, কম্প, অশ্রু ও গদ্গদ-বাণীর প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার দর্শনমাত্রই মনুষ্যের শরীরে যেন ভৌতিক ব্যাপারসমূহ প্রবিষ্ট হয়। ঐ ভূতটি মৃত মানুষের রূপ ধারণ করিয়া কখনও 'গোঁ' 'গোঁ' শব্দ করে, কখনও বা অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে।

ধীবর আরও বলিল,—"আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার স্ত্রী-পুত্র কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? —এই ভয়ে আমি ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝার নিকট যাইতেছি। আমি প্রত্যহ রাত্রিতে একাকী নির্জ্জনে মৎস্য ধরিয়া বেড়াই। শ্রীনৃসিংহদেবের নাম-স্মরণে

ভূত-প্রেত আমাকে কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু কি আশ্চার্য্য! 'নৃসিংহ' নাম করিলেই এই ভূত আরও দ্বিগুণভাবে যেন ঘাড়ে চাপিয়া বসে! তোমরা তথায় কিছুতেই যাইও না, তথায় গেলে তোমাদেরও ভূতে ধরিবে।"

ধীবরের মুখে এইসকল কথা শুনিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু প্রকৃত বিষয়টী বুঝিলেন ও ধীবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আমি একজন বড় ওঝা, তিন চাপড়েই তোমার ভূত ছাড়াইতেছি, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি যাঁহাকে ভূত মনে করিয়াছ, তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি সমুদ্রের জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাকে তোমার জালে উঠাইয়াছ। তাঁহার স্পর্শমাত্র তোমার কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছে। তুমি তাঁহাকে কোথায় উঠাইয়া রাখিয়াছ, আমাকে দেখাও।"

ধীবর ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুকে প্রদর্শন করিলে শ্রীস্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর আর্দ্র কোপীন দূর করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইলেন ও সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করিতে ও মহাপ্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন করিলেন ও ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন,—"আমি শ্রীযমুনা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তথায় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোপী-গণের সঙ্গে মহাজলক্রীড়া করিতেছেন। আমি তীরে থাকিয়া সখী-গণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র লীলা দর্শন করিতেছিলাম।"

যখন মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন করিলেন, তখন তিনি শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা আমাকে লইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছ কেন?" শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার অবস্থা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট বর্ণন করিলেন।

সপ্তনবতিতম পরিচ্ছেদ

লীলা-সঙ্গোপনের ইঙ্গিত

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিবৎসর বাৎসল্যরস-মূর্ত্তি শ্রীশচীমাতাকে আশ্বাস দিবার জন্য শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীমায়াপুরে পাঠাইতেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীপরমানন্দপুরীর অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীদেবীর জন্য নবদ্বীপে বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন। তিনি ভক্তগণের জন্যও মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন।

একবার শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইয়া যখন পুরীতে আসিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীজগদানন্দের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হেঁয়ালি-চ্ছলে এইরূপ কএকটি কথা বলিয়া পাঠাইলেন,—

বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল *।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥

* বাউল—বাতুল-শব্দের অপভ্রংশ।

বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল*।
বাউলকে কহিহ,—ইহা করিয়াছে বাউল॥

—চৈঃ চঃ অঃ ১৯।২০-২১

অর্থাৎ প্রেমোন্মত্তকে (শ্রীকৃষ্ণবিরহী গোপীর ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুকে) বলিও,—লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। প্রেমের হাটে প্রেমরূপ-চাউল বিক্রয়ের আর স্থান নাই। অর্থাৎ আর বহুলোক এই শ্রীগোপী-প্রেমের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাঁহাকে বলিও,—আউল অর্থাৎ প্রেমাতুর (অদ্বৈতাচার্য্য) আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। প্রেম-পাগলকে বলিও যে, প্রেম-পাগল বা প্রেমোন্মত্ত শ্রীঅদ্বৈত এইরূপ বলিয়াছে। অর্থাৎ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে ; এখন প্রভু যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।

এই তর্জ্জা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলেন, "আচার্য্যের যে আজ্ঞা" বলিয়া মৌন হইলেন। শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু এই তর্জ্জার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু সঙ্কেতমাত্র করিয়া বলিলেন,—

* * আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন॥
পূজা-নির্ব্বাহন হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন।

—চৈঃ চঃ অঃ ১৯।২৫-২৭

*আউল—আকুল বা আতুর-শব্দের অপভ্রংশ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই গঙ্গাতীরে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গাজল-তুলসীদ্বারা পূজা করিয়া মহাপ্রভুকে গোলোক হইতে আবাহন করিয়াছিলেন। পূজা নির্ব্বাহ করিয়া পূজক যেরূপ দেবতা বিসর্জ্জন করেন, বোধ হয়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এখন সেইরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আচার্য্যের এই হেঁয়ালি পাঠ করিবার পর হইতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহদশা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিরহোন্মাদে মহাপ্রভু রাত্রিতে গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিতেন। শ্রীস্বরূপ-শ্রীরামরায় সময়োচিত গানের দ্বারা মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-সমুদ্র নানাভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

একদিন বৈশাখ-মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে রাত্রিকালে মহাপ্রভু 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ' * উদ্যানে মহাভাবাবেশে দশপ্রকার চিত্র-জল্পোক্তি প্রকাশ করিলেন। দৈন্য, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় মহাপ্রভু কখনও কখনও শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দের সহিত তাঁহার স্ব-রচিত শিক্ষাষ্টকের † শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিতেন। কখনও বা 'শ্রীগীতগোবিন্দ', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক' (শ্রীরামানন্দ রায়ের কৃত), কখনও বা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ মহাভাবসাগর নবনবায়মানভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠিত।

* শ্রীজগন্নাথবল্লভ—'গুণ্ডিচা বাড়ী' ও মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি স্থলে 'জগন্নাথ বল্লভ'-নামক একটি উদ্যান আছে।

† পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শিক্ষাষ্টক দ্রষ্টব্য।

এই সকল অপ্রাকৃত মহাভাবের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা ও প্রিয়তমা একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা জগতের অভিনিবেশ বা শুষ্কবৈরাগ্যের সামান্য সম্বল লইয়া ব্যবসায় করেন, এই সকল উচ্চকথা তাঁহারা ধারণা করিতে পারিবেন না। এমন কি, যাঁহাদের চিত্ত বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট, তাঁহারাও শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। শ্রীরাধার আদর্শ সেবা-রাজ্যের চরম সীমা। সেই সেবার পরাকাষ্ঠা—প্রেমের পরাকাষ্ঠাকে বাস্তব রূপ দিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

পূর্ণতমভাবে সর্ব্বাঙ্গদ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের সেবা করিয়াও 'কিছুই সেবা করিতে পারিতেছি না, কিরূপভাবে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিব ?'—এজন্য যে সর্ব্বক্ষণ প্রবলোৎকণ্ঠা, তাহাকেই 'বিপ্রলম্ভ' বা কৃষ্ণবিরহ বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উচ্চতম ভজনের কথাই জগতে বিতরণ করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে আর কখনও কোথায়ও বিতরিত হয় নাই।

এই প্রকারে মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থলীলাভিনয়, দ্বিতীয় চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর সন্ন্যাসি-শিরোমণি আচার্য্যের লীলায় সমগ্র ভারতে শুদ্ধভক্তি-প্রচার, শেষ আঠার বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর ভক্তসঙ্গে বাস ও পুরীতে আচার্য্য-লীলাভিনয় এবং সর্ব্বশেষ বার বৎসর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত সর্ব্বক্ষণ রসাস্বাদন-লীলা করিয়া আটচল্লিশ বৎসরকাল প্রকটলীলা করিয়াছিলেন। অতঃপর ভক্তগণকে অধিকতর বিরহে ও কৃষ্ণভজনে

উন্মত্ত করিবার জন্য স্বীয় প্রকটলীলা সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। তাই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পর বিরহব্যথিত হইয়া গাহিয়াছেন,—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

(স্তবমালা—শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়াষ্টক)

সমুদ্রতীরে উপবনসমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ বৃন্দাবন-স্মৃতিতে যিনি প্রেমবিবশ হইতেন, কখনও বা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নেত্রের গোচরীভূত হইবেন ?

অষ্টনবতিতম পরিচ্ছেদ

অপ্রকট-লীলা

অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলাকে সাধারণ মনুষ্যের দেহত্যাগের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিতে চাহেন। সাধারণ যোগিগণেরও দেহ অলক্ষিতভাবে অদৃশ্য হইবার ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমান পাওয়া যায়। ভক্তবর শ্রীধ্রুবের সশরীরে নিত্যধামে গমনের

কথা * শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। আর, যে শ্রীচৈতন্যদেব যোগেশ্বর-গণেরও পরমেশ্বর, ভক্তিযোগিগণের নিত্য ধ্যানের বস্তু, তাঁহার সচ্চিদানন্দ তনু কি প্রকারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহা একটুকু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। মহাপ্রভু প্রকটলীলা-কালেও বহুবার বহুস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নহে। যিনি সপ্ত সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একই সময়ে নৃত্য-কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বকথা বলাইয়াছিলেন, যিনি বিসূচিকা-ব্যাধিতে মৃতপ্রায় অমোঘকে স্পর্শমাত্র রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন, যিনি প্রবল তরঙ্গে আলোড়িত সমুদ্রের মধ্যে মহাভাব-মূর্চ্ছায় সমস্ত রাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন, যে কৃপালু ভগবান্ গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিবামাত্র সুপুরুষ ও কৃষ্ণপ্রেমিক করিয়াছিলেন, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যপ্রকটনকারী ভগবানের সশরীরে অন্তর্হিত হওয়া বা একই সময় বহুস্থানে প্রকটিত থাকা কিছু অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার নহে। শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবদবতারগণেরও সশরীরে ও সপার্ষদে বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের কথা ভারতবর্ষে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়।

* ভাঃ ৪।১২।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশং স্বকম্॥
—ভাঃ ১১।৩১।৬

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত লোকাভিরাম শ্রীবিগ্রহ আগ্নেয়ীযোগধারণার দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজধামে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

স্বচ্ছন্দমৃত্যু যোগিগণ নিজ দেহকে আগ্নেয়ী যোগধারণাদ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন। পরন্তু ভগবানের অন্তর্দ্ধান সেরূপ নহে, ভগবান্ নিজ নিত্য সচ্চিদানন্দ-তনু দগ্ধ না করিয়াই ঐ শরীরের সহিতই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের অবস্থান; সুতরাং সর্ব্ব জগতের আশ্রয়-স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

অজাতো জাতবদ্ বিষ্ণুরমৃতো মৃতবৎ তথ।
মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ॥
—ব্রাহ্মে

ভগবান্ বিষ্ণু অজ্ঞান ব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত মায়াবলে অজাত হইয়াও জাত জীবের ন্যায় এবং অমৃত হইয়াও মৃত জীবের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করেন।

একোনশততম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত গ্রন্থ

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র রচনা করাইয়াছেন। যে-যে ভক্তিগ্রন্থ লিখিতে হইবে, তাহার সূত্রসমূহ তিনি কাশীতে অবস্থান-কালে শ্রীসনাতনকে বলিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের রচিত 'বৃহদ্ভাগবতামৃত', 'বৈষ্ণবতোষণী'-গ্রন্থ মহাপ্রভুরই রচনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীরূপের রচিত 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থও তদ্রূপ। মহাপ্রভু প্রয়াগে ঐসকল গ্রন্থের সূত্র শ্রীরূপকে বলিয়াছিলেন। 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধমাধব' প্রভৃতি নাটক এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের কতিপয় রচনা মহাপ্রভু স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মহাপ্রভুর প্রদত্ত সূত্র-অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে।

কুমারহট্ট বা হালিসহর-নিবাসী শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রতি-বৎসর বহু গৌড়ীয়-ভক্তকে লইয়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণান্তিকে গমন করিতেন। শ্রীশিবানন্দের পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস ও শ্রীপরমানন্দদাস শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিভিন্ন লীলা দর্শন

করিয়াছিলেন। শ্রীল শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য'-নামক একটী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; ইহাতেও শ্রীচৈতন্যদেবের বিস্তৃত চরিত পাওয়া যায়। শ্রীল শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র—যিনি শ্রীপরমানন্দদাস বা শ্রীপুরীদাস, অথবা শ্রীকবিকর্ণপূর-নামে বিখ্যাত, তাঁহারই মুখে শ্রীচৈতন্যদেব নিজপদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' ও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের চরিত বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ ছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বসাধারণের জন্য বঙ্গভাষায় 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী ছিলেন, আর শ্রীস্বরূপদামোদর পুরীতে সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার অন্ত্যলীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। সেই মুরারিগুপ্তের করচা ও শ্রীস্বরূপদামোদরের করচায় যে-সকল সিদ্ধান্ত আছে, তাহা মহাপ্রভুরই স্বগত সিদ্ধান্ত। শ্রীস্বরূপদামোদরের করচা অবলম্বনে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাত্মক কতিপয় স্তব ও প্রভুর সিদ্ধান্তপূর্ণ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন-আত্মা শ্রীমন্নিত্যানন্দের

শিষ্য ছিলেন—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ করিয়া 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত'-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং 'শিক্ষাষ্টক'-নামে আটটি শ্লোক রচনা করেন; তাহাতে তাঁহার শিক্ষার সার নিহিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহাপ্রভুর রচিত আরও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের পয়ঃস্বিনী-নদীর তীরস্থ আদিকেশব-মন্দির হইতে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও কৃষ্ণবেণ্বার তীর হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-নামক দুইখানি গ্রন্থ আনয়ন করিয়া উহাতে যথাক্রমে তাঁহার প্রচার্য্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত ও রসসিদ্ধান্তের বিচার জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

শততম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা

"শ্রীমন্মহাপ্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থলীলাভিনয় করিয়াছিলেন, তৎকালেও শ্রীবাস-অঙ্গনে, গঙ্গাতীরে, চতুষ্পাঠীতে এবং পথে পথে জীবসকলকে হরিনাম-মাহাত্ম্য ও হরিকীর্ত্তনের কর্ত্তব্যতা প্রচার করিয়াছিলেন; পরে সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম-

ক্ষেত্রে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে, বিদ্যানগরে শ্রীরায় রামানন্দকে, দক্ষিণদেশে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতিকে, প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে এবং ভঙ্গীক্রমে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় ও শ্রীবল্লভ ভট্ট মহোদয়কে, বারাণসীতে শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতিকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষা যথাযথ লাভ করা যায়।

জগজ্জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভারতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন দেশে স্বয়ং গিয়া প্রচারকার্য্য করেন, কোন কোন দেশে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রচারকগণকে অসীমশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক দেশে দেশে পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন। তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মূল এই যে,—কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম্মধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না, কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনাক্রমে জীব যদি 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'-এই কথাটি স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই করিবে।"

—শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টকে * নিম্নলিখিত উপদেশসমূহ প্রদান করিয়াছেন ঃ—

১। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ পরিপূর্ণভাবে মার্জ্জিত হয়, ভীষণ সংসার-দাবানল হেলায় সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মমঙ্গল পূর্ণবিকসিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—পরা বিদ্যা বা ভক্তির জীবনস্বরূপ, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন—প্রেমানন্দের সংবর্দ্ধনকারী, কৃষ্ণকীর্ত্তন—পদে পদেই পরিপূর্ণ অমৃত আস্বাদন করাইয়া থাকে এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবেই জীবগণ সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারে।

২। নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। নামী ভগবান্ নিজ নামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া তাহা জগতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন, নামকীর্ত্তনে কালাকাল, স্থানাস্থান বা পাত্রাপাত্র-বিচার নাই। কিন্তু দুর্দ্দৈব অর্থাৎ অপরাধ থাকিলে নামে রুচি হয় না। সেই অপরাধ দশ প্রকার, তন্মধ্যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের নিন্দাই প্রথম অপরাধ।†

* পরিশিষ্টে 'শিক্ষাষ্টক' দ্রষ্টব্য।

† দশাপরাধ—(১) সাধুনিন্দা,(২) অন্যদেবে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি এবং কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কৃষ্ণ-স্বরূপ হইতে পৃথগ্ বুদ্ধি, (৩) নামতত্ত্ব গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমা বাচক শাস্ত্রনিন্দা, (৫) শাস্ত্রে নামের যে মাহাত্ম্য ও ফল লিখিত আছে, তাহাতে অর্থবাদ করিয়া কল্পনা মনে করা, (৬) নামবলে পাপবুদ্ধি, (৭) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা, (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সহিত হরিনামকে সমান মনে করা, (৯) নাম-গ্রহণ-বিষয়ে অনবধান, (১০) 'আমি ও আমার'-আসক্তিক্রমে নামের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে প্রীতি না করা।

৩। তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, নিজে অমানী ও অপরের প্রতি মানদানকারী হইয়া **সর্ব্বক্ষণ** হরিনাম **কীর্ত্তন** করিতে হইবে।

'তৃণাদপি সুনীচ'-বাক্যের অর্থ এই যে, জীব এই জড়জগতের অন্তর্গত কোন বস্তু নহে; বস্তুতঃ জীব—অপ্রাকৃত অণুচৈতন্য, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের রেণু।

৪। শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী শ্রীহরিনামের নিকট ধন, জন, সুন্দরী কামিনী, জাগতিক কবিত্ব বা বিদ্যা অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিবেন না। অধিক কি, পুনর্জন্ম হইতেও নিষ্কৃতি বা মুক্তি, ত্রিতাপজ্বালার শান্তিও চাহিবেন না। প্রতিজন্মে কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত অন্য কামনা করিলে কখনও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে না।

৫। জীব নিজ-স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলিকণাসদৃশ জানিয়া সর্ব্বদা উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবে।

৬। নাম গ্রহণ করিতে করিতে সিদ্ধির বাহ্যলক্ষণে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ স্বতঃই অঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

৭। সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত নিমেষকালও যুগের ন্যায় মনে হইবে। অন্তরের অকৃত্রিম সেবা-ব্যাকুলতাজনিত অশ্রু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় প্রবাহিত হইবে, কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলতায় সমস্ত জগৎ শূন্যবোধ হইবে অর্থাৎ জগদ্ভোগের পিপাসার পরিবর্ত্তে সকল বস্তুর দ্বারা কেবল কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যাকুলতা হইবে।

৮। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাবশতঃ যদি কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করেন—ভাল, আর যদি দেখা না দিয়া মর্ম্মাহত করেন, তথাপি সেই স্বতন্ত্র পরমপুরুষের অব্যভিচারিণী সেবা-লাভের আশাতেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যথা-সর্ব্বস্ব —নিত্যপ্রভু।

শ্রীচৈতন্যদেব দশটী সিদ্ধান্ত জগতে জানাইয়াছেন। এই সকলই তাঁহার শিক্ষার মূলসূত্র,—

(১) আম্নায়-(বেদ) বাক্যই প্রধান প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

(২) শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব।

(৩) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

(৪) তিনি সমস্ত রসামৃতের সমুদ্র।

(৫) জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্ন অণু-অংশ।

(৬) জীব তটস্থশক্তি হইতে প্রকাশিত বলিয়া মায়াদ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্য।

(৭) তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীব আবার হরিভজনের দ্বারা মায়া হইতে মুক্ত হইবারও যোগ্য।

(৮) জীব ও জড়—সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

(৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

(১০) কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বা সাধ্য।

একাধিক-শততম পরিচ্ছেদ

অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত দার্শনিক সিদ্ধান্তের নাম—'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত'। এই সিদ্ধান্তই বেদান্তের সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্ত। সমস্ত শুদ্ধ বৈদান্তিক আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতা ইহাতে পাওয়া যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই কৃষ্ণের গূঢ় নাম, বেদের আদি বীজ এবং সর্ব্ব বেদময় শব্দব্রহ্ম। প্র + নু (স্তুতি করা) + অন্—এই প্রকারে 'প্রণব'-শব্দটী সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার। ওঁকার হইতে সমস্ত বেদ উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রণবই বেদবীজ মহাবাক্য এবং বেদের অন্যাংশ সমস্তই প্রাদেশিক বাক্যবিশেষ। মায়াবাদ-রচয়িতা শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্বামী প্রণবের মহাবাক্যতাকে আচ্ছাদিত করিয়া (১) অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম), (২) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম), (৩) তত্ত্বমসি (তুমিই তিনি), (৪) একমেবাদ্বিতীয়ং (এক বই দুই নাই)—এই চারিটী প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদবীজ প্রণব শুদ্ধভক্তি-প্রচারক বলিয়া ঐ মতের আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হওয়ায় অন্য কয়েকটী বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া কেবল-

অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ, তাহা লুক্কায়িত করা হইয়াছে। বেদের সর্ব্বাঙ্গ-বিচার ইহাতে নাই। এইজন্যই শ্রীমধ্বাচার্য্যস্বামী কোন কোন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতেও বেদের সর্ব্বাঙ্গ-বিচার না থাকায় সম্বন্ধতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল না। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সম্বন্ধজ্ঞানের প্রফুল্লতা প্রদর্শন করেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীমন্নিম্বাদিত্যস্বামীও সেইরূপ কতকটা অসম্পূর্ণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্বিষ্ণু-স্বামীও তদীয় প্রকাশিত শুদ্ধাদ্বৈতমতে একটু অস্পষ্টতা রাখিয়া গেলেন। মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপন-উদ্দেশে অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত-দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিক্ষা দিয়া জগৎকে বিতর্করূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন, একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য; তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষৎসমূহে জাজ্বল্যমান আছে। উপনিষদ্ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। " 'পরিণাম-বাদে' ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন—এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল। পরব্রহ্মের নিত্য-স্বাভাবিকী পরাশক্তি মানিলে আর সে-সব

দোষ থাকে না। শক্তির যে বিচিত্র বিকার, তাহা হইতেই বিশ্ব হইয়াছে, ইহাই সত্য। ব্রহ্ম বিকারী নহেন। ব্রহ্মশক্তির বিকারের ফল এই জড়জগৎ ও জৈবজগৎ। মণি হইতে স্বর্ণ প্রসব হইয়াও মণি অবিকৃত থাকে,—মহাপ্রভু যে এই উদাহরণ দিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণশক্তিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ কৃষ্ণ তাহাতে বিকারী হন না। সমস্তই শক্তি-পরিণাম। চিচ্ছক্তির পূর্ণ-পরিণামে বৈকুণ্ঠাদি ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও অণুপরিমাণে চিৎকণ জীবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামে সমস্ত জড়জগৎ ও জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ। জড়জগৎ বলিলে চতুর্দ্দশ ভুবনই বুঝিতে হইবে। বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে এই পরিণামবাদ সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, তেজঃ, বায়ু, সলিল ও পৃথ্বী—এই সকলের ক্রমপরিণাম-বিকাশই পরিণামবাদ। কেবল-অদ্বৈতবাদের পোষণ করিতে করিতে চরমে কিছুই হয় না, কেবল অবিদ্যাকল্পিত জীব ও জগৎ এরূপ প্রতীতি হইতে থাকে।* শুদ্ধপরিণামবাদে কৃষ্ণেচ্ছায় জৈবজগৎ ও জড়-জগৎ হইয়াছে সত্য। সৃষ্টি কল্পিত নয়। তবে কৃষ্ণেচ্ছায় ইহা আবার লয় হইতে পারে বলিয়া জগৎকে নশ্বর বলা যায়। নশ্বর জগতের সহিত জীবের অনিত্য পান্থ-সম্বন্ধমাত্র। যুক্ত-বৈরাগ্যই জীবের ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধজনিত সদ্ব্যবহার কার্য্য।

* শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌॥
(ভাঃ ১০।১৪।৪)

এই সিদ্ধান্তমতে কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানব-যুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অবিচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালব্ধ তত্ত্ব।* অচিন্ত্যভাবে তর্ক যোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু অচিন্ত্যবিষয়ে তর্ক কথনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না।†

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

* যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
(ভাঃ ২।৯।৩১)

† অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥
(মঃ ভাঃ— ভীঃ পর্ব্ব ৫।২২)

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ—১।২।৯) ইত্যাদি বেদবাক্যানি।

দ্ব্যধিকশততম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, নিজের ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার নামই—কাম ও শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাই—অপ্রাকৃত 'প্রেম'। নিজের ইন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনারূপে প্রকাশিত। স্বর্গাদি-সুখ-কামনাকে 'ধর্ম্ম'-কামনা বলে। অর্থ-লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের আরাধনার ছলনা, কিংবা যে-কোনও কামনা-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কামদাত্রী দেবতার পূজা অথবা সংসারের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শান্তি-লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্তই কাম। সাধারণতঃ লোকে ধর্ম্ম বা পুণ্য-কামনা-সিদ্ধির জন্য সূর্য্য-দেবতার পূজা ও অর্থ-কামনা-পরিপূরণের জন্য গণেশের পূজা, পুত্র, রাজ্য, অভ্যুদয় প্রভৃতি কামনা করিয়া শক্তির পূজা ও মোক্ষ-কামনা করিয়া রুদ্রের পূজা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বিষ্ণুকে কর্ম্মাধীন ও কর্ম্মফল-দাতা বিচার করিয়া বিষ্ণুর (?) পূজা করেন; কেহ বা তাঁহাকে দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা পরম ঐশ্বর্য্যশালী বিচারে পূজা করেন; ইহাতেও উপাস্যবস্তুতে প্রেমের অভাব লক্ষিত হয়। প্রেম নির্ম্মল চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাতে কোনপ্রকার হেতু, আত্মসুখ বা ঐশ্বর্য্যের বিচার নাই।

শ্রুতি পরমতত্ত্বকে "রসো বৈ সঃ", "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা

যায়, ভগবান্ ক্লীব ব্রহ্ম-মাত্র নহেন, কিংবা তিনি পুরুষ-ভোগ্যা প্রকৃতি বা শক্তিতত্ত্ব নহেন; তিনি লীলাপুরুষোত্তম। তিনি শক্তিমান্, তিনি রসময়, মধুময়; তিনি পুরুষ, তিনি চিদ্বিলাসী; তিনি সচ্চিদানন্দতনু; তিনি অপ্রাকৃত কামদেব; তিনি স্বরাট্, তিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা; তিনি নিখিল শক্তির প্রভু, নিখিল জীব তাঁহারই শক্তি বা প্রকৃতি। জীবের নির্ম্মল স্বরূপে সেই পরম পুরুষের জন্য যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহাই প্রেম; তাহাতে কোন হেতু নাই, বা জড়ীয় সংস্পর্শ নাই, তাহা অপ্রতিহত, অনাবিল, অহৈতুক ও অনবদ্য।

কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি-সাধন উপায়-মাত্র, উপেয় নহে অর্থাৎ তাহাই জীবের পরম প্রয়োজন নহে, কিন্তু প্রেমভক্তি উপায় ও উপেয়, সাধ্য ও সাধন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির পথ সার্ব্বজনীন নহে অর্থাৎ তাহাতে সকলের অধিকার নাই, কিন্তু একমাত্র প্রেমই সার্ব্বজনীন ও স্বাভাবিক তত্ত্ব। এজন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,— কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ; তাহা প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই নিহিত রহিয়াছে। ভগবৎপ্রীতির বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে সুপ্ত অগ্নির ন্যায় সেই স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

গর্ভস্থ শিশুর কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অনুশীলনের অবকাশ নাই, কিন্তু গর্ভস্থ চেতন শ্রীচৈতন্যের প্রেমে দীক্ষিত হইতে পারেন। শ্রীল শিবানন্দের পুত্র শ্রীপুরীদাস অথবা কয়াধূর গর্ভস্থিত শ্রীপ্রহ্লাদ মাতৃকুক্ষিতে অবস্থানকালেও শ্রীচৈতন্যের প্রেম— শ্রীভগবৎপ্রেম-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। শিশু পুরীদাস অতি

বাল্যকালে মহাপ্রভুর অঙ্গুষ্ঠ পান করিতে করিতে বাহ্য-দর্শনে অজ্ঞানাবস্থায়ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম আস্বাদন করিয়াছিলেন। চারি বৎসরের অজ্ঞান বালিকা শ্রীনারায়ণীদেবী শ্রীচৈতন্যের প্রেমে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তরুণ বয়স্ক শ্রীল রঘুনাথদাস মাতা-পিতার ভালবাসা ও পত্নীর প্রীতি হইতে পৃথক্ থাকিয়াও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক হইয়াছিলেন। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি জগতে যতপ্রকার দুরাচার থাকিতে পারে, সকল দুরাচারে লিপ্ত, পাপী জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সন্ধান পাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বপ্রকার দুরাচার চিরতরে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক মহাভাগবত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরগোপালের অলঙ্কার-অপহরণ-কারী চোর, শ্রীনিত্যানন্দের অলঙ্কার-লুণ্ঠনকামী দস্যু-সেনাপতি ও দস্যুদল শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সন্ধান পাইয়া তাহাদের তাৎকালিক স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমের প্রচারক হইয়াছিল। কর্ম্মবীর ও ধনবীরগণের সম্পাদ্য রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধনি-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই বরণ করিতে পারে। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর প্রভৃতির ন্যায় কপর্দ্দকশূন্য ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেমে মহাধনী হইয়া অষ্টসিদ্ধিকেও পদাঘাত করিয়াছিলেন। আবার প্রতাপরুদ্রের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তীও শ্রীচৈতন্যের প্রেমে পরিপ্লুত হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমসেবা ব্যতীত সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমে

দীন-দরিদ্র, দাস-দাসী, কুকুর-বিড়াল, তৃণ-গুল্ম-লতা, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু—কেহই বঞ্চিত হয় নাই। কারণ, স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের আবরণ বা পোষাকের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ নাই, নির্ম্মল আত্মার সহিতই প্রেমের সম্বন্ধ। শ্রীবাসের গৃহের বাঁদীর স্থলীয় 'দুঃখী' (শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত 'সুখী'), মহাপ্রভুর বাড়ীর ভৃত্য বৃদ্ধ ঈশান, শ্রীবাসের বাড়ীর কুকুর-বিড়াল পর্য্যন্ত ব্রহ্মাদি-দেবতার দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি-দেবতা শ্রীবাসের বাড়ীর বাঁদীর ও মহাপ্রভুর বাড়ীর ঈশানের পদধৌত জল পান করিতে পারিলে নিজদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। বিধর্ম্মী মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজী, গৌড়ের বাদসাহ হুসেনসাহ, বহু পাঠান, কৃষ্ণদাস রাজপুত প্রভৃতি সৈনিকগণও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের মহিমার কণা লাভ করিয়াছিলেন। আবার আর একদিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পরম পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণকুল-শিরোমণিগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেমের নিকট স্ব-স্ব পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, স্বধর্ম্ম-পরায়ণতা যে কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিগণ পর্য্যন্ত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমের মহিমা-শ্রবণের অবকাশ পাইয়াছিল। ষাট্ হাজার মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যের কৃপায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বার্ত্তা অবগত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানকেও ধিক্কার দিয়াছিলেন। কে কবে শুনিয়াছিলেন, বনের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গজাদির সঙ্গে শান্তপ্রকৃতি মৃগাদি পশু একত্র হইয়া শ্রীভগবানের নাম-প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে পারে ?

কে কবে শুনিয়াছিলেন, মত্ত হস্তী শ্রীনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীভগবানের সেবায় রত হইতে পারে? কে কবে শুনিয়াছিলেন, বিষ্ঠাভোজী কুক্কুরজাতি জাতীয় স্বভাব হইতে চিরতরে দূরে থাকিয়া একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের উচ্ছিষ্ট শ্রীমহাপ্রসাদভোজী ও কেবল শ্রীগৌরবাণী-শ্রবণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে? কে কবে শুনিয়াছিলেন, বনের বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-লতাদিও চরম আত্মমঙ্গললাভ করিতে পারে? অধিক কি, ঝারিখণ্ডের হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, মত্তহস্তী ও তৎসঙ্গে শান্ত মৃগগণ তাহাদের হিংসাবৃত্তি ও পশুবৃত্তি ভুলিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্লাবনে পরিপ্লাবিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম-সম্বন্ধে পৃথিবীতে যে বিকৃত ধারণার প্রচার হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রীচৈতন্যের প্রেম অনেক ঊর্দ্ধে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

কি আর বলিব তোরে মন!
মুখে বল 'প্রেম' 'প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রান্থ অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ-ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী, কাঞ্চন লভ গিয়া॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি';
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥

না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন ॥

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥

কামে-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম'-নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥

* * *

শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়ারঙ্গে,
নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম-প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥

"বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে মানুষে প্রেম কেবল আত্ম-প্রেমের বিকার-মাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আত্ম-প্রেমের আদর্শ। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনো-বিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন, দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন

মাত্র,—জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছেন। * * একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়।"

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্ম-সকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভজন-ভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সংকীর্ত্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না; তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পরিশিষ্ট

শ্রীশিক্ষাষ্টক

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

চিত্তরূপ দর্পণের পরিমার্জ্জনকারী, সংসাররূপ মহাদাবানলের নির্ব্বাপণ-কারী, পরমমঙ্গলরূপ কুমুদ-বিকাশক জ্যোৎস্না-বিতরণকারী, পরবিদ্যা-(ভক্তি) রূপা বধূর প্রাণস্বরূপ, আনন্দসমুদ্র-বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ-প্রদানকারী, নিখিল জীবাত্মার নির্ম্মলতা ও স্নিগ্ধতা-সম্পাদনকারী অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবন্! আপনি নামসমূহের বহু প্রকার প্রকটিত করিয়াছেন। সেই শ্রীহরিনামে আপনার সমস্ত শক্তি অর্পিত হইয়াছে, শ্রীনামস্মরণে কোন কালাকাল-বিচার নাই। আপনার এত দয়া, তথাপি আমার এত অপরাধ যে, ঐরূপ শ্রীহরিনামে অনুরাগ জন্মিল না।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণ অপেক্ষাও অতিশয় নীচ হইয়া, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অমানী হইয়া ও অপরকে মানদান করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা একমাত্র কর্ত্তব্য।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগন্নাথ! আমি ধন, জন অথবা সুন্দরী কবিতা (বিদ্যা বা পাণ্ডিত্য) কামনা করি না; পরমেশ্বরস্বরূপ তোমাতে জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

হে নন্দনন্দন! আমি ভয়ঙ্কর, দুষ্পার সংসার-সমুদ্রে পতিত। নিত্য-ভৃত্য, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্মস্থিত ধূলী বলিয়া জ্ঞান করুন।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

হে গোপীজনবল্লভ! কবে আপনার শ্রীনাম-গ্রহণকালে আমার চক্ষু দরদর অশ্রুধারায় সিক্ত, আমার বদন গদ্গদভাবে রুদ্ধবাক্ ও শরীর পুলক-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইবে?

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

হে গোবিন্দ! আপনার বিরহে আমার পক্ষে নিমিষকাল যুগতুল্য হইয়াছে, চক্ষু বারিধারার ন্যায় অশ্রুপ্লুত হইয়াছে, সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

পাদসেবনরতা আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পেষণই করুন, দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, (অপ্রাকৃত ও অদ্বিতীয়) লম্পট পুরুষ কৃষ্ণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহে।

শ্রীপদ্যাবলী

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়-রাজাও নই, বৈশ্য বা শূদ্রও নই, আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস।

দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্ব্বাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥

প্রভাতে দধিমন্থন-শব্দ-শ্রবণে নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজগোপীগণের নিভৃত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট এবং শ্রীমুখপদ্মবায়ুর দ্বারা শীঘ্র প্রদীপসমূহ নির্ব্বাপিত করিয়া নবনীত-ভক্ষণরত শ্রীবালকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন।

সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদাম ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষ্ণোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখীর্বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥

একদা কিঙ্কিণীধ্বনি নিয়মিত করিবার জন্য বামহস্তে কিঙ্কিণীদামধৃক্, পাদাগ্রভাগাবলম্বনে গতিশীল, আনতশরীর মৃদুমন্দ হাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত সম্মুখস্থিতা গোপীগণ হাস্য করিতে থাকিলে, শ্রীহরি নেত্র-ভঙ্গীদ্বারা তাঁহাদের হাস্য নিবারণ করিতে করিতে মাতার পশ্চাদ্ভাগস্থিত সদ্যোজাত নবনীত হরণ করিয়াছিলেন।

'শ্রীচৈতন্যদেব'-(পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয়-সংস্করণ) সম্বন্ধে

সাধারণ সংবাদপত্র

"পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। পুস্তকখানি সুলিখিত, সুষ্ঠুভাবে মুদ্রিত এবং বহুসংখ্যক ম্যাপ ও চিত্র-সংযোগে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অমৃতোপম অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত লেখক ভক্তিপূতচিত্তে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-জাতীয় বৃহৎ গ্রন্থ পড়িবার অবকাশ নাই, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের মোটামুটি একটা আভাস পাইবেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য ও বাঙ্গালা-ভাষা জানিতে হইলে বৈষ্ণব-সাহিত্য অবশ্য পাঠ্য। সেই বৈষ্ণব-কৃষ্টির স্রষ্টা যিনি, তাঁহার জীবনচরিত ও উপদেশ না জানিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার পক্ষে এই পুস্তকখানির বিশেষ উপযোগিতা আছে। আশা করি, পুস্তকখানি সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ ছাত্র-মহলে সমাদৃত হইবে।"

—"The Teachers' Journal", December, 1939

* * * *

"শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত সংক্ষেপে এইরূপ মৌলিকতার সহিত বঙ্গভাষায় আর রচিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব ও তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও দার্শনিক তথ্য গভীরভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সমগ্র চরিত বর্ণিত হইয়াছে।"

—"যুগান্তর", ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭, রবিবার

* * * *

"এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা, বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতের অবস্থা, সমসাময়িক সমগ্র পৃথিবীর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ের তুলনা, নবদ্বীপের বহু তথ্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলী ও তাঁহার প্রত্যেক শিক্ষা অতি মনোরম প্রাঞ্জল ভাষায়

‘শ্রীচৈতন্যদেব’-সম্বন্ধে সাধারণ সংবাদপত্র

একশত অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থটী গতানুগতিকভাবে রচিত হয় নাই ; ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ-অবলম্বনে এই গ্রন্থটী রচিত হইয়াছে। ইহাতে কোনপ্রকার অসার কিংবদন্তীসমূহ বা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা স্থান পায় নাই ; ইহাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শিক্ষাষ্টক সংযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কয়েকটি মানচিত্র ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত বহু স্থানের চিত্র এবং পঁয়ষট্টিটী আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যে গ্রন্থের দুইটী সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

— “দেশ”, ১৮ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৪৭

*   *   *   *

“শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সরল ভাষায় বিস্তৃতভাবে লেখা। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় শেষ এবং অসংখ্য ছবি আছে। ছেলেদের লাইব্রেরীর ও স্কুলের প্রাইজ হিসাবে এই বইখানির বিশেষ আদর হ’বে।

—“মৌচাক”, আশ্বিন, ১৩৪৭

*   *   *   *

“লেখক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বিরাট চরিতকথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে গ্রন্থখানি বেশ উপযোগী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।”

—“আনন্দবাজার”-পত্রিকা, ৬ই মাঘ, ১৩৪৭, রবিবার